# ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ   ১ম সংখ্যা

১৫ই জুন ১৯৭২ : ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৮৯৪

Vol. IV : No : 1 : June 15 1972


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।



প্রচ্ছদপট

মিজোরাম যুবতী ফসল আহরণের পথে


সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০
৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা


## যুগবাণী

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্‌দুঃখভাগ্‌ ভবেৎ ॥

সকলে সুখী হোক, সবাই নিরোগ হোক, সকলের কল্যাণ হোক, কেউ দুঃখী না হয়।

## এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

# ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজন

সম্পাদকীয়

পঞ্চম যোজনার আকার ও লক্ষ্য কি হবে, সে নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই অনেক রকম কথাবার্তা চলেছে। গত ৩০শে ও ৩১শে মে, ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সভাপতিত্বে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভা বসেছিল। সভায় পরিকল্পনা কমিশনের তৈরী খসড়া প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। খসড়া প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু হ'ল গরীব মানুষদের ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জাতীয় কর্মসূচী। সরকার যে সমস্যাটির উপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা হ'ল দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য। বছরের পর বছর ধরে এত সব যোজনা এবং বিশেষ কর্মসূচীর রূপায়ণ করেও এই ব্যাপক দারিদ্র্যের সমস্যাটি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমান যায়নি, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্রতম অংশের দিকে তাকালে এই সত্যটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দরিদ্রতম অংশ বলতে কত পরিমাণ লোকের কথা বোঝায়? প্রতি পাঁচ জন ভারতীয়ের দু'জনই এই শ্রেণীভুক্ত, যাঁরা এখনও পর্যন্ত জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু এই ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি কি? জনসাধারণের প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন বলতে অবশ্যই খাদ্য, বস্ত্র, এবং বাসস্থানের কথা বোঝায়। এছাড়াও কিছু জিনিষ প্রাথমিক প্রয়োজনের আওতায় পড়ে, যা ছাড়া ঠিক মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব এবং যা ব্যতিরেকে দেশে শান্তি আসতে পারে না। বলা বাহুল্য, শান্তি জিনিষটি যে কোন রকম উন্নয়নের পক্ষেই অপরিহার্য। খসড়া প্রস্তাবনায় যে ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির কথা বলা হয়েছে, যেগুলির ওপর প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হ'ল শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, অন্ততঃ সর্ব নিম্নমাত্রায় জনস্বাস্থ্যমূলক সুযোগ-সুবিধা, শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা, বড় বড় শহরগুলিতে বস্তি বাসীদের জন্য উন্নত ধরণের বাসস্থান, ভূমিহীন কৃষকদের গৃহনির্মাণের জন্য জমির ব্যবস্থা সুযোগ-সুবিধা এবং বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা।

সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে যে রকম বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করার কথা ছিল আজ থেকে ১২ বছর আগে। চতুর্থ যোজনার শেষে, ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮৪ জনের বেশী এবং ১১-১৪ বছর বয়সের মেয়েদের শতকরা ৪০ জনের বেশী ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পাবে না। বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে আবার অন্য ধরণের সমস্যা, পর্য্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব হ'ল এ ব্যাপারে একটি বড় অসুবিধা। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি শুধু অত্যন্ত অল্পই হয়নি, যেটুকু হয়েছে তাও সমভাবে হয়নি সুতরাং এ সমস্যাটির ওপরও গুরুত্ব এখনই দেওয়া দরকার, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ক্রমবর্দ্ধমান সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাও বর্ত্তমানে বেশ স্পষ্ট। বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করাও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রায় দেড় লক্ষ গ্রাম আছে যেখানে জলের অভাব, চাষবাসের জন্য স্বাদু জলের অপ্রাচুর্য্য ইত্যাদি সমস্যাতো আছেই এবং সে ছাড়া আছে অনেক হরিজন অধ্যুসিত গ্রাম যেখানে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক নয়। ভূমিহীন কৃষকদের বাসস্থানের সমস্যাটিও বেকারী সমস্যার মতই ভয়ঙ্কর।

রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ যদিও আমরা এতকাল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার বলে গণ্য করে এসেছি, তবুও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যাপারে এখনও [illegible] আঞ্চলিক বৈষম্য বর্ত্তমান। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক, এটি একটি বড় পরিমাণে শিল্পায়িত রাজ্য হলেও এ রাজ্যের শতকরা দশ জনেরও কম গ্রামবাসী বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তার চেয়েও বড় কথা হ'ল যে রাস্তাঘাট ও বিদ্যুতের সুবিধা আজকের দিনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করার চেয়েও গরীব জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আরও বেশী প্রয়োজনীয়।

জনসাধারণের দারুণ দারিদ্র্যের কারণ, প্রকট বেকারত্ব, নিম্ন-মানের কর্মসংস্থান এবং কৃষিকর্মে ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত অধিকাংশ লোকের উপযুক্ত সম্পদের অভাব। দারিদ্র্য সমস্যার আকার এবং সমস্যাপীড়িত মানুষের সংখ্যাগত পরিমাণ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম, এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও এই চিত্র এক নয়। সেই রকমভাবেই দারিদ্র্যের মাত্রা

এবং জনসাধারণের চাহিদায় গ্রাম ও শহরে অনেক তফাৎ আছে। শহরের গরীব মানুষের অবস্থা মোটামুটি ভাবে বলা যায় গ্রামের গরীবদের চেয়ে ভাল। তাই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে আমাদের মনোযোগের প্রধান বিষয় হবে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের ওপর সোজাসুজি আঘাত হানা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামাঞ্চলের গরীবদের প্রায় অর্দ্ধেকই হলেন ভূমিহীন কৃষক এবং সামান্য জমির মালিক এমন লোক।

তাই দারিদ্র্যের এই অভিশাপকে দেশ থেকে দূর করতে হ'লে যাদের কাজ কর্মের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রান্তিক কৃষকদের সব রকমের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, যাতে করে তাঁরা সম্পন্ন চাষী হয়ে উঠতে পারেন। শুধু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই নয়, এ ব্যাপারে যে বিষয়টির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হ'ল এই কর্ম যেন অধিকতর উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় শ্রীমতী গান্ধী যা বলেছেন তা হ'ল এই রকম: কর্ম সম্ভাবনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে যে আয় বৃদ্ধি হবে, তার সঙ্গে তাল রেখেই যেন নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের উৎপাদনও বাড়ে। দেখতে হবে যে জনসাধারণের এই বর্দ্ধিত আয়ের ফলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি না ঘটে, এবং তাঁরা দারিদ্র্যের কবল থেকে চিরতরে মুক্ত হন।

কর্মের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্ম সম্ভাবনা সম্প্রসারণের এই কর্মসূচীর সঙ্গে আরও যা করা দরকার তা হ'ল, জমি, কলকারখানা ইত্যাদি যা কিছু থেকে সম্পদ সৃষ্টি হয় সেগুলির পুণর্বিন্যাস করা। আংশিক ভাবে এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে স্বনিয়োজিত ব্যক্তিকে জমি থেকে অধিকতর উৎপাদন পাবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সরবরাহের দ্বারা এবং জমির পুণর্বন্টন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা। এই সঙ্গে গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচীকে ঢেলে সাজানো এবং সেগুলির সমন্বয় সাধনও প্রয়োজন হবে। এই সব কর্মসূচীর মধ্যে আছে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, জমি সংরক্ষণ, অরণ্য উন্নয়ন এবং কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন, পশুপালন, বনসৃষ্টি, মাছ চাষ ইত্যাদি। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (S F D A) প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি শ্রমিক উন্নয়নসংস্থা ইত্যাদির অধীনে যে সব কর্মসূচী বর্তমানে রূপায়িত হচ্ছে, সে কর্মসূচীগুলি যাতে আরও কার্য্যকরী ভাবে রূপায়িত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

গ্রামীন জনসাধারণ ও অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়ন বলতে শহরের দারিদ্র্যের সমস্যাকে ছোট করে দেখা বোঝায় না। আসল কথা হ'ল এই যে গ্রামের বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমেই শুধু শহরের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সমস্যাকে দূর করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শিক্ষিত বেকারদের অধিকাংশই যেমন, শিক্ষক, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মে সাহায্যকারী লোকজন, পশু চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ কৃষি বিজ্ঞানী ইত্যাদির সকলেরই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর এই কর্মসূচীটি রূপায়নের ফলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। তা সত্ত্বেও 'গরীবি হটাও' কর্মসূচীও যাতে আরও কার্য্যকর হয়ে ওঠে সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। এই কর্মসূচী শহরের বস্তিবাসী দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র লাঘব করবে।

খসড়া প্রস্তাবনার নীতি ও কৌশল, যার মূল বিষয়গুলির ওপর একটি শুভ প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, এবং যা পঞ্চম যোজনার অন্তর্গত কর্মসূচীগুলির প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করবে, তা জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শিল্পনীতিতে কিছু পরিবর্তন আবশ্যকীয় করে তুলবে। আজ আমরা যারা এই দারিদ্র সীমার ওপরে আছি তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য আমাদের ব্যয় সঙ্কোচ করতে হবে। জাতি আজ এক বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারে এসে পৌঁছেছে। আমাদের সামনে যে কাজ তা নিঃসন্দেহে গুরুভার, বিশেষ করে যখন ভূমির ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণের কর্মসূচী রূপায়ণের মত অনেক গোড়ার কাজ এখনও বাকী আছে। যদি আগ্রহও সঙ্কল্পের কোন অভাব না থাকে, বিশেষ করে যখন সমাজের সব স্তরেই এই সঙ্কল্প ও আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন খুব সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, ভারত তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে।

# এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সেই থেকে এর কর্মক্ষেত্র এবং সদস্য সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত মাসের তৃতীয় সপ্তায় ভিয়েনায় এর পরিচালক পর্ষদের পঞ্চম বার্ষিকী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তা থেকেই এই তথ্য প্রকাশ পায়। অপর দুটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক যথা আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক এবং আন্ত আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংক এই দুটির সঙ্গে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের দুটি অভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথম, বহির সূত্র থেকে—বিভিন্ন সরকার অথবা বিশ্বের প্রধান প্রধান বাজার থেকে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ; দ্বিতীয়, এমন সব প্রকল্পের জন্যে অর্থ সাহায্য করা হবে যা কেবল সদস্য রাষ্ট্রের উন্নয়নের নয়, সমষ্টিগত ভাবে ঐ অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন কোরবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সদস্যপদ অপর দুটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্কের সদস্য পদের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। ইকাফের (ecafe) সমস্ত সদস্য এবং সহযোগী সদস্যগণ এই ব্যাঙ্কের সদস্য। এই ব্যাঙ্কের একটি বৈশিষ্ট্য হোল—রাষ্ট্রসঙ্ঘের অথবা তার বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সদস্যগণ এই ব্যাঙ্কের সদস্য হতে পারেন, তা সে দেশ এই অঞ্চল বহির্ভূত হোক বা না হোক। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে এর আঞ্চলিক সদস্য সংখ্যা ছিল ২২ এবং অঞ্চল বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দুভাগে ভাগ করা যায়—সাধারণ ও বিশেষ; এবং তা নির্ভর করে বিশেষ তহবিলের ওপর। সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে—তা সে জাতীয়, আঞ্চলিক অথবা আধা-আঞ্চলিক উন্নয়ন সূচীর অন্তর্গত যে কোন প্রকল্প হোক না কেন তাতে অর্থ সাহায্য করাই হোল এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। এ ছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদান করতে পারে যাতে তারা আবার স্বল্প ও মাঝারী ধরণের উদ্যোগে ঋণদান কোরতে পারে। এর কারিগরী সাহায্যদান ব্যবস্থাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এ যাবৎ এই সাহায্যদান ব্যবস্থার অধিকাংশই দেওয়া হয়েছে অনুদান হিসেবে। এই অর্থ আসে এর কারিগরী সাহায্যদান সংক্রান্ত বিশেষ তহবিল থেকে। বড় উন্নত দেশ এই তহবিলে অর্থ দিয়েছে।

প্রধান প্রধান বাজার থেকে সম্পদ আহরণ করে ব্যবসায়িক শর্তে তা প্রদান করে মধ্যগের ভূমিকা গ্রহণ করার এক প্রবণতা এই ব্যাঙ্কের দেখা যাচ্ছে। এশিয়ার খুবই কম দেশ এই শর্তে ঋণ গ্রহণ কোরতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হবে সহজ শর্তে ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ১৯৭১ সালে দেখা যায় যে এই পরিমাণ ৩.৩ কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ৫.১ কোটি ডলার করা হয়েছে। তথাপি এই অঞ্চলের চাহিদা মেটাবার পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট নয়। আশা করা যায় যে ব্যাঙ্ক অচিরে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ আহরণ করে সহজ শর্তে ঋণদানের পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি কোরতে পারবে এবং প্রধানতঃ সেই সব দেশকে দেওয়া হবে যারা ব্যবসায়িক শর্তে ঐ ঋণ গ্রহণে অসমর্থ। পরিশোধের ক্ষমতানুসারে বিভিন্ন গ্রহীতার কাছ থেকে বিভিন্ন হারে সুদ গ্রহণ, একটি উত্তম নীতি। অবস্থানুযায়ী ব্যাঙ্ক যদি এ ধরণের বিভিন্ন হারে সুদ গ্রহণের একটা পন্থা বের কোরতে পারে তাহলে, এর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

১৯৭১ সালে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল ৭.৫ শতাংশ এবং ঋণ পরিশোধের সময় ছিল ১০ থেকে ২০ বছর। ব্যাঙ্কের মূলধন থেকে যে ঋণ দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশী দীর্ঘদিন ব্যাপী ঋণ ও মকুবের সময় হয় যদি সে ঋণ দেওয়া হয় বিশেষ তহবিল থেকে। বিশেষ তহবিল থেকে দেওয়া ঋণের সুদের হারও হয় কম। চলিত প্রথা অনুসারে ভারত এই ব্যাঙ্ক থেকে কোন ঋণ নেয় নি যদিও ভারত হোল দ্বিতীয় বৃহত্তম শেয়ার হোলডার। আর সবচেয়ে বেশী শেয়ার হোল জাপানের।

ভারত থেকে ব্যাঙ্কের গভর্ণর হিসবে তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন বলেন যে বিগত দু'বছরে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বেশ ভালই হয়েছে। ১৯৭০ সালে ঋণদানের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭১ সালে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সুসমৃদ্ধ হয়। উন্নয়নের কয়েকটি মূল প্রয়োজনের প্রতি শ্রীচাবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন ভারত এশিয়া তথা বিশ্বের সবত্র এখন মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে এক বিলাসিতার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কি কি পণ্য উৎপাদন হোল অথবা তার উপযুক্ত বন্টন হোল কিনা তা নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না। এশিয়ার সর্বস্তরের জনগণ এখন চান অসমতার প্রসার সংকুচিত করতে এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের শ্রী বৃদ্ধি কোরতে। আর সেই সঙ্গে এশিয়ার জনমানসে দেখা দিয়েছে ঐক্য ও সংহতিভাব এক নব চেতনা—তাঁরা চান বহু শতাব্দীর অভিশাপ-দারিদ্র্য ও বঞ্চনা ধুয়ে মুছে ফেলতে, নিজেদের ব্যাপারে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ এবং তাদের ভেদাভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এশিয়ান ব্যাঙ্ক যদি জনগণের এই আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ কোরতে পারে, তাঁদের মনের বীনায় সুর মেলাতে পারে তবেই সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে পারবে।

# হুগলী নদীর ওপর নতুন সেতু

২০শে মে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় নতুন হুগলী সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। সেতুটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি টাকা। কলকাতা নগরীর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে, তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সেতুটির প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুকাল ধরেই আমরা অনুভব করছি, কারণ এর অভাবে কলকাতার তথা সমগ্র রাজ্যের উন্নয়ন কর্ম ঠিক পুরোদমে চলা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। প্রধানমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই সেতু কলকাতা তথা সমগ্র রাজ্যের উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। তাছাড়া এর ফলে রাজ্যের বৃহত্তর সমস্যাটি অর্থাৎ বেকার সমস্যারও বেশ কিছু সুরাহা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষনদান কালে বলেন যে, এই সেতুটি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির আর একটি পূর্ণ হল। সেতুটির নির্মাণকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

নতুন সেতুটি কলকাতার দিকে প্রিন্সেপ ঘাট আর হাওড়ার দিকে শিবপুরকে (দীনবন্ধু কলেজের উত্তরে মিউনিসিপ্যাল পার্ক) সংযুক্ত করবে। রূপায়ণের সুবিধার জন্য প্রকল্পটির কাজ মোট তিনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করবেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। সেতুর উপর দিকে সংযোগকারী রাস্তাগুলি নির্মাণের তত্ত্বাবধান করবেন কলকাতার দিকে কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা এবং হাওড়ার দিকে হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা। হাওড়ার দিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং সেতুটিকে সংযুক্ত করবে একটি চওড়া রাস্তা। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং সংযোগকারী রাস্তাটির মিলন স্থল থেকে আরও কতকগুলি রাস্তা বেরোবে। উত্তর দিকের রাস্তাটি সেতুটির সঙ্গে প্রস্তাবিত 'সেন্ট্রাল হাওড়া এক্সপ্রেস ওয়ে'কে (যেটি যাবে) হাওড়া শহরের মাঝখান দিয়ে সংযুক্ত করে দেবে। দক্ষিণ দিকের রাস্তাটি আন্দুল রোড ও শালিমার ইয়ার্ডের সঙ্গে সেতুর যোগ রক্ষা করবে। পশ্চিম দিকে সংযোগকারী রাস্তাটির প্রধান শাখাটি ৬নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে সেতুটির যোগাযোগ রাখবে। সুতরাং কলকাতা থেকে হাওড়া গামী যানবাহণগুলি চলাচলের জন্য মোট তিনটি রাস্তা তৈরী হবে।

এই জাতীয় সড়ক, কলকাতাকে রাজ্যের অন্যান্য জেলা এবং কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমিতে অবস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেবে। সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা যানবাহনের চাপ (নদী পারাপারের জন্য) বেশ লাঘব কোরবে। কলকাতা এবং হলদীয়া বন্দরের মধ্যে দূরত্ব অনেক কমিয়ে দেবে এই সেতু এবং এর ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রগতিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরণার সঞ্চার করবে।

ঝুলন্ত সেতুর ডিজাইনের ব্যাপারে আধুনিকতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হবে এই সেতুটি। গত দশকে সারা পৃথিবীতে এই ধরণের প্রায় ১২টি সেতু নির্মিত হয়েছে। এ পর্য্যন্ত নির্মিত সেতুগুলিতে দীর্ঘতম ঝুলন্ত অংশটির দৈর্ঘ্য হল ১০৫০ ফুট—এটি আছে জার্মানীর রাইন নদীর ওপর নির্মিত সেতুতে। হুগলী নদীর এই সেতুতে মধ্যেকার ঝুলন্ত অংশের দৈর্ঘ্য হবে ১৫০০ ফুট এবং উভয় ধারের ঝুলন্ত অংশের দৈর্ঘ্য হবে ৬০০ ফুট করে এবং সব মিলিয়ে দৈর্ঘ্য হবে ২৭০০ ফুট।

মধ্যেকার ঝুলন্ত অংশটি থাকবে দুটি স্তম্ভের ওপর—নদীবক্ষ (জলের সর্বোচ্চ রেখা) এবং সেতুর (মাঝখান) মধ্যে ব্যবধান হবে ১১৩ ফুট এবং স্তম্ভের কাছে এই ব্যবধান থাকবে ৯৮ ফুট। ভূপৃষ্ঠ থেকে স্তম্ভগুলির উচ্চতা হবে ৩৬০ ফুট। সেতুটিতে ৩৬ ফুট চওড়া দুটি ভিন্নমুখী পথ থাকবে এবং প্রতি ধারে একটি করে ফুটপাত থাকবে। ৩৬ ফুট চওড়া এই পথ দুটির প্রত্যেকটিতে তিনটি করে যানবাহণ যাবার রাস্তা থাকবে। ১৯৯৬ সাল নাগাৎ এই সেতুর ওপর দিয়ে প্রতিদিন ৮৫,০০০ যানবাহণ চলাচল করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কাজ সুরু হওয়ার পর থেকে সেতুর নির্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে ৫ বছর। সেতুর নির্মাণ ব্যয় হবে ২৮ কোটি টাকা, তাছাড়া সেতু নির্মাণের জন্য যে জমির প্রয়োজন হবে, সে জন্যও ৪ কোটি টাকার ব্যয় ধরা হয়েছে।

# রণার্থী পুণর্বাসন এখনো অসম্পূর্ণ কেন ?

সান্তনা কুমার দাশ

লেখক সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের তেরাই অঞ্চলে গিয়ে পুনর্বাসন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করেন। ১৭ হাজার কৃষি পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখানে হয়। বহুদিন আগে এই সব উদ্বাস্তু পুর্বতন 'পুর্ব পাকিস্তান' থেকে এ দেশে চলে আসেন। তিনি বলেছেন যে কর্মচারীবর্গ এবং শরণার্থীদের নেতৃবর্গের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যাদি নিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করেছেন এবং তা থেকে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। লেখক বলেছেন যে রাজ্য সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত তদারকি না করা সমেত বহু কারণে বিষয়টি অসমাপ্ত থেকে গেছে। পরিকল্পনাকারীগণ যে অর্থ দিয়েছেন বহু আগেই তা ব্যয় হয়ে গেছে কিন্তু সে পরিমাণে উপকার তেমন হয়নি এবং অগ্রগতিও কেমন যেন বাধাপ্রাপ্ত।

জনকল্যাণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যেই পরিকল্পনা। দূরদৃষ্টি নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় বৃহত্তর সমাজের বৃহত্তর কল্যানের উদ্দেশ্যে। পরিকল্পকদের স্বপ্ন সত্যিই স্বপ্ন থাকবে, না, তা বাস্তবে পরিণত করা যাবে তা নিয়ে অনেক পরীক্ষ নিরীক্ষা চলে, বিশেষজ্ঞের দল বসেন তার চুলচেরা বিচার কোরতে—গরীব দেশের সম্পদ যাতে কোন রকমে অপচয় না হয়। কিন্তু পরিকল্পনাকারীগণ যোজনা ভবনে বসে তো আর পরিকল্পনা কার্যকরী কোরতে পারেন না। সে কাজ অন্যের।

প্রাক্তণ পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের জন্যে দণ্ডকারণ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যে বহু অর্থ বিনি যোগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

এদিকে, এমন এক অভ্যুত্থান দেখা গেল ইতিহাসে যার কোন নজির নেই।— এক স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব, বাংলাদেশের এক কোটি ব্যক্তিকে ৯ মাস ধরে আশ্রয়দান এবং তাঁদের স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তণ—একটির পর একটি ঘটনা ঘটে গেল। আর তার মাঝে মাঝে শোনা যেত অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন ও রক্তক্ষয়ের কাহিনী।

পাকিস্তানের তদানীন্তন পূর্বাঞ্চল থেকে আশ্রয়প্রার্থী আগমন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকে—দেশ বিভাগ হওয়ার সময় থেকে। খণ্ডিত পশ্চিম বাংলা আয়তনে ছোট হয়ে গেছে। এই বিরাট জনস্রোতকে স্থান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সাহায্য চাইলেন এই সব লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, উৎখাত মনুষ্য সমাজের পুর্নবাসনের জন্যে, যাতে তাঁরা উপযুক্ত ভারতীয় নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন

কোরতে পারেন এবং দেশের ও দশের কাজে লাগতে পারেন।

পশ্চিম বঙ্গকে বাদ দিলে, উত্তর প্রদেশ হোল অন্যতম প্রথম রাজ্য, যারা সুজলা সুফলা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কৃষিজীবিদের পুর্নবাসনের জন্যে সাহায্য হস্ত সম্প্রসারিত করে। নতুন দিল্লীর পুর্নবাসন দপ্তরের ধুলোজমা ফাইল-গুলোর পাতা উল্টোলে দেখবেন যে ১৯৬২ সাল নাগাদ রুদ্রপুর, দীনেশপুরের ৩৬টি গ্রাম এবং শক্তি ফার্মের পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত হয়। আর এই সব পরিকল্পনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হয় দু'কোটি টাকার মত।

পরিকল্পনাকারীগণ সম্প্রতি স্থির করেন যে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসন প্রকল্পের অন্ত-ভুক্ত থাকবে "সেই সব কাজ যা উন্নয়ন-মূলক।" উত্তর প্রদেশে তেরাই নৈনিতাল অঞ্চলে জনগণ কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, লেখক এই মূলসূত্র ধরে সমস্যা-গুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

আশ্রয়প্রার্থীগণ ভালভাবেই জানতেন যে এক নতুন পরিবেশে, নতুন আবহাওয়ার মধ্যে তাঁদের বাঁধতে হবে এক স্থায়ী নতুন ঘর। ফেলে আসা জীবনের সঙ্গে এর কোন তুলনা চলে না। সে ছিল সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা, আর এ হোল অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল। এঁরা এসেছেন বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর এবং সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে। এক জঙ্গল অধ্যুসিত পাবর্ত্য অঞ্চলকে তাঁদের পরিণত কোরতে হবে প্রাচুর্যের অঞ্চলে এবং তাঁদের কলোনিটি হবে এক সন্তুষ্ট গ্রামবাসীর কলোনি। নিকটতম রেল ষ্টেশন ছিল ৫০ মাইল দূরে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই খানেই সংক্ষেপে শেষ হোল উজ্জ্বল দিনের কাহিনী। পুন-বাসনের দায়ীত্ব আস্তে আস্তে ন্যস্ত হোল রাজ্য সরকারের ওপর। তাঁদের অবহেলায় এবং আত্মতুষ্টিতে, আশ্রয়প্রার্থীদের এক সম্প্র-দায়ের দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি পেতে লাগলো দিনে দিনে বছরের পর বছরে। অন্যান্যদের ক্ষেত-খামারের কাজে ভাঁটা পড়ল।

স্থানীয় নেতৃবর্গ জানান যে দীনেশপুর কলোনীর ৩৬টি গ্রামে প্রায় ২০ হাজার ব্যক্তি থাকেন যাঁদের চাষযোগ্য জমি রয়েছে কিন্তু সেচের ব্যবস্থা অতি সামান্য। এর মধ্যে এক হাজার চাষী হলেন জমির শ্রমিক, অবিশ্যি অকুস্থলে সংগৃহীত তথ্য যদি নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা জমির মালিক তাঁদের মালিকানা স্বত্ব হোল হিন্দিতে লেখা আধখানা কাগজ, যাতে পুনর্বাসন প্রকল্প অনুযায়ী তাঁদের চাষ বাসের জন্যে জমির জীবনস্বত্ব দেওয়া হয়েছে। বংশানুক্রমে কোন ভূমিস্বত্ব নেই। বর্তমান মালিকগণের বংশধরগণ আপনা থেকেই সেই জমির অধিকারী হতে পারবেন না।

জানা গেছে এ একই বৈষম্যমূলক কারণে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পও ভেঙে পড়ছে। সুপ্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার উদ্বাস্তু, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখানে ফিরে গেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, দণ্ড-কারণ্য প্রকল্পের মধ্যে যে সব আদিবাসীকে জমি দেওয়া হয়েছে তাঁদের পূর্ণ স্বত্ব অধি-কার দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাঙ্গালীদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমরা যখন রুদ্রপুর পরিদর্শন করি সেই সময় ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের জনৈক পদস্থ কর্ম-চারী, হিন্দিতে টাইপ করা আধখানা কাগজের চিলতে দেখান। এই কাগজের টুকরোগুলো হোল দলিল—আশ্রপ্রার্থীদের বহু আকাঙ্খিত ভূমি সত্বের। এই সব উদ্বাস্তু পরিবারদের কাছে এই কাগজই ছিল একমাত্র নথিপত্র। কর্মচারীটি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে ছোট কৃষকদের অবাধে ঋণ দেবার ঢালাও উদার নতুন আইন সত্বেও এই কাগজের টুকরোর ওপর নির্ভর করে কোন অগ্রীম ঋণ দেওয়া যায় না। তিনি আমাদের জানান যে পাঁচ একর কৃষি জমি আছে এমন এক কৃষকের কল্পিত শস্য ফলনের ওপর ভিত্তি কোরে মাত্র দেড় হাজার টাকার মত ঋণ দেওয়া হয়, এবং সেই ঋণ পরিশোধ কোরতে হয় তখন-কার নিয়ম কানুন অনুযায়ী, পরবর্তী ফলনের সময়। কৃষকগণ এই অর্থ অতি সামান্য বলে মনে করেন এবং তাঁদের ধারণা ঠিকই, কারণ এত কম পরিমাণ অর্থ দিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ বাস করা যায় না যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার, রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীট নাশক ঔষধ পত্র ব্যবহার, কলের লাঙল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়। এসব তাঁদের নাগালের বাইরে।

এর পর আমরা সাক্ষাৎ করি নৈনিতাল জেলার পুর্নবাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তিনি আমাদের জানান যে দীনেশপুর এলাকায় কিছু কৃষককে তাঁদের বরাদ্দ জমির পূর্ণ অধিকার এবং ভূমিসত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্যে এটাই হোল চূড়ান্ত ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনার চরম লক্ষ্যও তাই। ২০ বছর ধরে যাঁরা তাঁদের জমি চাষ কোরছেন তাঁদের রাজ্য সরকার কেন যে পূর্ণ মালিকানা সত্ব দেন নি তার কোন কারণ তিনি দেখাতে অসমর্থ হন।

শক্তি ফার্মের ৭ হাজার বাসিন্দার অবস্থা তথৈবচঃ বরং কিছুটা আরও বেশী খারাপ বলা যায়। এখানেও প্রায় এক হাজার ভূমিহীন বাসিন্দা, তাঁদের জমিতে চাষ করার জন্যে জীবন সত্বের অধিকারও পাননি।

এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি কি দূর করা যায় না? পরিকল্পনা কি রাজ্য সরকারগুলির হাতের ক্রিড়ানক হয়ে থাকবে—পরিকল্পনার

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

# রেল পথের আধুনিকীকরণ ও দক্ষিণপূর্ব রেলপথের অগ্রগতি

এস. এস. মুখার্জী

আধুনিক রেল ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পোন্নয়নের একটা প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। ভারতের শিল্পোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের রেল ব্যবস্থাও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেদিক থেকে ভারতের আটটি আঞ্চলিক রেলপথের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ অন্যতম।

## রেলের আধুনিকীকরণ

১৯৫৭ সালে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে ২৫ কিলো ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন সিঙ্গল-ফেজ এসি ব্যবস্থা চালু করে আধুনিকীকরণের কাজ সুরু হয়। ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র ৭৫ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছিল কিন্তু আজ ১৩৩৬ কিলোমিটার পথে বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চলে এবং এই পথে মাল ও যাত্রী চলাচলের পরিমাণ ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টন কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১৮৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। বর্ত্তমানে পাঁশকুড়া ও হলদিয়ার মধ্যেকার ৬৫ কিলোমিটার পথে বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। এছাড়া ওয়ালটেয়ার কিরেন্দুল শাখার ৪৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ বৈদ্যুতিকরণের জন্য জরিপের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ২৬৫ কিলোমিটার দুর্গ-নাগপুর শাখার জরীপের কাজ চলছে।

বাষ্পীয় রেলপথের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক রেলপথ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ষ্টেশনে সর্বাধুনিক রুট-রিলে-ইন্টার লকিং ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এর ফলে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সাহায্যে সমগ্র ষ্টেশনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এই স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা বড় বড় ষ্টেশন ছাড়া ছোট ষ্টেশনেও যাতে চালু করা যায়, তার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চক্রধরপুর শাখার কয়েকটি ষ্টেশনে তা ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে।

সুবাধন শাখায় যে হারে যাত্রী ও মাল চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে কোনরূপ ব্যাঘাত যাতে না হয় তার জন্য টিকিয়াপাড়া ও পাঁশকুড়ার মধ্যে উন্নত ধরণের সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

## উন্নত টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা

ট্রেন চলানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য নির্ভরযোগ্য টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে তাই নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের এক প্রকল্প রূপায়িত করা হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে ট্রাঙ্ক রুটে এবং গুরুত্বপূর্ণ শাখায় অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সম্পন্ন রেডিও রিলে চালু করা হচ্ছে। বস্তুতঃ পক্ষে ৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই রেলপথের বিলাসপুর, অনুপুর বিভাগেই ভারতীয় রেলের প্রথম মাইক্রো-ওয়েভ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

## সেতু

রেলপথের সেতুগুলি সম্পর্কেও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। রেল চলাচলের নিরাপত্তার স্বার্থে সেতুর ইস্পাতের গার্ডারের ধাতুগত গুণাগুণ পরীক্ষা করে তার ভিত্তিতে ৮৭টি গার্ডার পাল্টানো

রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে

দক্ষিণপূর্ব রেলপথে এখন কম্পিউটারের সাহায্যে নানা রকম হিসেবের কাজ চলেছে

হয়েছে। হাওড়া এবং ওয়াল্টেয়ারের মধ্যে পূর্ব উপকূলবর্তী রেলপথের সেতুগুলি পরীক্ষা করে দেখার কাজ চলেছে। কটকের কাছে মহানদীর ওপর নির্মিত সেতুটির গার্ডারগুলি নতুন করে বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে দেড় কোটি টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে ছোট স্প্যানের ক্ষেত্রে ইস্পাতের কাঠামোর পরিবর্তে কংক্রিটের কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে।

রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা যাতে আরো বিজ্ঞান সম্মত এবং আধুনিক হয়, তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা করা হয়েছে। মাটি নরম হয়ে যাওয়ার ফলে ট্রেনের গতি যাতে মন্থর করতে না হয়, তার জন্য নিয়মিত মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেসব কারণে রেল লাইনে ফাটল ধরে এবং ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়, সেই সব কারণগুলি দূর করার জন্য ৫টি আলট্রাসোনিক রেল্-ফ্ল-ডিটেকটর যন্ত্র আনা হয়েছে। এর দ্বারা রেল লাইনে ফাটল ধরলে, তা নির্ণয় করা যাবে। দ্রুতগতিতে অধিক মাল বহনের সুবিধার জন্য ট্রাঙ্ক রুটের রেল লাইনগুলির মধ্যেকার ফাঁকগুলি ওয়েলডিং করে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৭২০ কিলোমিটার পথের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১৯৭১-৭২ সালে ২০০ কিলোমিটার ও ১৯৭২-৭৩ সালে আরো ২৫০ কিলোমিটার করার পরিকল্পনা আছে।

রেল লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেজারস সোভেল প্যাকিং Measurs shovel Packing) এবং ডাইরেক্টেট ট্র্যাক মেইন্টিন্যান্স (Directed track Maintenance) নামে ২টি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ট্রাঙ্ক রুটে রেল লাইনের আকার বা গঠনগত কোন ত্রুটি থাকলে, তা নির্ণয় করার জন্য "আন্সলার ট্র্যাক রেকর্ডিং গাড়ী" (Ansler track recording car) হাওড়া—নাগপুর, হাওড়া—ওয়াল্টেয়ার শাখায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে এটি যাতায়াত করে যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করবে, তা বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## নতুন ব্যবসায়িক ব্যবস্থা

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত কন্টেনার সার্ভিস (container services) চালু করার বিষয়টি সর্বাগ্রগণ্য। এর কাজ হোল শহরের যে কোন স্থান থেকে মালপত্র নিয়ে রেল ও সড়কপথে তা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া।

এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত কম খরচে, নিরাপদে এবং দ্রুতগতিতে মালপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'ফ্রেট-ফরওয়াডার' নামে আর এক ধরণের ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। এতে অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো মালপত্র, স্বীকৃত ফ্রেট-ফরওয়াডারগণ, মালিকদের সুবিধামত স্থান থেকে সংগ্রহ করে তা রেলপথে গন্তব্যস্থলে পাঠিয়ে দেয়। কোলকাতা, মাদ্রাজের মধ্যে এই ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

পরিচালন সংক্রান্ত একটি সুসংহত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কম্পিউটারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কোলকাতায়, রেলওয়ের সদর দপ্তরে এই কম্পিউটারটি বসানো হয়েছে। এর দ্বারা পরিসংখ্যান, হিসাব প্রভৃতির দিক থেকে যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

## নবদিগন্তের সূচনা

রেলপথের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই ওড়িষার পারাদীপ বন্দরকে কটকের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথটি তৈরী করতে খরচ পড়বে ১১ কোটি টাকা। বোকারোয় নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। কাজেই সেখানেও রেল ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের গুরুত্ব দেখা

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

# পশ্চিমবঙ্গে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা

রাজ্যপাল শ্রীডায়াস তাঁর বিধান সভার উদ্বোধনী ভাষণে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে 'গরীবী হটাও' আন্দোলনের সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই সব ঘোষণার ফলে গ্রাম বাংলার অবহেলিত মানুষ অধীর আগ্রহে সরকারের কার্যসূচীর জন্য দিন গুনছে।

পরিসংখ্যানের অভাবে পশ্চিমবাঙলায় দারিদ্র্যের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। ফলে কাদের দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কি কি কার্যসূচী গ্রহণ করা দরকার তা নির্দ্ধারণ করা পরিকল্পনাকারীদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে। তবুও মাঝে মাঝে দৈনিক খবরের কাগজের মাধ্যমে যে টুকরো, টুকরো খবর বেরিয়ে পড়ে তাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠকদের পক্ষে আতঙ্কিত হবার কথা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক সমীক্ষা থেকে জেলাওয়ারী মাথাপিছু আয়ের হিসেবে যা পাওয়া গেছে তা নীচে দেওয়া হল। মনে রাখা দরকার যে, ব্যয়ের অঙ্ক এর চাইতে কম হবারই কথা।

| জেলা | বার্ষিক আয় | দৈনিক আয় |
|---|---|---|
| হাওড়া | ৩৮৯ | ১ টা: ৭ পয়সা |
| বর্দ্ধমান | ৩৭২ | ১ ,, ১ ,, |
| হুগলী | ৩৩১ | ৯০ ,, |
| প: দিনাজপুর | ২৯৩ | ৮০ ,, |
| ২৪, পরগণা | ২৯১ | ৭৯ ,, |
| দার্জিলিং | ২৮৪ | ৭৭ ,, |
| নদীয়া | ২৮০ | ৭৬ ,, |
| বীরভুম | ২৬৭ | ৭৩ ,, |
| মুর্শিদাবাদ | ২৫২ | ৬৯ ,, |
| মালদা | ২৪৫ | ৬৭ ,, |
| মেদিনীপুর | ২৩১ | ৬৩ ,, |
| বাঁকুড়া | ২২৯ | ৬২ ,, |
| কুচবিহার | ২২৯ | ৬২ ,, |
| পুরুলিয়া | ১৯৭ | ৫৪ ,, |

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৬৯-৭০ সালে সর্বভারতীয় মাথাপিছু আয় হচ্ছে ৫৮৯ টাকা আর পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয় হচ্ছে মাত্র ৫৬২ টাকা। কয়েকটি রাজ্য সর্বভারতীয় সীমা পেরিয়ে যাওয়ার গৌরব অর্জন করছে যথা পাঞ্জাব ৯৪৫, হরিয়ানা ৭৮৮, মহারাষ্ট্র ৭৩৯, গুজরাট ৬৩৫ এবং তামিলনাড়ু ৬১৬ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের এত পিছিয়ে পড়ার কারণ গঠনমূলক কাজের চাইতে বিক্ষোভের

**হরিপদ মজুমদার**

রাজনীতি, শিল্পে অশান্তি এবং কৃষি উন্নয়নে চরম অবহেলা। বর্তমানে একটি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আপাততঃ একটা শান্তির পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগে দ্রুত বহুমুখী কার্যসূচী গ্রহণ করে জনগণের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনাই সব চাইতে জরুরী প্রয়োজন।

১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি ভারতবর্ষে একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দৈনিক ২২৫০ ক্যালোরী খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন বলেন এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের জন্য মাসিক মাথাপিছু ২০ টাকা ধার্য করেন। ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যমান হিসেবে ২২৫০ ক্যালোরী খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ে মাসিক ৩৮ টাকা খরচ হবে অর্থাৎ দৈনিক মাথাপিছু ১ টাকা ২৭ পয়সা চাই। পশ্চিমবাঙ্গলার ১৬টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলার অধিবাসীদেরই মাথাপিছু আয় ১ টাকা ২৭ পয়সায় পৌঁছয় নি।

বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা, মেদিনীপুর, কুচবিহার ও পুরুলিয়া এই ছয়টি জেলার মানুষদের ন্যূনতম প্রয়োজনের অর্দ্ধেক খাদ্য সংগ্রহের আর্থিক সঙ্গতি নেই। এই অকল্পনীয় দারিদ্র্যের অবসান করাই প্রাথমিক কর্তব্য।

খাদ্যের পরই প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় জানা গেছে, এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হলে আরও [illegible] টি বিদ্যালয় খোলা দরকার। ১৯৮০ সালের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে প্রতি বছর ১০,০০০ [illegible] করা চাই। প্রতি বিদ্যালয়ে [illegible] শিক্ষক ধরলে প্রতি বছর ৪০,০০০ হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হতে পারে। শিক্ষক প্রতি [illegible] টাকা বেতন ও অন্যান্য খরচ মাসিক [illegible] টাকা যদি ধরা যায় তবে দশ হাজার বিদ্যালয়ের জন্য বছরে [illegible] কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে।

পশ্চিমবাঙলার অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ মহাশয় ২৯ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট রচনা করেছেন এবং এই বাজেটে প্রায় ৮ কোটি টাকার একটা 'ক্রাশপ্রোগ্রাম' করা হয়েছে জেলায় জেলায় বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য। প্রয়োজনের তুলনায় ৮

কোটি টাকা কিছুই নয়। অর্থমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেছেন। জনসাধারণ আমাদের বলে দিন দশ কোটি টাকা কি ভাবে কর আদায় করতে হবে?

জনগণ বলতে সাধারণত: যাদের বোঝায় অর্থাৎ মোট জনসমষ্টির শতকরা সত্তর-আশীজন, যাদের আয় দৈনিক ৫৪ থেকে ১ টাকা মাত্র তাদের কাছ থেকে কিছু আশাকরা যায় না। বাকী যে শতকরা বিশজন থাকছে তাদেরই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বৃহত্তর জনসমষ্টির আর্থিক উন্নয়নের জন্য মূলধন সঞ্চয়ে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পশ্চিমবাংলার জনসমষ্টির বিভিন্ন স্তরের মাথাপিছু ব্যয়ের তথ্য জানা যায় না। সর্বভারতীয় যে পরিসংখ্যান জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ফলে জানা যায়, তার ভিত্তিতেই পশ্চিমবাংলার একটা হিসেব বার করা ছাড়া উপায় নেই। পুনার স্কুল অব পলিটিক্যাল ইকনমি কর্তৃক প্রকাশিত 'পোভারটি ইন ইণ্ডিয়া' পুস্তকে নিম্নলিখিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে সর্বভারতীয় বিভিন্ন স্তরের মাথাপিছু ব্যয়

(১৯৬৮-৬৯ সালের মূল্যমান হিসেবে)

| লোকসংখ্যা দরিদ্রতম অংশ থেকে | গ্রামাঞ্চল বার্ষিক | শহরাঞ্চল বার্ষিক |
|---|---|---|
| ০-৫ | ১২৭.২ | ১৩৩.১ |
| ৫-১০ | ১৭৩.৪ | ১৯১.[illegible] |
| ১০-২০ | ২১৫.০ | ২৪৮.০ |
| ২০-৩০ | ২৬০.৪ | ৩১১.৯ |
| ৩০-৪০ | ৩০৪.৩ | ৩৭৪.৬ |
| ৪০-৫০ | ৩৪৯.০ | ৪৪১.৬ |
| ৫০-৬০ | ৪০১.৫ | ৫১৮.০ |
| ৬০-৭০ | ৪৫৮.৭ | ৬১০.৮ |
| ৭০-৮০ | ৫২৭.৭ | ৭৫১.৫ |
| ৮০-৯০ | ৬৭৮.৬ | ৯৮৭.৪ |
| ৯০-৯৫ | ৮৭৫.১ | ১৩৪৪.১ |
| ৯৫-১০০ | ১৫৪৪.৬ | ২২৬৩.৪ |
| সব শ্রেণীর গড় | ৪৫৬.৬ | ৬২১.০ |

এবার পশ্চিমবাঙলার কথায় আসা যাক। ১৯৭১ সালের লোক গণনায় পশ্চিমবাঙলার লোকসংখ্যা মোট ৪,৪৪,৪০,০৯৫ জন। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩,৩৫,১১,৬৯৬ জন অর্থাৎ ৭৫.৪০% এবং শহরাঞ্চলের হচ্ছে ১,০৯,২৮,৩৯৯ জন অর্থাৎ ২৪.৬০%।

গ্রামাঞ্চলের সর্বোচ্চস্তরের ৫% হচ্ছে ১৬,৭৫,৫৮৪ জন। এদের বার্ষিক ব্যয়ের ২০% কমালে মাথাপিছু বার্ষিক ৩০৮ টাকা মোট ৫১,৬০,৭৯,৮৭২ টাকা, তার নীচুতলার ৫% লোকের ব্যয়ের ১০% কমালে মাথাপিছু ৮৭ টাকা অর্থাৎ মোট ১৪,৫৭,৭৫,৮০৮ এবং তার নীচের ধাপের ১০% লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৩,৫১,১৬৮ জন, তাদের ব্যয়ের ৫% কমালে মাথাপিছু বার্ষিক ৩৫ টাকা মোট ১১,৩৮,৩৯,৭১২ টাকা। এই তিন শ্রেণীতে সর্বমোট বার্ষিক ৭৭,৫৭,৯৫,৩৯২ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব।

পশ্চিমবাঙলার শহরাঞ্চলের সর্বোচ্চ তলার ৫% হচ্ছে ৫,৪৬,০২০ জন। তাদের বার্ষিক ব্যয়ের ২০% কমালে মাথাপিছু ৪৫২ টাকা করে ২৪,৬৯,৮১,৮৪০ টাকা তার নীচুতলার ১০% ব্যয় কমালে মাথাপিছু ১৩৪ টাকা করে ৭,৩২,২০,২৮০ টাকা এবং তার নীচের ধাপের ১০% জনসংখ্যা হচ্ছে ১০,৯২,৮৪০ জন, এদের বার্ষিক ৫% ব্যয় কমালে মাথাপিছু ৪৯ টাকা করে বছরে মোট ৫,৩৫,৪৯,১৬০ টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। শহরাঞ্চল থেকে সর্বমোট ৩৭,৩৭,৫১,২৮০ টাকা আদায় করা সম্ভব।

গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উপরতলার ২০% লোকের কাছ থেকে মোট ১১৪,৯৫,৪৬,৬-৭২ টাকা মূলধন সঞ্চয় করা সামাজিক ন্যায়নীতির পক্ষে অপরিহার্য। এই ব্যয় সঙ্কোচের ফলে তাদের ভোগ বিলাসে ব্যাঘাত ঘটবে মাত্র, কিন্তু তা দিয়ে বহু লোকের দারিদ্র্যমোচন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকা কি ভাবে সংগৃহীত হবে? সম্পূর্ণটা বিশেষ উন্নয়ন কর বসিয়ে অথবা অর্দ্ধেকটা কর এবং বাকী অর্দ্ধেক বিশেষ সঞ্চয় সার্টিফিকেট ক্রয়ের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ কাজে ব্যাপক প্রচারাভিযানের সর্বাই গুরুত্ব রয়েছে। গ্রাম বাংলার আর্থিক দুর্দশার প্রকৃত তথ্য সাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে, যাতে সকলেই এই অকল্পনীয় দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সরকারী মহলেও ব্যয় সঙ্কোচ ও সহজ সরল জীবন দর্শনের বাতাবরণ গড়ে তুলতে হবে।

## তৈলাম্বু সন্ধানের জন্য ভ্রাম্যমান প্লাটফর্ম

বোম্বাই এর অগভীর সমুদ্রে তৈলাম্বু সন্ধানের জন্য জাপানের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের ভ্রাম্যমান প্লাটফর্মটি ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছবে। প্রথমে তৈল কূপগুলি কোথায় কোথায় খনন করা হবে, সে সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। প্লাটফর্মটি এসে পৌঁছবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তৈলকূপ খননের কাজ সুরু হবে।

# পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

অনিল কুমার আচার্য

বেশ কিছুকাল যাবত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গত দশকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্যে যে মন্দা দেখা দেয়, তার অশুভ প্রভাবের ফলে এ রাজ্যের শিল্পোৎপাদনে ক্রমাগত ভাটা পড়ে। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোৎপাদনের গতি নানা কারণে নিম্নতম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। ১৯৭১ সালের প্রথমার্ধে এই হার (বার্ষিক গড় প্রায় ১%) আরও কমে যায়। প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গ সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তার পূর্ব প্রাধান্য থেকে ধীর নিশ্চিত ভাবে বিচ্যুত হতে হতে বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছোয়।

এ ব্যাপারে ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ১৯৪৮ সনে সর্ব ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল ২৮% ধীরে ধীরে কমতে কমতে ১৯৭০ সনে তা এসে মাত্র ১৫% এ দাঁড়ায়। ১৯৬৫ সনে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২৮১টি নতুন কারখানা নথীভুক্ত (registered) হয়, ১৯৭০ সনে তা কমে গিয়ে মাত্র ৯৯টিতে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, ১৯৭১ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় ২৮০টি শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রায় ৫০,০০০ কর্মীকে বেকারে পরিণত করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কারখানা সমূহে নিয়োগের হার ক্রমক্ষীয়মাণ অবস্থা আজ এমন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের এই দুরাবস্থার মুখ্য কারণ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্রমক্ষীয়মাণ অবস্থা। মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস এর সহিত যুক্ত হয়ে অবস্থা আরও করুণ করে তুলেছে। তৃতীয় যোজনায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারি খাতে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা। চতুর্থ যোজনায় তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ৩২২ কোটিতে দাঁড়ায়। অথচ মহারাষ্ট্রে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৩৩.৬০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯৮.১২ কোটিতে আর উত্তর প্রদেশে ৫৬.২৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬৫ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। ১৯৭০ সনে পশ্চিমবঙ্গে ১৫৬টি লাইসেন্সের দরখাস্তের মধ্যে মাত্র ৪১টি দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলাগত গোলযোগ মূলক পরিস্থিতি এই রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক ভাঙ্গনেরই ফলশ্রুতি। রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক ও শিল্পনৈতিক ভাঙ্গন এবং ক্রমবর্দ্ধমান বেকারির ফলে পশ্চিমবঙ্গ দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। আর এই দুর্দশা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সমাজ জীবনকে বহুকাল যাবত ক্রমাগত পীড়িত করে আসছিল। বিশেষ করে গত চার পাঁচ বছর যাবত পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কোন সুপরিকল্পিত উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি—একথা বললে বোধ হয় খুব অত্যুক্তি হবেনা। তদুপরি এই সময়ের বিক্ষুব্ধ পরিবেশ ও অস্থির আবহাওয়া স্থানীয় মূলধন বিনিয়োগ ও নতুন শিল্পোদ্যমের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিলনা।

যাই হোক এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এ রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে যে সব বাধা রয়েছে, তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এগিয়ে এসেছেন, এটি খুবই আনন্দের কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ দফা কার্যসূচীর ঘোষণা এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা দানের সরকারী সিদ্ধান্তকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দানের এই সরকারী ঘোষণা যাতে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যে রূপায়িত হতে পারে সে দিকে নজর রাখতে হবে, তা না হলে অবস্থা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকবে।

এখন যা অবশ্য ও অত্যাশু প্রয়োজন, তা হল মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দান করে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সুসংহত নীতি গ্রহণ করা। তা যদি করা হয়, তবে শুধু যে নতুন নতুন শিল্প সংস্থাই গড়ে উঠবে তা নয়; বর্তমানে যে সব শিল্পসংস্থা আছে,

তাদের ও বিবিধমুখী করে তোলা ও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

পশ্চাৎপদ অঞ্চল সমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসূচী খুবই বাস্তবভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা এবং হাওড়া ও ২৪ পরগণা শিল্পাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকেই এখন অনগ্রসর অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়েছে (১৬ দফা কর্মসূচীর ১৪ নং দফা দ্রষ্টব্য)। সরকারের এই শিল্পনীতিকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই শিল্পনীতি থেকে সুফল আহরণ করতে হলে শিল্প সম্প্রসারণের বাস্তব নূগনীতি গ্রহণ করে যাতে এই সব অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পসংস্থা গড়ে উঠে এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ়ভাবে পুনর্গঠন এ রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। শুধু এর দ্বারাই বর্তমানের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি ও তজ্জনিত নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। এ রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো এমন এক সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে শুধু জোড়াতালি দিয়ে একে আর চালানো মোটেই সম্ভব নয়। এ জন্য চাই সহানুভূতি মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বলিষ্ঠ শিল্পনীতি। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে এ রাজ্যের জন্য এমন বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাতে শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়, শিল্পসংস্থা সমূহের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা যায় এবং কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন কার্যক্রমের বিস্তার সাধন সম্ভব হয়। মোট কথা, অবস্থাটি এমন হওয়া চাই যাতে নতুন নতুন শিল্পপতিগণ এ রাজ্যে নতুন নতুন শিল্পসংস্থা গড়ার জন্য উৎসাহবোধ করে এগিয়ে আসেন এবং বর্তমান শিল্পপতিগণ তাদের নিজ নিজ সংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ, বৈচিত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণে মনোনিবেশ করেন। এর ফলে একদিকে যেমন শিল্পোৎপাদনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে, অপর দিকে তেমনই এই চূড়ান্ত বেকার সমস্যা প্রপীড়িত রাজ্যে বহু লোকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে।

আগেই বলা হয়েছে কলকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে অনগ্রসর এলাকা বলে গণ্য করা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবানুগ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কারণ, উপরে বর্ণিত অঞ্চল সমূহবাদ দিলে বাকী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের চিত্র যে অনগ্রসরতার চিত্র, তা যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই স্বীকার করবেন। এই বিরাট অনগ্রসর অঞ্চলে অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করা স্বল্প সময় সাপেক্ষ ও সহজসাধ্য নয়। এই জন্য চাই সুপরিকল্পিত শিল্পনীতি ও কর্মসূচী, যাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই একটি বা ততোধিক শিল্প এলাকা গড়ে উঠে, এবং প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ত্বরান্বিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সেই সেই জেলার ভৌগোলিক সংস্থান, কাঁচামালের জোগান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য চাহিদা ও বিপণনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে নতুন নতুন শিল্পসংস্থা ও শিল্প এলাকা গড়ে তুলতে হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রতিটি জেলা ধীরে ধীরে শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সাধন করবে এবং এর অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে তুলবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ হলদিয়ার কথাই ধরা যাক্। হলদিয়ার উন্নয়ন বিরাট্ সম্ভাবনা পূর্ণ। ইলেকট্রনিকস্, পেট্রোকেমিক্যালস্ প্রভৃতি শিল্প স্থাপনের ফলে কারিগরি বিদ্যায় পটু লোকদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। নতুন নতুন আধুনিক শিল্প সংস্থাপনের ফলে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে পারে। তা ছাড়া তেল শোধনাগার ও বন্দরের কাজকর্ম পুরোপুরি আরম্ভ হলে এ অঞ্চলের যে অকল্পনীয় উন্নতি হবে, তার সুদূর প্রসারী প্রভাবের ফলে শুধু এই অঞ্চলের নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নানা সমস্যা প্রপীড়িত প্রায় ক্ষীয়মান কোন অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। এ কাজ বড়ই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। এ জন্য চাই ধৈর্য, দূরদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ শিল্পনীতি। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলীর প্রতি আজ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েরই নজর পড়েছে এবং সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ রাজ্যের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলেছে—এ বড়ই আনন্দের কথা। এ ধারা যদি আরও বেশ কিছুকাল অব্যাহত থাকে, তবে সরকার ও অন্যান্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অদূর ভবিষ্যতে আবার তার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে—এরূপ আশা করা বোধ হয় মোটেই অযৌক্তিক হবে না।

## শরণার্থী পুনর্বাসন অসম্পূর্ণ কেন?

৬ পৃষ্ঠার পর

সংজ্ঞা ও আদর্শের রূপায়ণ, কার্য্যকরী করার ক্ষেত্র কি এমনি বিকৃত করা হবে যাতে বাসিন্দারা সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন—এ ক্ষতি সারা দেশের।

বয়ন কার্য্যরত এক মিজো রমনী

# মিজোরাম ঃ অতীত ও ভবিষ্যত

মিজো পার্বত্য অঞ্চলরূপে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যা আসামের অংশ ছিল, সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের পুর্নগঠনের ফলে তা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিজোরামরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গত দু'দশক ধরেই মিজোরামে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ চলছিল। ১৯৬৬ সালে তা চরমে পৌঁছোয়। এই সময় বিপথগামী রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী একটি দল, মিজো পার্বত্য জেলার আইন সঙ্গত সরকারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। কয়েকটি বিদেশী শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পুষ্ট হয়ে মিজো জাতীয় ফ্রন্ট নামে তাদের এই সংস্থা, নিজেদের জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে শুধু যে যুব-সম্প্রদায়কেই প্রভাবিত করলো তাই নয়, সাধারণ মিজোদের মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। এদের কিছু অংশ আবার সমাজ ও জাতীয় বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হোল। ফলে মিজো এলাকার জনজীবন, এক দারুণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

তবে এই মোহভঙ্গ হতে শান্তিকামী মিজো জনগণের খুব বেশী সময় লাগলো না। সেখানকার সাম্প্রতিক নির্বাচনই তার প্রমাণ। এর আগে অবশ্য ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী মিজো পার্বত্য জেলাকে আসাম থেকে আলাদা করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, মিজোরামের আয়তন হোল ২১০৯০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩২১৬৮৬।

মিজোরামের উত্তরে আসাম ও মণিপুর, পূবে এবং দক্ষিণে বর্মা, এবং পশ্চিমে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা। ছোট খাটো পাহাড় পর্বত বেষ্টিত মিজোরামের সামান্য অংশই সমতল। এরই মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে ছোট ছোট পার্বত্য নদী। পলিমাটিতে উর্বর এই সব সমতল অঞ্চলে ধান চাষ করা হয়। ২০টি প্রধান নদী ছাড়াও কয়েকটি হ্রদও আছে। সব মিলিয়ে মিজোরাম এক পরম রমণীয়রূপ লাভ করেছে।

সাধারণভাবে এই অঞ্চলের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। বৃষ্টিপাতের সময় নিম্নপার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু খুবই আর্দ্র থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৯০ থেকে ৩৪৫ সেন্টিমিটার, তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.৮ এবং সর্বনিম্ন ১১.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মিজোরাম অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। অরণ্যে প্রচুর জঙ্গল, ছাম এবং নানা গাছ জন্মায়, অন্যদিকে বণ্যপ্রানীর সংখ্যাও কম নয়। হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, হাতি [illegible], ভালুক, শুকর ইত্যাদি।

ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

১৫০০ খৃষ্টাব্দে, মিজোদের পূর্ব পুরুষগণ দক্ষিণ চীন ভূখণ্ড থেকে এসে বর্মার পার্বত্য এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন। এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন। এই আগমণ কয়েক দশক ধরে চলে। এদের মধ্যে লুসাই উপজাতির লোকেরা প্রথমে এদেশে আসে। এদেরই নামানুসারে লুসাই পার্বত্য জেলার নামকরণ করা হয়। এর পর আসে লাখের (Lakhers) এবং চাকমা

সম্প্রদায়ের লোক। প্রথমে এই সব গোষ্ঠী বা উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিরা, জীবনযাত্রা, উৎপত্তি স্থান, রীতি নীতি, ভাষা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে মোটামুটি স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পার্থক্য লোপ পেয়ে তারা মিজো পার্বত্য অধিবাসী নামে এক অভিন্ন উপজাতিতে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা বা প্রভুত্ব লাভের জন্য বিভিন্ন উপজাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লেগে থাকতো, তার মধ্য দিয়েই এই একীকরণ সম্ভব হয়েছে, এবং কালক্রমে সাইলোর (Sailos) নেতৃত্বে লুসাইরা সবথেকে শক্তিশালী উপজাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো। দু'একটি বড় গোষ্ঠী ছাড়া, ছোট ছোট সব উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিরা লুসাই ভাষা গ্রহণ করে। লুসাইদের ব্যবহৃত ভাষার নাম দুলাই, সম্প্রতি লুসাইরা রোমান হরফে নিজস্ব সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হয়েছে।

মিজোদের বিশিষ্ট ধরণের পোষাক

১৮৯১ সালে এই অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারে আসার পর প্রথম কয়েকবছর লুসাই পার্বত্য এলাকার উত্তর ভাগ আসামের সঙ্গে এবং দক্ষিণ ভাগ বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ১৮৯৮ সালে এই দুই অংশকে মুখ্য প্রশাসকের অধীনে একটি জেলায় পরিণত করা হয়।

তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মিজো পার্বত্য এলাকার গ্রামগুলি শাসন করতো স্থানীয় প্রধানগণ। স্থানীয় ভাষায় তাঁরা 'লাল' নামে পরিচিত। এই প্রধানগণ, গ্রামের সমুদয় ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো কর্মচারী নিয়োগ করে গ্রাম শাসন করতেন। স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধান অনুযায়ী উত্তরাধিকার সত্রে, চলে আসা এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তার পরিবর্তে জেলা পরিষদ গঠন করা হোল।

আজকের মিজোরা অধিকাংশই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সবদিক থেকে তাঁরা পাশ্চাত্যমুখী। অবশ্য পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, পরিবারের ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহ, এবং গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমজাতির মধ্যে বিবাহ

আইজল শহরের একটি দৃশ্য

আধুনিকতা---মিজো যুবতীদের কাছে নতুন কিছু নয়

প্রভৃতি কয়েকটি অনুশাসন এখনও তাঁরা মেনে চলেন।

মিজোদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল, তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধি এবং কঠোর পরিশ্রমে অফুরন্ত অনুরাগ। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তাঁরা কায়িক শ্রমে কুণ্ঠিত ন।

## একমুখী অর্থনীতি

অর্থনৈতিক দিক থেকে মিজোরাম দেশের দরিদ্রতম অঞ্চল। এখানে কৃষি-কার্যই জীবিকার একমাত্র বাহন। সেই কৃষিকার্য আবার প্রধানত: ধান চাষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে সাবেকী আমলের পাহাড়ী এলাকায় জুম প্রথায় চাষ করা হয়। এর ফলে জমির মূল উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমানে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সমতলভূমিকে চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। কৃষকদের জলসেচের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থায় উৎসাহিত করা হচ্ছে। ৫000 হাজার একর এলাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি খামার স্থাপন করা হয়েছে। সমবায় খামার স্থাপন করা ছাড়াও, এরপরও কৃষি কার্যসূচীর অধীনে পশু খামারও স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল, জমির পুনরুদ্ধার, উঁচু জায়গায় ধান ও ভুট্টা চাষ, জাপানী প্রথায় কৃষিখামার, ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা এবং কমলো বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার সরবরাহ ইত্যাদি।

ধান এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। ৫৫000 হেক্টর জমিতে এর চাষ করা হয়। ধান ছাড়া অন্যান্য কৃষি ফসলের মধ্যে আছে, আলু, ভুট্টা, কাপাস, চীনে বাদাম, লঙ্কা, আদা, কমলালেবু এবং স্থানীয় এক ধরণের চা। ভূমিক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে কফি, কোকো, রবার ও কাজুবাদামের চাষ সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে। কৃষিকার্য ছাড়া মিজোরা পশুপালনেও অভ্যস্ত।

## শিল্প সংক্রান্ত দিক

বয়নশিল্পে মিজো নারীদের একটা সহজাত প্রবণতা রয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন মিজো মেয়েরা তাঁত বোনা না জানলে তাঁদের বিয়ে হতো না। কাপড় বোনার জন্য প্রয়োজনীয় সুতো কিছুটা তাঁরা নিজেরা তৈরী করতেন এবং কিছুটা বাইরে থেকে কিনে আনতেন। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ছুতোর কাজ, কামারের কাজ, বাঁশের আসবাবপত্র ও ঝুড়ি তৈরীর কাজ অন্যতম।

স্বাধীনতার আগে মিজোরামে রাস্তা বলতে কিছুই ছিল না। আজকের অবস্থা অবশ্য অন্যরকম। সীমান্ত সড়ক সংস্থা রাজ্য পূর্ত বিভাগ এবং সহকারী কমিশনারের প্রশাসন বিভাগ প্রভৃতি এখন এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে। যার ফলে দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গেও রাজধানী শহর আইজলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। লুংলা (lunglah) ও আইজলের সঙ্গে কাছাড় ও শিলচরের সংযোগ যে রাস্তা সেই রাস্তা যে রাস্তা রক্ষা করে

মিজো যুবতীদের বংশ নৃত্য

# হিমালয়ান ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড

মানিক ব্যানার্জি

ভারতবর্ষের সমস্ত উত্তর এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বিরাট হিমালয়। যুগ যুগ ধরে এই হিমালয় স্থান পেয়েছে কবির কল্পনায়, লেখকের লেখনীতে। কিন্তু সভ্য জগতের আলো বা আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির খুব কম অংশই পৌঁচেছে এই হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে। যে সব অঞ্চলে কিছু কিছু যোগাযোগ হয়েছে সভ্য জগতের সঙ্গে তাও শুধু একমাত্র তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে।

ভারতে অবস্থিত হিমালয়---এর বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংখ্যা কিন্তু কম নয়। সব মিলিয়ে হবে এক কোটির মত কিন্তু সেই তুলনায় এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নেই বললেই চলে। যদিও ১৯৬২তে চীনের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে আমাদের নজর পড়েছে এই সব অঞ্চলের দিকে তবুও প্রয়োজনের তুলনায় এই সব অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির কাজ হয়েছে খুব কমই। তাই ভারতের এই সব অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য ভারত সরকারের নির্দেশে গঠিত হয়েছে এক হিমালয়ান ডেভেলেপমেন্ট বোর্ড। ভারতবর্ষের যে সব প্রদেশ এই হিমালয়ান ডেভেলাপমেন্ট-বোর্ড এ রয়েছে সেগুলি হল: উত্তর প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, নেফা এবং পশ্চিমবাংলা। ভারতবর্ষের এই সব অঞ্চলেই রয়েছে হিমালয়ের কোন না কোন অংশ।

এই বোর্ড বর্তমানে প্রধানত: যে সব সমস্যা নিয়ে বিবেচনা করবে তা হল (ক) যোগাযোগ (খ) সেচ প্রকল্প (গ) জল সরবরাহ (ঘ) বৈদ্যুতিক শক্তি।

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রদেশের নির্দিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উচ্চ কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন অফিসারদের নেওয়া হয়েছে এই বোর্ড —এর সদস্য হিসাবে। উপরের সমস্যাগুলির দিকে দেখলেই বোঝা যাবে যে যদি ঐ সব অঞ্চলের কোন উন্নতি করতে হয় তাহলে সবার আগে এই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে কারণ অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু জীবনযাত্রার পক্ষে এই জিনিস-গুলি একান্তই অপরিহার্য। কাজেই বিভিন্ন রাজ্যকে বলা হয়েছে তারা এই সব সমস্যার সমাধান এর পরিমাণ যেন বোর্ড এর কাছে পেশ করে।

পশ্চিমবাংলার উত্তর ভাগের দার্জিলিং জেলার সমস্ত অংশ ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ পড়েছে এই হিমালয়ের অঞ্চলের মধ্যে। পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা হল (ক) যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে যে সব রাস্তা আছে সেগুলি ছাড়া আরও কিছু নতুন রাস্তা তৈরী ও সম্প্রসারণ ও সংস্কার সাধন করা। এগুলি হল বিজন বাড়ী থেকে লোদামা বাজার অবধি এবং লোদামা থেকে মাল্লাক অবধি রাস্তা। কার্শিয়ং ও কালিম্পং-এর যোগাযোগকারী কালীঝোড়া তিনধরিয়া রোড। যে সব জায়গায় শুধু পায়ে চলার রাস্তা রয়েছে সেগুলিকে মোটর চলাবার মত উপযুক্ত করা হবে। আর যেগুলি অনেক পুরোনো হয়েগেছে সেগুলির সংস্কার ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করা হবে। এর জন্য খরচ পড়বে প্রায় ৩ কোটি টাকার মত।

(খ) সেচ: বর্তমানে এ সব অঞ্চলে সেচের কোন ব্যবস্থাই নেই বলা যেতে পারে। একমাত্র বৃষ্টির জল এবং কোন কোন জায়গায় অনেক দূরে দূরে অবস্থিত সাময়িক ঝরণার জলের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হয় যে সব জায়গায় এই সেচের পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই সব জায়গার জন্যে। এগুলি হোল: হল রম্মান থেকে শ্রীখোলা, রেলী খোলা কালিম্পং এর চেল নেওড়া অঞ্চল। এসব জায়গায় পাহাড়ী নদী থেকে জল দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা হবে। যেমন রম্মাম শ্রীখোলা অঞ্চলে রম্মান নদীকে কাজে লাগান হবে। এতে যে শুধু চাষের জন্যই জল পাওয়া যাবে তা নয় বিভিন্ন গৃহস্থলী কাজেও সুরাহা হবে। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে সাতকোটি টাকা। (গ) জল সরবরাহ শুধু যে জলের যোগান হলেই হবে তাত নয়, এই জলকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করার জন্য ধরে রাখারও দরকার। কাজেই এই জল ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ট্যাঙ্ক তৈরী করা হবে এবং এই সব জায়গা থেকে জল সমস্ত অঞ্চলে সরবরাহ করা হবে পাইপলাইনের সাহায্যে। বর্তমানে পাহাড়ী এলাকায় এই জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেক জায়গাতেই একমাইল বা আরোও বেশী দূর থেকে এবং অনেক উচু বা নীচু এলাকা থেকে এই জল বয়ে নিয়ে আসতে

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

# বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নতুন দিল্লীতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানগণের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১১ই মে, পঞ্চম যোজনায় আরও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাবগুলি এই সম্মেলন অনুমোদন করেছে। প্রস্তাবগুলি রচিত হয়েছে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয় এবং কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ আয়োগ কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধান কাজের ওপর ভিত্তি করে। ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে আরও ২১ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবহন ও প্রবাহ ব্যবস্থার প্রসারণের কথা ভেবেই এই কর্মসূচীর জন্য অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৬০০ কোটি টাকা। এই অংকটি হ'ল চতুর্থ যোজনায় ঐ বিষয়ে বরাদ্দকৃত অংশের (২৪৫০ কোটি টাকা) প্রায় তিন গুণ। প্রস্তাব অনুযায়ী যোজনার বছরগুলিতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এই আকারের একটি বিরাট পরিকল্পনা ঠিকভাবে রূপায়ণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক উৎপাদনকারী সংস্থা গঠন করার দরকার হবে এবং পার্লামেন্ট ইতিমধ্যেই এ বিষয়টি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। পরিকল্পনাটির রূপায়ণের জন্য দেশে ভারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী করে উপলব্ধ হবে তাই এই ধরনের যন্ত্রপাতির সময়মত সরবরাহ সম্ভবপর হয়ে না ওঠার আশংকাও দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্বই যখন সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মে অন্যতম ও প্রধান বিষয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরী করতে এবং আমদানির ওপর আমাদের নির্ভরতা কমিয়ে ফেলতে আমরা দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু যে সব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলি থেকে এখনই উৎপাদন পেতে গেলে অত্যাবশ্যকীয় কিছু যন্ত্রপাতি আমদানি আমাদের করতেই হবে। সম্মেলনে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ কথা বলেছেন। ডঃ রাও, লিংকন মাক্‌কি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন এই প্রকল্পে যে টারবাইন বসাতে হবে তারজন্য যদি আমরা দেশীয় উৎপাদনের ওপর ভরসা করে থাকি, তা হ'লে আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে তার মানে হ'ল এই দীর্ঘ সময় ধরে জাতির পক্ষে এই বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া।

এই কথা বিবেচনা করেই সম্মেলন এক ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিয়োগ করেছেন যার কাজ হবে সব সময়েই পারস্পরিক মত বিনিময় যাতে সম্ভব হয় সে বন্দোবস্ত করা এবং সর্ব ভারতীয় এবং আন্তঃ আঞ্চলিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং নীতিগুলির পর্যালোচনা করা। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে একটি হ'ল এই যে, দেশের কতকগুলি অংশে যে দারুণ বিদ্যুৎ—ঘাটতি দেখা দিয়াছে তা ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকার করে নেওয়া এবং এই ঘাটতি মেটাবার জন্য আগামী দু'তিন বছরের জন্য অর্থাৎ যতদিন না দেশীয় উৎপাদনের দ্বারা এই যন্ত্রপাতিগুলির চাহিদা মেটান যায়, ততদিন বিদেশ থেকে তা আমদানি করতে দেওয়া এবং এ জন্য অন্ততপক্ষে এই যন্ত্রপাতিগুলির ওপর আমদানি শুল্ক একবারে মকুব করা সম্ভব না হলেও তার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয়ের উপমন্ত্রী শ্রী বি. এন. কুরীলের সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। এই কমিটির কাজ হবে যে সব যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ইতিমধ্যেই অনুমোদন পাওয়া গেছে সেইগুলি ক্রয় সম্বন্ধে বিচার করে দেখা। জুন মাসের শেষে রাজ্য সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের যে সম্মেলন বসবে তাতে এই কমিটির রিপোর্ট পেশ করার কথা আছে।

অধিবেশনে ভাষণদান কালে ডঃ রাও গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন। ১২.৫ লক্ষ পাম্পসেট চালু করার জন্য চতুর্থ যোজনার যে লক্ষ্য ছিল, তার মধ্যে আট লক্ষ পাম্পসেট ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে একটি হ'ল, গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ সংস্থা কর্তৃক ১২০০ হরিজন বস্তি বিদ্যুতায়িত করার সহজ সর্তে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজের দুর্বলতম অংশের উন্নতি বিধান করা। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং গ্রাম বিদ্যুতীকরণ সংস্থা উভয়ের কাছ থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

## রেল আধুনিকীকরণ

৮ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে। এই ইস্পাত নগরীর যাত্রী ও মাল চলাচলের ব্যাপকতার কথা স্মরণ রেখে সেখানে এক আধুনিক মার্শালিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হচ্ছে। হাতিয়া-মুরি এবং বাজবেরা-বোকারো শাখায় ডবল লাইন বসানো হচ্ছে। এর জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। প্রস্তাবিত ভাইজাগ ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় রেল ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে গত দু'বছরে ইঞ্জিনীয়ারিং জরিপ কাজ সম্পূর্ণ করা হ...

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ যে কতখানি উন্নতি করেছে, তার প্রমাণ হোল তার সামগ্রিক অগ্রগতি। ১৯৬১-৬২ সালে এই রেলপথের মোট আয় যেখানে ছিল মাত্র ৭১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ১৯৭০-৭১ সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ালো ১৮০ কোটি টাকায় এবং লভ্যাংশের পরিমাণ বাদ দিয়ে প্রকৃত আয় ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ১৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং দ্রব্য সামগ্রী, বেতন, মজুরী প্রভৃতি বাড়া সত্ত্বেও' ৭০-৭১ সালে এই পরিমাণ ১৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

# আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

# ভেবে দেখুন

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হোক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

**সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়**

NIRODH

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

# নিরোধ

**লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ,রবারের জন্মনিরোধক**

**মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়**

# শরৎতীর্থ সামতাবেড়

চন্দ্রগুপ্ত

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শৈশবের শিশুশয্যা, বিহারের ভাগলপুর তাঁর যৌবনের উপবন ও হাওড়া জেলার বাগনান থানার সামতাবেড় গ্রাম তাঁর বার্দ্ধক্যের বারানসী। পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোবিন্দপুরে তাঁর দিদি অনিলাদেবীর শ্বশুর বাড়ী। হাওড়ার কাছে শিবপুরের বাস ছেড়ে শরৎচন্দ্র ১৯২৩ সালে সামতাবেড় গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর কোলে এগারোশো টাকা দিয়ে কিছুটা জমি কেনেন। এর উপর নিজের মনের মত করে তৈরী করেন টালিতে ছাওয়া এই বিরাট বাড়ী, বাগান আর পাকা বাঁধানো পুকুর। তখনকার সস্তাগণ্ডার বাজারে এই বাড়ী তৈরী করতে প্রায় সতেরো হাজার টাকা খরচ হয়।

হাওড়া, খড়গপুর সেকশনের দেউলটি ষ্টেশনে নেমে সোজা উত্তরে মাইল দুই মোটা বাঁধ ধরে হেঁটে গেলে রূপনারায়ণ নদীর ধারে পড়ে সামতাবেড় গ্রাম, অনেকে বলে পানিত্রাস। এই নিভৃত পল্লীর শান্ত আশ্রয়ে বসেই কথাশিল্পী তাঁর হরিলক্ষ্মী, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, অনুরাধা, সতী, পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত ৩য় ও ৪র্থ পর্ব, বিপ্রদাস, পথের দাবী, শেষের পরিচয় শীর্ষক কালজয়ী রচনাগুলি সৃষ্টি করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সামতাবেড়ের বাড়ীতে তাঁর বসবাস শুরু হতে না হতেই পল্লীসমাজের প্রকৃত চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেন। যে পল্লীবাসীদের দুঃখ ও দৈন্যের ভাগীদার হতে তিনি শহর ছেড়ে গ্রামে এলেন, যে প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ স্নেহ তিনি আজীবন উপভোগ করলেন, তারা একযোগে শুরু করল তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন। কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র এ গ্রামে থেকে নানা জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় নির্মিত 'সামতা বালিকা বিদ্যালয়' সমানে তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

সামনে নদী রূপনারায়ণ। তার অশান্ত বুকে সারি সারি পাল তোলা নৌকার ভীড়, মাঝে মধ্যে পাগলা হাওয়ার খেয়ালীপনার সঙ্গে ভেসে আসে ভাটিয়ালী সুর। উদাসী রূপনারায়ণ শত শত ফনা তুলে বিষধর ফনীনির মত ছুটে এসে তীরে আছড়ে পড়ে। বারান্দার কোণে একটি কাঁচে ঘেরা ঘরে বসে কথাশিল্পী এ সৌন্দর্য উপভোগ করতেন আর রচনা করতেন অমর কাহিনীগুলি যা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ শরৎ সাহিত্যের শেষ পর্বের উপর শান্ত গ্রাম সামতাবেড়ের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু একালের অনেক সারস্বতসাধকই পল্লীবাঙলার এই শরৎ তীর্থের খবর রাখেন না। অথচ মাঠ পেরিয়ে সামতাবেড়ের শরৎতীর্থে এসে হাজির হলে মনের অনেক আকাঙ্খাই নিবৃত্ত হবে। তাঁর ব্যবহৃত অজস্র গ্রন্থ, গৃহস্থালীর সম্পদ, দেব বিগ্রহ, পুকুরঘাট, পোষা পাখী, বাগানের মৃত প্রায় গাছ, পাণ্ডুলিপি, নানা আসবাব পত্র সব কিছুতেই সেই মহান শিল্পীর স্মৃতি জড়ানো। তবে অব্যবস্থাবশতঃ দূরাগত ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানোর জন্যে এখানে কেউই নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গৃহ সংশ্লিষ্ট সব কিছু নিজের হাতে নিয়ে নিলে সমস্যা বোধ হয় নিরবিত হোত।

মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার শ্যামচাঁদপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম হিরন্ময়ী দেবী। তিনি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেহরক্ষা করেন। সামতাবেড়ের বাসভবনের নিকটে তাঁকে দাহ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর চিতাভস্মের উপর একটি অতি ক্ষুদ্র সমাধি মন্দির আজও নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। গ্রামীন মানুষদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'সংসারে যারা দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা বঞ্চিত দুর্বল উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না . এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে—যাদের জন্যে মৃত্যুর পূর্বদিন

৩য় কভারে দেখুন

REGD. NO. D-23

★ ১৯৭১-৭২ সালে ভিলাই এ গম উৎপাদন হয়েছে ৩০.৭০ লক্ষ টোন। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ৫ লক্ষ টোন বেশী।

★ জোরহাটে অবস্থিত আঞ্চলিক গবেষণাগারে তেঁতুল পাতা থেকে টারটারিক এসিড তৈরীর এক নতুন পদ্ধতি বের করা হয়েছে। এই পাতা দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বছরে ১০০ টোন টারটারিক এসিড উৎপাদনক্ষম এক কারখানা স্থাপনের জন্যে মূলধন বিনিয়োগ কোরতে হয় সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয় পড়ে কিলোগ্রাম প্রতি ১১.৬৭ টাকা।

★ কেন্দ্রীয় সরকার আসামের নওগাঁয় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কাগজের কল খুলবেন। এর জন্যে প্রয়োজনীয় জরীপের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। প্রস্তাবিত কারখানায় বছরে ১ হাজার টোন কাগজ ও মণ্ড উৎপাদন হবে।

★ ১৯৭১-৭২ আর্থিক সালে ভারতের জাহাজী করপোরেশন ৭.২৫ কোটি টাকা লাভ করেছে। দেশের জাহাজী ব্যবসার অর্দ্ধেক হোল এই করপোরেশনের।

## মধু উৎপাদন

★ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের অধীনস্থ যে-সব প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতি মধু উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত, তাঁরা এ বছরে মধু উৎপাদন করেছেন গত বছরের চেয়ে ১২.৮ শতাংশ বেশী। ১৯৭০-৭১ সালে তাঁরা মধু উৎপাদন করেছেন ২১.৮৮ লক্ষ কিলোগ্রাম, যার মূল্য হোল—১.৩১২ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে মধু উৎপাদন হয় ১৯.৪ লক্ষ কিলোগ্রাম, যার মূল্য ছিল ১.১৬৪ কোটি টাকা।

আগের বছরের মত এবছরও তামিল নাড়ুতেই মধু উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়েছে। এর পরেই স্থান হোল মহীশূর ও কেরালার। তার পর পর আসে বিহার, ওড়িশা, আসাম ও পশ্চিম বাংলা। দেশে যত মধু উৎপাদন হয় তার ৯১ শতাংশের ওপর হয় এই সাতটি রাজ্যে।

১৯৭০-৭১ সালে মৌমাছি পালন করা হয় ২৮.৮৬০টি গ্রামে ; আর ১৯৬৯-৭০ সালে মৌমাছি পালন করা হয়েছিল ২৮,২১৯টি গ্রামে।

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

## নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুন: প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকার জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"<br>যোজনা ভবন<br>পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট,<br>নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

**"ধনধান্যে" পড়ুন**<br>**দেশকে জানুন**

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভীরেন্দ্র প্রিন্টাস করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কতৃক মুদ্রিত।

# ধনধান্যে

চতুর্থ বর্ষ : ২ ১লা জুলাই ১৯৭২ ২৫ পয়সা

## ভারতে কম্পিউটার শিল্প

## পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ★ ভারতের অর্থনীতি

## যুগবাণী

কোন গণতন্ত্রই অভাব, দারিদ্র ও অসাম্যের মধ্যে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না।

—জওহর লাল নেহেরু


# ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা।

১লা জুলাই ১৯৭২ : ৮ই আষাঢ় ১৮৯৪

Vol IV : No : 2 : July 1 1972


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।




সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রামের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা


### এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

# আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

## বাধ্যবাধকতা ও সুযোগ সুবিধা

জিনিভায় যে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের অধিবেশন সবে শেষ হোল। এই অধিবেশন চলে তিন সপ্তাহ ব্যাপী। ১১২টি দেশ থেকে প্রায় ১২০০ প্রতিভূ ও পরামর্শদাতা উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি নিয়োগকারী ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসেবে। এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—যন্ত্রবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে মানবীয় মূল্য। যন্ত্রবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির ফলে দেখা যাচ্ছে যে যন্ত্রই এখন মানুষের ভৃত্য না হয়ে প্রভু হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ডাইরেক্টর-জেনারেল শ্রী উইলফ্রেড জেনকস্ একটি রিপোর্টে বলেছেন যে যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে এক বিশ্বনীতি থাকা দরকার। শ্রী জেনকস্ এই সতর্কবাণী করেছেন যে মানুষের নিজের কল্যাণ উপেক্ষা করে অবাধে কারিগরী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যদি সে এগিয়ে চলে তাহলে সে পথে বিপদ রয়েছে। সুতরাং এমন পন্থা খুঁজে বার কোরতেই হবে যার দ্বারা যন্ত্রবিদ্যাকে এমন পথে চালিত করা যাবে যাতে, বিশ্ব শ্রমিক পরিপূর্ণ জীবনের সুখ ভোগ কোরতে পারবেন। সম্মেলনে, সরকারি বিশেষজ্ঞগণ এবং শ্রমিক ও মালিকগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রিপোর্টটি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নেদারল্যাণ্ডের ডঃ গারারড ভেয়েলড্ ক্যাম্পও তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে আন্তর্জাতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে তৎপরতা বৃদ্ধির জন্যে আবেদন জানান। তিনি তিনটি লক্ষ্যের কথা বলেছেন : (ক) উৎকৃষ্টতর মানবীয় পরিবেশ, (খ) সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা এবং (গ) কল্যাণমূলক কাজকর্ম ও সমৃদ্ধির সুসম বন্টন। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলেন যে বেশ কয়েকটি দেশে সামাজিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে এবং সেখানেদাতব্যের সংজ্ঞা পাল্টে গিয়ে সে জায়গায় এখন স্থান পেয়েছে সামাজিক অধিকার। আর এটা সম্ভব হয়েছে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সমঝোতার দরুণ। তবে, এদিকে আরও ঐক্য বদ্ধতার প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে সে উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কোরতে হবে,—পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কোরতে হবে, উপযুক্ত কার্য্যাবস্থা সৃষ্টি কোরতে হবে এবং অন্যান্য সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

অর্দ্ধশতাব্দীরও আগে এই সংস্থা স্থাপিত হয়। তখন এর প্রধান কাজ ছিল, শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সামাজিক ক্ষতি দেখা দেয় তা পূরণ করা এবং শিল্পায়নের দরুণ যে সব অসুবিধা দেখা দেয় তা দূর করা। বিগত দশকগুলিতে শিল্পায়ন পদ্ধতিতেই আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যেমন ধরা যাক্ অটোমেশন্। উৎপাদন পদ্ধতিতে এর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুঃখের বিষয় এই যে শ্রমিকগণ, বিশেষ দ্রুত পরিবর্তনশীল যন্ত্রবিদ্যার ফলে জড়যন্ত্রবৎ এবং ক্রিয়াশীল জীবে পরিণত হচ্ছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আকার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠছে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে। সৌভাগ্য বশতঃ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে এই নিদারুণ অবস্থা এড়াবার উপায় রয়েছে, যদি তাঁরা অন্ধভাবে এই পথ অনুসরণ না করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং গঠন মূলকভাবে এই নূতন যন্ত্রবিদ্যাকে কাজে লাগান। গরীব দেশগুলির জন্যে কি ধরনের যন্ত্রবিদ্যা প্রয়োজ্য এবং কি ভাবে তাঁরা এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার কোরতে পারবেন তা স্থির করার দায়িত্ব অনেকখানি রয়েছে উন্নত দেশগুলির হাতে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এবং সম্মেলনে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী আর. কে. খাদিলকর তাঁর ভাষণে এই বিষয়টিরই উপর জোর দিয়ে বলেন যে এর ধরন, পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বেশ কিছু গবেষণার প্রয়োজন এবং আই. এল. ও-র মাধ্যমেই এর উত্তম ব্যবস্থা সম্ভব।

অটোমেশন ও যন্ত্রবিদ্যার ভয়াবহ আধিপত্য এড়ানো ছাড়াও

আই. এল. ওর গুরু দায়িত্ব রয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা এবং মেহনতী মানুষ ও সমাজের দুর্বলতর সম্প্রদায়ের প্রতি অধিকতর দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করার। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা স্থাপনে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলি যাতে তৎপর হয় এবং ক্রমোন্নত দেশগুলি যাতে আরও অধিক মাত্রায় তাঁদের জাতীয় আয়ের অংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্য্যসূচীতে ব্যয় কোরতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্যে হয়তো আই. এল. ওর নতুন ধরণের বৈঠকের আয়োজন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

এ বিষয়ে অভিভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী খাদিলকর বলেন মানুষ ও তার সভ্যতাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা প্রয়োজন। অবিশ্যি ক্রমোন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা ততো প্রকট নয় যত প্রকট শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। তবে ক্রমোন্নত দেশগুলি যেমন আমাদের দেশ এই প্রকটনের জন্যে যদি অপেক্ষা করে, তাহলে সেটা হবে এক নিবুদ্ধিতার কাজ। এক্ষেত্রে আমাদের খানিকটা সুবিধে রয়েছে—অন্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লাভবান হতে পারি। সুতরাং উন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার জন্যে, ক্রমোন্নত দেশগুলি যেন অনিয়ন্ত্রিতভাবে যন্ত্রবিদ্যা প্রয়োগের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন থেকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়।

এ পথে ঝুঁকি খুব বেশী রকম। দরিদ্র দেশগুলিতে বেকারী সমস্যা খুবই বেশী এবং জনগণের নিদারুণ দারিদ্র এরই প্রত্যক্ষ ফল। এমন ভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে যাতে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই দারিদ্র একেবারে দূর না হলেও যেন বেশ খানিকটা হ্রাস পায়। ত্বরায় দারিদ্র মোচনের পথে অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের ঝুঁকি রয়েছে। তবে সুখের কথা এই যে সম্প্রতি এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা দেখা দিয়েছে। ডিরেক্টর জেনারল তাঁর রিপোর্টে এই বিষয়টির ওপরই জোর দেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে ক্রমবর্দ্ধমান দেশগুলির পক্ষে উন্নত দেশগুলি থেকে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রবিদ্যা আমদানি করা সমীচীন হবে না। কারণ এই অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব নেই, মূলধনের যোগান কম এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সীমিত। আমাদের দেশেই আমরা ২০ বছর ধরে সুপরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের পথে এগিয়েছি এবং আমাদের অগ্রগতি ও সাফল্য নেহাৎ কম নয় কিন্তু এ সত্ত্বেও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে এই অগ্রগতি ও সাফল্য পুরোপুরি ভাবে সমাজের দুর্বলতর সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়নি। এই কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের কলাকৌশলে রদবদলের বিষয়ে পুণঃবিবেচনা করে দেখা হচ্ছে যাতে এ যাবৎ যে-সব অসমতা দেখা দিয়েছে সেগুলি দূর হয় এবং সমাজের দুর্বলতর সম্প্রদায় ও শ্রমিক শ্রেণী আরও বেশী সুখ সুবিধা ভোগ কোরতে পারেন।

ক্রমোন্নত দেশগুলিতে ত্বরায় এবং আরও সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে যদি শ্রমিক ও মালিক সংস্থাগুলি উন্নয়নের কাজে ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে নির্ভুল পন্থা বেছে নেয়। তাহলেই এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সামাজিক কাঠামো স্থির করা আই. এল. ওর কাজ নয়। তথাপি এর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি নিয়োগকারী ও শ্রমিকগণের প্রতিভূগণ সেই সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এর দ্বারা যে এক সুষ্ঠু পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয় তাতে কোন সন্দেহই নেই। বর্ত্তমান সম্মেলন যে এদিকে সফল হতে পেরেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

# সাম্প্রতিক পটভূমিকায় ভারতের অর্থনীতি

সত্তরের বর্তমান দশকে এক সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ক্রমবিকাশ সূচিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবার পরেই আমাদের কাছে স্বয়ম্ভরতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ শুধুমাত্র হ্রাস করেই নয়, তা সম্পূর্ণ বর্জন করে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে কতটা বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারে তা যাচাই করে দেখবার প্রকৃষ্ট সুযোগ এসেছে। সাফল্যের প্রমাণও বহু ক্ষেত্রে মিলেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতিও রয়ে গিয়েছে। তাই সামগ্রিক ভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে পারলে আমাদের অগ্রগতি ও লক্ষ্যপথ সম্পর্কে কিছুটা হদিস মিলতে পারে।

১৯৬৯-৭০ সালে বর্তমান চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কার্যকাল সুরু হয়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬ শতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার প্রথম দুটি বছরে জাতীয় আয় যথাক্রমে ৫.৩ ও ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমান ভাবে কৃষির উন্নতি বার্ষিক উৎপাদনের গড় মাত্রাকে অতিক্রম করে ৫.২ শতাংশে পৌঁছেছে। শিল্পে উন্নতি অবশ্য সেরকম আশানুরূপ হয়নি। পূর্ববর্তী বছরের ৬.৮ শতাংশের পরি-প্রেক্ষিতে আলোচ্য বছরে শিল্পে উৎপাদনের হার ছিল ৫ শতাংশ। কয়েকটি প্রধান শিল্পে, বিশেষতঃ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলিতে, উৎপাদনে ভাটা পড়ে যায়, সেজন্যই সার্বিক অগ্রগতির মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

বিগত কয়েক বছরের উৎপাদনের গতি প্রকৃতি আলোচনা করলে যে বিষয়টি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল কৃষির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। চতুর্থ যোজনার পর পর দুটি বছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে দশ কোটি ও সাড়ে দশ কোটি টন গম, জোয়ার এবং অনেকাংশে ধানের ক্ষেত্রেও বিপুল ফলন

## শ্রীঅমর নাথ দত্ত

আজ এক স্বীকৃত সত্য, তৈলবীজ উৎপাদ-নের ক্ষেত্রেও উৎপাদন মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। সুখের কথা এই যে ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল সেগুলি প্রায় সর্বতোভাবে আজ সাফল্য লাভ করেছে, যার ফলে আমরা আজ খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী করার কথা চিন্তা করছি। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ও পশুপালন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। আশা করা যায় যে, বর্তমান বছরে অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে খাদ্যশস্যের ফলন ১১ কোটি টনের মাত্রাকে অতিক্রম করে যাবে। তবে এক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রয়োগে যেমন সুফল পাওয়া গিয়েছে তেমনই পর পর কয়েকটি ভাল আবহাওয়া-যুক্ত মরশুমও আমরা পেয়েছি। এজন্যই আমাদের আরও বেশি সতর্ক থাকা দরকার যাতে হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে না আমাদের পড়ে যেতে হয়। আবার তেমনিভাবেই সমান লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন পাট, তুলো ও আঁশজাত সামগ্রী প্রভৃতির উৎ-পাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই উদ্দেশ্যে সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত করে যেতে হবে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্পগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। গ্রামাঞ্চলে কৃষির প্রসার সংগঠন ও জমির বণ্টন প্রভৃতি কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে মজুত খাদ্যভাণ্ডার গঠনের বিষয়টি যথাযথভাবে চতুর্থ যোজনার কর্মসূচিতে স্থান পেয়েছে। ৫০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য নিয়ে এই মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খাদ্যশস্যের বিশেষতঃ গমের অধিকতর ফলনের জন্য গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ৪৯ লক্ষ টনের এক মজুত গমের ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ৯০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের মোট মজুত গড়ে তোলা হয়েছে। প্রধানতঃ এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা হওয়া সত্ত্বেও আমরা বাংলাদেশ থেকে আগত [illegible] কোটি উদ্বাস্তু অধিবাসীর চাহিদা মিটিয়ে খাদ্য ভাণ্ডারে সন্তোষজনক পরিমাণে খাদ্য মজুত রাখতে সক্ষম হয়েছি। সেই সঙ্গে উৎপাদনের প্রতি ন্যায্য দাম প্রদান এবং অন্যদিকে ক্রেতার জন্য স্থিতিশীল অথচ উপযুক্ত মূল্যে খাদ্য বিক্রয় ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। তবে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, আর তা হল খাদ্য—ঋণ লগ্নীর ব্যাপারে। খাদ্য কর্পোরেশনকে মজুতের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রদান করে অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ সম্প্রসার-ণের বিশেষ সুযোগ থাকবেনা। কাজেই

পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এই প্রশ্নটিকে সমাধান করতে হবে।

উন্নত কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রেরণা আসবে শিল্প ক্ষেত্র থেকে। শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা যত ব্যাপক হবে অর্থনীতির প্রসার ততই সুবিস্তৃত হবে এবং দুটি বছরে যে সমস্ত কারণে শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (১) কয়লা, রেল ওয়াগন, মেসিনের অংশ সমূহ, কাগজ, সূতীবস্ত্র ও অপরাপর কিছু শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় কাঁচামালের ঘাটতি, (২) সুতীবস্ত্র, এঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসমূহ, চিনি প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় কাঁচামালের ঘাটতি ও অনিয়মিত সরবরাহ (৩) দেশের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল সমূহে বিদ্যুত সরবরাহের ঘাটতি, (৪) ইস্পাত, সার, ভেষজ শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি; (৫) সিমেন্ট, কয়লা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বশেষ হল দেশের পূর্বাঞ্চলে ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ ও পরিচালন ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যা।

সুতরাং দেখা যায় যে, ফলশ্রুতি হিসেবে শিল্পের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সমূহে যথাযথভাবে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় উৎপাদন বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে লৌহেতর ধাতু সামগ্রী, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, সিমেন্ট পেট্রো-রসায়ণ, কস্টিক সোডা ও সোডা এ্যাসের মত ভারী রসায়ণ, মোটরগাড়ীর টায়ার টিউব ও ইলেকট্রিক দ্রব্যাদি প্রভৃতি। সরকারী উদ্যোগে কতকগুলি প্রকল্পের কার্যারম্ভ দেরী হওয়ায় তেমন ফল পাওয়া যায়নি। আর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পের মন্থরগতির প্রধান কারণ হল পূর্ব পূর্ব বছরের মন্দা ও হালফিল ১-৪ বছরের শ্রমিক অশান্তি ও নতুন উদ্যোগের একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই লাইসেন্স প্রদানের পরেও নানান সুযোগ সুবিধার অভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়নি অথবা কাজ সুরু হলেও গতি মন্থর হয়ে পড়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে, শিল্পোন্নতির বিকাশে অনেকখানি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা গিয়েছে। শিল্পে অব্যবহৃত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হলে তা কার্যকর করা যাবে। কৃষির বিশেষ উন্নতি ঘটায় গ্রামাঞ্চলে শিল্প পণ্যের চাহিদা সুবিস্তৃত হয়েছে। এজন্য বহুমুখী শিল্প ব্যবস্থার সুদৃঢ় বনেদও গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। শিল্পে প্রশিক্ষণের পরিধি অনেকটা ছড়িয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে নব নব শিল্পোদ্যোগের দায়িত্ব বহন করবার জন্য বহু তরুণ ব্যবসায়ী আজ সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। অবিশ্যি শিল্প নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের কার্যসীমা ও পরিধি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক বিভাজন, মালিকানার সম্প্রসারণ, অনুন্নত অঞ্চলের বিকাশ ও ক্ষুদ্র শিল্প, বিশেষতঃ গ্রামীণ শিল্পগুলির ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন। এটা সন্তোষের কথা যে, আলোচ্য কর্মসূচী পঞ্চম যোজনায় বিশেষভাবে বিবেচিত হতে চলেছে।

পরিকল্পনার প্রথমার্দ্ধে মূল্যস্তরের ওঠানামা খুব একটা উৎসাহের সঞ্চার করেনি। প্রথম বছরে মূল্যস্তরের গড় সূচক ৩.৭ শতাংশ ও দ্বিতীয় বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকে। ডাল জাতীয় শস্যের উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় মূল্যস্তরে যে বৃদ্ধি দেখা যায় তা অন্যান্য দানাজাতীয় শস্যের বর্দ্ধিত উৎপাদনে কিছুটা প্রভাবিত হয়। কিন্তু শিল্পের কাঁচামালের উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় মূল্যস্তর ঊর্দ্ধের দিকে থাকে। বিশেষতঃ কার্পাস ও আখের উৎপাদন মূল্যস্তর চড়ার দিকেই যায়। সেই সঙ্গে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের যোগান পরিকল্পনায় প্রথম বছরে ১০.৫ শতাংশ ও দ্বিতীয় বছরে প্রায় ১২ শতাংশের মত বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয়ের প্রকৃত বৃদ্ধি অপেক্ষা অর্থ সরবরাহ অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি হওয়ায় মূল্যস্তরের স্থিরতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের অর্থনীতি এক দারুণ সঙ্কটে সমুত্তীর্ণ হয়েছে যখন বাংলাদেশ থেকে আগত ১ কোটি উদ্বাস্তু অধিবাসীর চাহিদা মিটিয়েও নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্যস্তরে সম্ভাব্য সকল প্রকার বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

বর্ত্তমান চতুর্থ যোজনার প্রথম দু'টি বছরে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল অবস্থা পরিলক্ষিত হয় ঐ সময়ে আমদানী আশাতীত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মত। আনন্দের কথা এই যে, তা সম্ভব হয়েছে খাদ্য বহির্ভূত বহু প্রকার সামগ্রীর ক্ষেত্রে। রপ্তানির ক্ষেত্রে অবশ্য সেরকম অগ্রগতি দেখা যায়নি। বাৎসরিক ৭ শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রায় প্রকৃত রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ হ'ল প্রথম বছরে ৪.৩ শতাংশ ও দ্বিতীয় বছরে ৮.৩ শতাংশ, অর্থাৎ গড়ে বাৎসরিক হার হ'ল ৬.৪ শতাংশ। মোট হিসেবে আমদানীর পরিমাণ ২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ওই সময়ে রপ্তানি প্রায় ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আমাদের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর অবদান অনেকখানি উল্লেখের অবকাশ রাখে। তবে ইস্পাত ও কাঁচামাল, এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবের দরুণ ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য রপ্তানি ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির লক্ষ্য মাত্রা ১৪০

৪র্থ কভারে দেখুন

# পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৪-৭৯) খসড়াটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছেন। এই খসড়া নথিতে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও প্রগতিশীল নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে।

বস্তুত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হ'তে এখনও দু'বছর বাকী আছে তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের আর্থিক উন্নয়নে একটি অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে; বিশেষ করে এই সময়ে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য তথা 'সবুজ বিপ্লব' ভারতের সুস্থ অর্থনীতির লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। কৃষির উৎপাদনের হার ৫% এর অধিক হওয়ায় দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু কৃষিই দেশের আর্থিক উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়। তাই চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নয়ন প্রতি বছর ৮-১০% হারে করার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়ণ থেকে দেখা যায়, শিল্পের উৎপাদন এই সময়ে আশানুরূপ হয়নি। ১৯৬৮-৬৯ সালে শিল্প উৎপাদন ৬.৬% হারে, ১৯৬৯-৭০ সালে ৬.৯% হারে বৃদ্ধি পায়। এই উৎপাদনের হার ১৯৭০-৭১ সালে ৩.৫% হারে নেমে আসে। যদিও এই ধরণের হিসাব শিল্পোন্নয়নের একমাত্র পরিমাপক নয়, তবুও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদনের সময়ে এই কথা স্বীকার করেছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে অসাম্য আছেই এবং উন্নয়নের সুফল সবস্তরের লোকেদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়নি।

এই বাস্তব অভিজ্ঞতাটি সামনে রেখেই পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়াটি রচনা করেছেন এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে উন্নয়নের অসাম্য দূরীকরণ এবং দেশের কৃষি শিল্পের উন্নয়নের সুফল যাতে করে সর্বস্তরের জনসাধারণের হাতে গিয়ে পৌঁছায় তার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শঙ্কর নাথ ঘোষ

দারিদ্র্য ও বেকারী প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজের অভিশাপ। ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় তাই মৌল নীতিই হ'ল বিভিন্ন উপায়ে দেশ থেকে দারিদ্র্যের পাপচক্র দূর করা এবং কৃষি ও শিল্পের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ভারতের পরিকল্পনার ২০ বছর কেটে গেলেও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা যায়নি আর বেকার সমস্যাও দিন দিন তীব্রতম হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'গরিবী হটাও' নীতিকে অনুমোদন করে দারিদ্র্য ও বেকারীর প্রতি 'প্রত্যক্ষ' আক্রমণ যথার্থই হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সুষম বন্টনের মাধ্যমে জনসাধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবার প্রচেষ্টাই পঞ্চম পরিকল্পনার মূল ও প্রধান লক্ষ্য।

মূলতঃ এই পরিকল্পনায় মূল কয়েকটি লক্ষ্যের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যগুলি হল :—

(১) ভোগ্যদ্রব্যের হার বাড়ান :— এর ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিকে রোধ করা সম্ভব হবে এবং সাধারণকে জীবনযাত্রার মান উন্নত পর্য্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম করে দেবে।

(২) নিবিড় কার্য্যসূচী প্রণয়ন এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(৩) বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ এই পরিকল্পনার শেষে একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনা।

অর্থাৎ স্বনির্ভরশীলতার পথে ভারতের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা, এই যোজনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা।

এই সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়াটিতে মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভিত্তিতে নিম্নরূপ কার্য তালিকা গ্রহণ করেছেন :—

(১) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

৩য় কভারে দেখুন

# আগামী দু' বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ংভরতা লাভ করবে

রাজ্যের কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী আবদুস সত্তার আগামী দু' বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য শস্যের ব্যাপারে স্বয়ংভর করে তোলার জন্য একটি ৫৬ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন গত ১৮ই মে।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য দুটি, এক, খাদ্যে স্বয়ংভরতা এবং দুই, গ্রামীণ কর্মসংস্থান।

খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে এখন বাৎসরিক ঘাট্‌তি দেখা যায় ১০ লক্ষ টোনের মত। ১৯৭১-৭২ সালে এই রাজ্যের খাদ্য শস্যের উৎপাদন আশা করা যাচ্ছে ৭৬ লক্ষ টোনের মত হবে, কিন্তু ১৯৭৪ সালের শেষ নাগাৎ রাজ্যে খাদ্যের প্রয়োজন প্রায় ৮৬ লক্ষ টোনে দাঁড়াবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের প্রাপ্তি সুলভতা আর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি থেকে নিশ্চিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার জন্যই ইদানিং, কালে আর সেই পুরোনো নিয়মে আমন ধান চাষের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেনা। এখানকার জলবায়ুই এমন যে, গ্রীষ্মের সময় পর্যাপ্ত ও নিশ্চিত জল সেচের সুবিধা যেখানে পাওয়া যায় সেই সব জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান সর্বাধিক পরিমাণে ফলে থাকে। স্বভাবতই যেখানে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি থেকে বরাবর জলের সরবরাহ পাওয়া যায়, সেখানে চাষীরা আমন ধান চাষের অনিশ্চিত ফলনের ঝুঁকি না নিয়ে গ্রীষ্ম কালীন ধানের চাষে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

## ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচী

১৯৭১-৭২ সালে, চাষীরা যাতে একই জমিতে এক বছরে বহু রকমের ফসল চাষ করতে পারে এবং বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ধানের চাষ করতে পারে, সে জন্য রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ একটি বিরাট 'ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প' রূপায়ণের কাজে মন দেন। বার্ষিক পরিকল্পনায় যা বন্দোবস্ত করা ছিল, তার তিনগুণ কাজের এক কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হয়, মাত্র ছ' মাসের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কর্মসূচীর রূপায়ণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তারফলে ছ' মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ২,৩৬,৭০০ একর জমিকে অবিরাম সেচ ব্যবস্থার অন্তর্গত করা সম্ভব হয়েছে। এরদ্বারা এই রাজ্যের শুধু চাল উৎপাদন ক্ষমতাই বেড়েছে প্রায় ৩.৫৫ হাজার টোন। এই প্রকল্প অনুযায়ী ৬৪টি গভীর নলকূপ, ৫,৮০০টি অগভীর নলকূপ, ২৩০টি নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্প এবং ১১,৩০০ পাম্পসেট বসান হয়েছে—এই সব কিছু করা হয়েছে মাত্র ছ' মাস সময়ের মধ্যে, যখন দেশ অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে—শরণার্থী আগমন, বাংলাদেশে যুদ্ধ, যানবাহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

## গ্রীষ্মকালীন ধান

আগামী দু' বছরের মধ্যে খাদ্য শস্যের ঘাট্‌তি দূর করার জন্য, কৃষি বিভাগ একটি বিশেষ কর্মসূচীতে হাত দিয়েছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী এই সময়ে আরও অতিরিক্ত ৮ লক্ষ একর জমি গ্রীষ্মকালীন ধান চাষের আওতায় আসবে এবং তারফলে বোরো ধানের প্রতি মরশুমে ১২ লক্ষ টোন করে অতিরিক্ত খাদ্য শস্যের উৎপাদন হবে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আসার ফলে বোরো ধান ছাড়াও আরও ৮ লক্ষ টোন অতিরিক্ত খরিফ ধান এবং ৩ লক্ষ টোন তৈলবীজ উৎপন্ন হবে। বরাবর সেচ ব্যবস্থার মধ্যে আছে ৮৮২টি নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্প, ১০৪৩টি গভীর নলকূপ, ৩৩,৩৫০টি অগভীর নলকূপ এবং ১৪,২৫০টি অল্প শক্তির পাম্পসেট। কৃষকদের মধ্যে এই পাম্পসেটগুলি বিলি করে দেওয়া হবে মাঝারী ধরণের ঋণদানের ভিত্তিতে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মোট ব্যয় হবে ৫৬ কোটি টাকা।

## কর্মসংস্থানের সুযোগ

এই প্রকল্পে যে পরিমাণে কর্মসম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, তার পরিমাণ হ'ল মোট ১৮,৩১,৯০,০০০ জন লোকের এক দিনের কাজের সমান। এর অর্থ হ'ল, একই জমিতে এক বছরে একাধিক রকমের ফসল চাষ করার জন্য ১৩,১৫,৯০,০০০ শ্রম-দিন বোরো ধান চাষ করার জন্য ৯,৯৮,৪০,০০০ শ্রমদিন এবং রবি শস্য চাষের জন্য ৩,৮০,০০,০০০ শ্রমদিন। একজন লোকে সারা বছরের কাজ বলতে যদি ২৫০টি শ্র

# পশ্চিম বঙ্গ বাজেট

## বার্ষিক যোজনার জন্যে অতিরিক্ত কর প্রস্তাব

## ক্ষুদ্র শিল্প প্রসার পরিকনা—শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন

সোমবার ২৬শে জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যের ১৯৭২-৭৩ সালের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন অর্থ মন্ত্রী শ্রী শংকর ঘোষ। এই চূড়ান্ত বাজেটে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। রাজস্ব খাতের বাইরে আয় বাবদ ৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ধরলে চলতি বছরে বর্তমান হিসাব অনুযায়ী সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এর সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পদ সংস্থান বাবদ ১০ কোটি টাকা ধরা হলে চলতি বছরে সামগ্রিক ঘাটতি [illegible] দাঁড়াবে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায়। অর্থমন্ত্রী বলেন, ৫৭৬ কোটি টাকার বাজেটে এই ঘাটতি একটা বিরাট কিছু নয়।

১৯৭২-৭৩ সালের চূড়ান্ত বাজেটে যদি প্রারম্ভিক তহবিলের ২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঘাটতি ধরা হয় তাহলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; অবিশ্যি এর মধ্যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ বাবদ ১০ কোটি টাকা যদি না ধরা হয়।

অর্থমন্ত্রী যে-সব কর খাতের উল্লেখ করেন তার মধ্যে আছে—(১) টিকিটের মূল্য অনুসারে ক্রমবর্দ্ধমান হারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে প্রবেশ মূল্য বৃদ্ধি; (২) হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ক্যাবারে প্রমোদানুষ্ঠান ও বিলাস ব্যবস্থা থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন; (৩) মূল্যবান খাঁটি ও কৃত্রিম পাথর, খাঁটি, কৃত্রিম অথবা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করা মুক্তা, সোনা ও রূপার তৈরী তারের কারুকার্য, পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি, গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি কতকগুলি ভোগ্য বিলাস পণ্যের ওপর উচ্চ হারে করধার্যের প্রস্তাব। (৪) ষ্ট্যাম্প শুল্কের হার বৃদ্ধি; (৫) বোঝাই করা মালের ওজন অনুযায়ী ক্রমবর্দ্ধমান হারে মোটর যানগুলির উপর ধার্য্য করহার সংশোধন ও বড় যাত্রীবাহী গাড়ির ওপর করহার বৃদ্ধি এবং (৬) ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধি।

কর ধার্য্যের যুক্তি দেখিয়ে শ্রী ঘোষ তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩২২.৫০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ হোল ২২১ কোটি টাকা এবং রাজ্যের আনুমানিক সম্পদের পরিমাণ ১০১.৫০ কোটি টাকা। এই ১০১.৫০ কোটি টাকার মধ্যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করে রাজ্যের ৭০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা ছিল। গত তিন বছরে রাজ্য সরকার যে অতিরিক্ত কর সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন তাতে এ পর্যন্ত মাত্র ২৯ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়েছে। বাকী থাকে ৪১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৯৭২-৭৩ সালে ১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা।

১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক যোজনায় পশ্চিমবঙ্গে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্য থেকে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭২-৭৩ এ ১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা এবং বাকিটা পূর্ববর্ত্তী বছর গুলিতে গৃহীত ব্যবস্থা থেকে আসবে। অবশিষ্ট অর্থ আসবে, বাজার ঋণ হিসাবে ১৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসেবে ৪০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা—মোট সাড়ে ৭৩ কোটি টাকা। শ্রী ঘোষ বলেন, এই টাকা তুলতে না পারলে যোজনার আয়তন [illegible] উন্নয়ন কর্ম-সূচীতে ছাঁটাই [illegible]

ভূমি রাজস্বের হার সংশোধনের প্রস্তাব [illegible] অর্থমন্ত্রী [illegible], পশ্চিমবঙ্গে ভূমি [illegible] একর প্রতি মাত্র ৪.৫০ টাকা [illegible] মহারাষ্ট্রে ১৬.৭০ টাকা, তামিল নাড়ুতে ১১.৭৮ টাকা এবং অন্ধ্র প্রদেশে ১৮.৩৩ টাকা।

এ ছাড়া মহারাষ্ট্রে প্রতি একর জমিতে ফসল ভিত্তিক ১০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত খাজনা ধার্য করা আছে। ভূমি রাজস্বের হার সংশোধন করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা সাধারণত গ্রামীণ উন্নয়নে বিনি-

যোগ করা হবে। পূর্ত সংক্রান্ত কাজেও খাজনার হার বৃদ্ধির প্রস্তাব আছে।

ভূমির ব্যবহার ও সংস্কার প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ বলেন ১৯৫৩ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিগ্রহণ আইনে' জমির মালিক পিছু সর্বোচ্চ ২৫ একর কৃষি জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ আইন প্রয়োগের ফলে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত মোট ২৪.০৪ লক্ষ একর জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। এর মধ্যে ৬.৪৮ লক্ষ একরের দখল নেওয়া হয়েছে এবং ৪.১১ লক্ষ একর ইতিমধ্যেই বন্টন করে দেওয়া হয়েছে।

নতুন উর্দ্ধসীমার উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিধান সভায় গৃহীত জমির উর্দ্ধ-সীমা সংক্রান্ত আইনে প্রাক্তন রায়ত পিছু সর্বোচ্চ সীমা ২৫ একর থেকে কমিয়ে সেচ এলাকায় ১২.৩৬ একর এবং অন্যান্য এলাকায় ১৭.৩০ একর করায়, আরও দু থেকে তিন লক্ষ একর জমি বন্টনের জন্যে পাওয়া যাবে বলে সরকার আশা করছেন। পল্লী অঞ্চলে গৃহনির্মাণ এবং বিশেষ কর্ম-সংস্থান প্রকল্পের জন্যে ২.১৮ কোটি টাকা বিবিধ ও অন্যান্য খাতে ধরা হয়েছে।

বাসগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার উল্লেখ করে বলা হয় যে, চতুর্থ পরিকল্পনা কালে ৭,১০০টি ফ্ল্যাট তৈরীর লক্ষ্য স্থির করা হয়। ১৯৭১-৭২ এর শেষ পর্য্যন্ত ৪০০০ ফ্ল্যাটের নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে আরও দেড় হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা স্থির হয়েছে ১০ লক্ষ। ফলে ৬—১১ বছরের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়নরত শিশুর শতকরা হার ৭২.৮৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪-এ হবে ৭৭.৬৮।

শিল্প বৃদ্ধির আবহাওয়ার উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, সামগ্রিকভাবে শিল্পে উন্নতি দেখা দিয়েছে। শিল্প লাইসেন্স প্রাপ্তির সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। হলদিয়ায় ১৪ বর্গ মাইল এলাকা দখল করা হয়েছে।

১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে রাজ্য সরকার বহু সংখ্যক রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প খুলতে পেরেছেন। ফলে প্রায় ৬০ হাজার কর্মীর পূর্ব পদে বহাল হওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৯৭১ সালে অক্টোবর মাসে রাজ্যের সর্বত্র ২ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা স্থাপনের একটি কর্মসূচী চালু করা হয়। এই সূচী অনুসারে এ পর্য্যন্ত ১,৩৬৬টি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এ গুলিতে ৯ হাজারেরও বেশী লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

খরা ও ত্রাণ বাবদ ব্যয়ের উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, খরার ফলে আউশের ক্ষতির পরিমাণ ৩ লক্ষ টন, এর মূল্য ৩৬ কোটি টাকা। পাটের ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ গাঁট—মূল্য ৩০ কোটি টাকা। বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে ১২'৯৬ কোটি টাকার মত। রাজ্য সরকার টেস্ট রিলিফ বাবদ ৩ কোটি, নলকূপ বসানো বাবদ ২.৩০ কোটি খয়রাতি সাহায্য বাবদ ১'৪২ কোটিএবং ত্রাণ বাবদ ঋণ খাতে ব্যয়টাকা আরও অতিরিক্ত ২.১৫ কোটি অর্থবা বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন।

শ্রী ঘোষ বলেন, ১৯৭২-৭৩ সালে আর একটি অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৫ কোটি টাকার মত রাজ্য সরকারের কর্মচারী বর্গকে মহার্ঘ ভাতা দেবার জন্যে। ১৯৭১ সালে ১লা অক্টোবর থেকে এই মহার্ঘ ভাতার হার বলবৎ হয়েছে।

## এ্যালয় ষ্টীল প্লানট্

পশ্চিম বাংলার এক অতি অনগ্রসর এলাকা পুরুলিয়া জেলার মধুদুখনায় একটি সুসম্বদ্ধ এ্যালয় ষ্টীল প্লানট স্থাপনে ভারত সরকার সম্মত হয়েছেন। এর জন্যে ব্যয় হবে ৪১.৮২ কোটি টাকা।

এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদনী ক্ষমতা থাকবে ৩৭.৫০০ টন।

প্রস্তাবিত এই কারখানার স্থানটি হোল কলকাতা থেকে ২২০ কিলোমিটার এবং আসানসোল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে। জায়গাটির সঙ্গে রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। কারখানা এবং জনপদ নির্মাণের জন্যে ৩০০ একর জমির প্রয়োজন।

রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, জেনারল এ্যালয় ষ্টীল লি: এবং ফাগারসুতা আক্তিবোলগ্ নামে সুইডেনের একটি প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে এই কারখানাটি স্থাপন কোরবেন।

৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে এটি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রথমে প্রায় ৫ হাজার ব্যক্তির কর্ম সংস্থান এতে হবে এবং পরে কারখানাটি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে প্রায় ১০ হাজার ব্যক্তির কর্ম সংস্থান হবে।

উপস্থিত যে-সব জিনিষ আমদানী কোরতে হয় এই কারখানায় তার বেশীর ভাগ উৎপন্ন হবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের শিল্পে ব্যবহারের জন্যে নানা রকমের কাঁচামাল এখান থেকে পাওয়া যাবে।
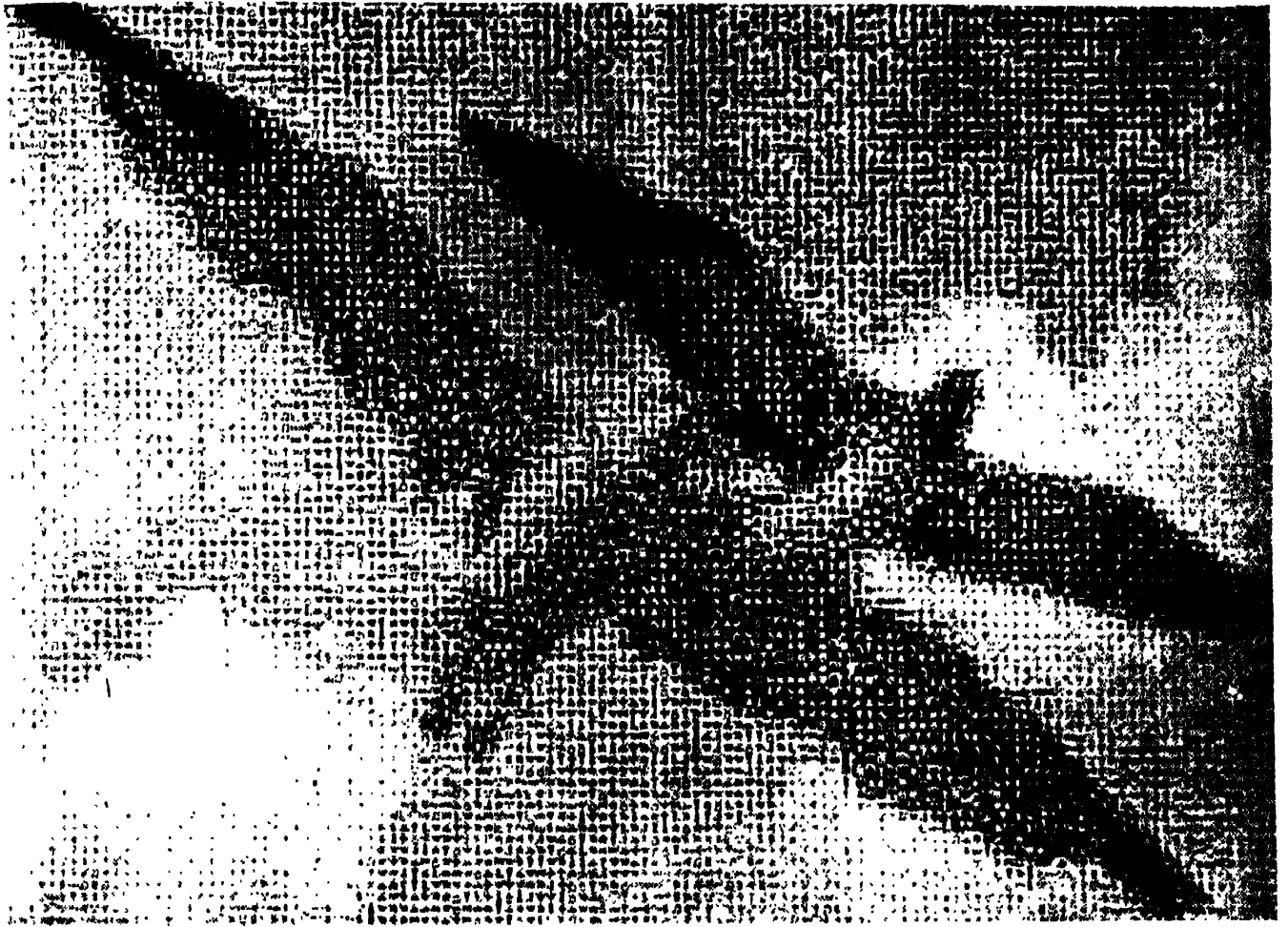
# ভারতে কম্পিউটার শিল্প

বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী এবং সরকারী সংস্থা সমূহে সংখ্যা গণনার প্রথম কম্পিউটার যন্ত্র প্রবর্তনের কৃতিত্ব টাটা মৌলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই মেশিন বসানো হয়। গবেষণা কার্যের জটিল গণনা সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা করতে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে এই কম্পিউটার বিশেষ সহায়ক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে ১৯৬১ সালে বোম্বাই-এ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার সুরু করে এসো—ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইষ্টার্ন, ইনক্ প্রতিষ্ঠান। পরে বার্মাশেল এবং ক্যালটেক্স প্রমুখ বিদেশী তেল কোম্পানী-গুলি ১৯৬৬-৬৭ সালে এই যন্ত্র কাজে লাগায়। যে সব ক্ষেত্রে প্রধানতঃ কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে আছে পরিবহণ গবেষণা ও শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, লৌহ ও ইস্পাত, মোটরগাড়ী, পেট্রোলিয়াম, পেট্রো রসায়ন এবং বস্ত্র ও ইঞ্জিনীয়ারীং শিল্প।

## আধুনিকীকরণ

ভারতীয় ইস্পাত কারখানা এবং তৈল শোধনাগারগুলির আধুনিকীকরণের কাজে কম্পিউটারের গুরুত্ব যথেষ্ট। টেল্কো প্রবর্তিত কম্পিউটার যোগে তালিকা প্রস্তুত প্রণালীর কাঁচামাল ও আধা—তৈরী জিনিসপত্র কিম্বা যন্ত্রাংশের প্রচুর স্টক রাখা এবং কারিগরের সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। যার ফলে, সম্ভবতঃ ৫ কোটি টাকার মত আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজনও হ্রাস পেয়েছে। ঠিক এই ভাবেই ভারতীয় রেলওয়েতে কম্পিউটার ব্যবহার করে ১১ কোটি টাকার মত সাশ্রয় হয়েছে। দুর্গাপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে গবেষণার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বসানো হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও কম্পিউটারের বহুল

# কম্পিউটর কি কাজ করে

[illegible]

মেশিনের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণরত কর্মীগণ

আই. বি. এম-এর কি পানচিং মেশিনের একটি যুনিটের একাংশ। পেছনের দিকে কম্পিউটর দেখা যাচ্ছে
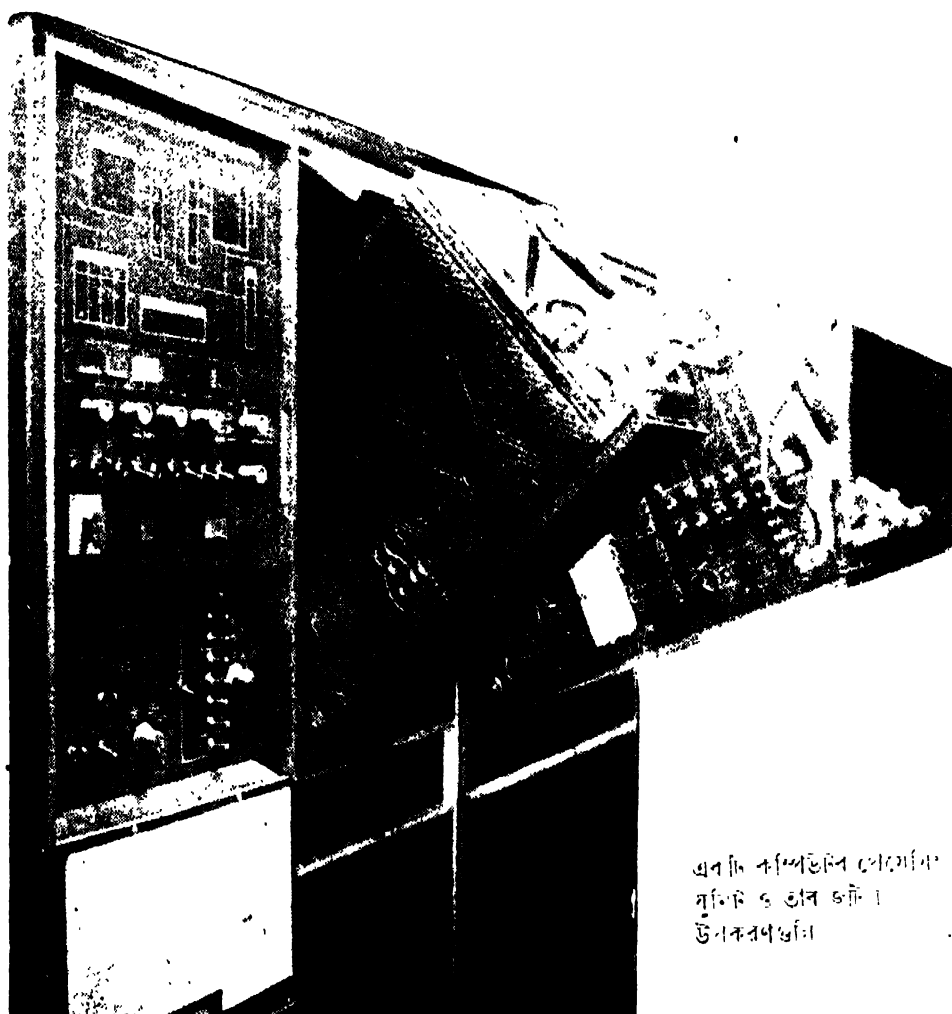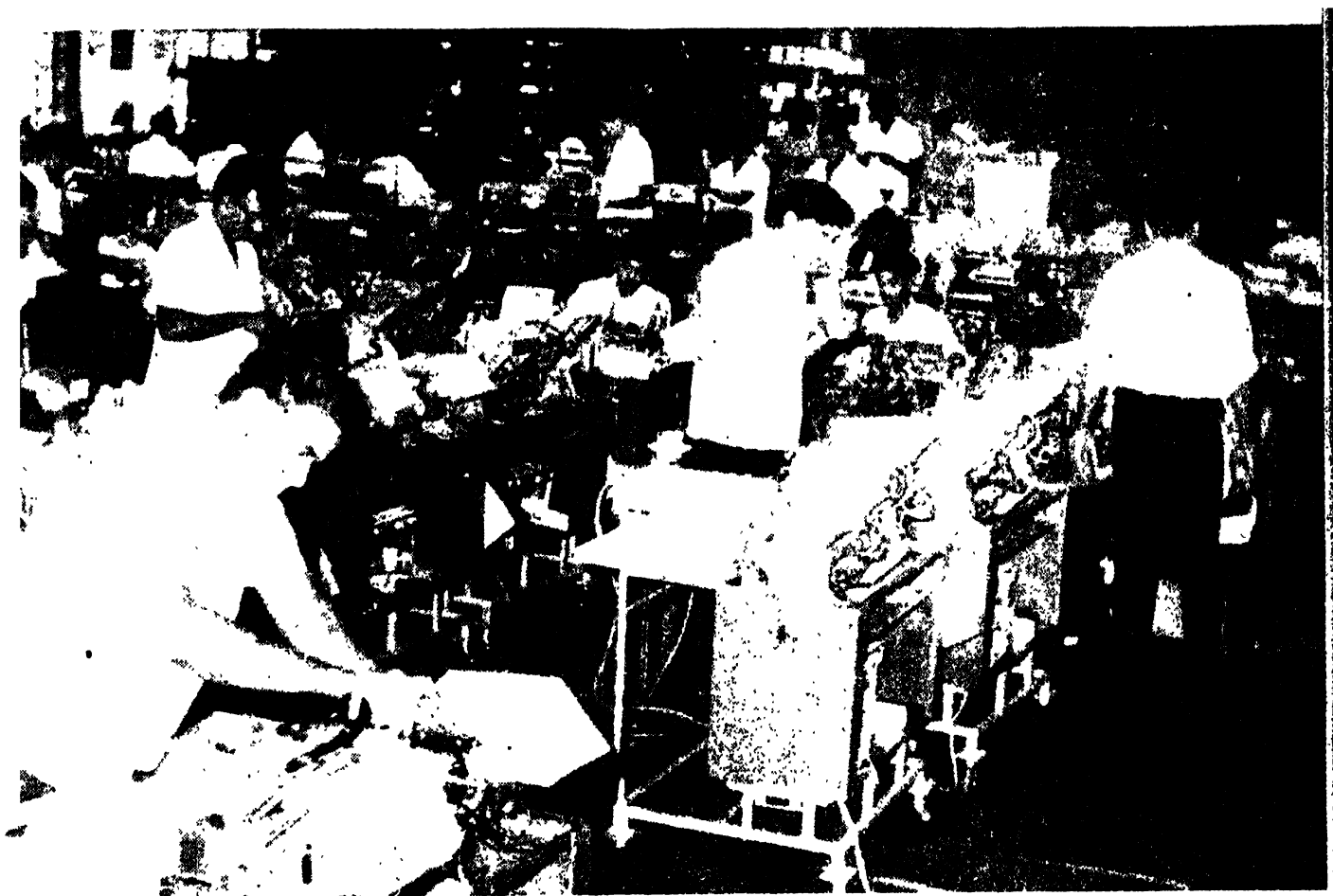
একটি কম্পিউটার সেন্ট্রাল ইউনিট ও তার জটিল উপকরণগুলি

প্রচলন হয়েছে। যার ফলস্বরূপ কল্যাণী, সোনা প্রভৃতির মতন অতি উত্তম বীজ উদ্ভাবনে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করা গেছে। চারাগাছ এবং বীজ উন্নয়ন কার্যসূচীর রূপায়ণে কম্পিউটারের প্রয়োগ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানিরা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের রোগ প্রতিরোধ এবং দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এই যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সফল হয়েছেন। অনুরূপভাবে ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বনসংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বন-সম্পদের সদ্ব্যবহারের কাজে এই যন্ত্রের প্রয়োগ আবশ্যক বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কারণ, এর সাহায্যে গবেষণার অঞ্চল পৃথকীকরণ, ঔষধপত্রের উপযোগী গাছ-গাছড়ার সন্ধান এবং কাগজ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান, আমদানীর পরিপূরক সামগ্রী নিরূপণ এবং স্বল্প ব্যয়ে গৃহ ও সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রখ্যাত গবেষকগণ যাতে পুরপুরিভাবে সৃজনীমূলক গবেষণার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন এবং গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার লাগানো হয়েছে। সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের বিদেশ-গমণ-রোধেও এই কম্পিউটরের প্রচলন। দিল্লীর পরিকল্পনা কমিশন পরিসংখ্যান তথা জাতীয় অর্থনীতির কর্ম্ম পদ্ধতি ও তার অগ্রগতি নিরূপণে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্য নিচ্ছেন। এই একই উদ্দেশ্যে ডি. টি. আর. সি. (জন্ম মৃত্যুর হার নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) জন-সংখ্যার সমীক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গবেষণায় এই যন্ত্র কাজে লাগাচ্ছে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজ আমাদের দেশের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা।

## ভারতীয় অবস্থার পটভূমিকায়

বর্তমানে সারা ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১৬৮টি কম্পিউটার চালু আছে। সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই এখন এর গুরুত্ব বেশী মাত্রায় উপলব্ধি করতে সুরু করায় এর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তবে, খুবই মন্থরগতিতে অগ্রসর হতে হচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে কম্পিউটার বন্টনের ১ নং তালিকা।

১ নং তালিকা

| স্থান | কম্পিউটারের মোট সংখ্যা |
|---|---|
| বোম্বাই | ৩৭ |
| কলকাতা | ২৩ |
| দিল্লী | ২২ |
| বাঙ্গালোর | ১৩ |
| মাদ্রাজ | ৭ |
| আহমেদাবাদ | ৬ |
| পুণা | ৫ |
| জামসেদপুর | ৫ |
| হায়দ্রাবাদ | ৫ |
| দুর্গাপুর | ৩ |
| কানপুর | ৩ |
| অন্যান্য | ৩৯ |
| | ১৬৮ |

২ নং তালিকায় দেখানো হচ্ছে উৎপাদন অবস্থা।

২ নং তালিকা

| | সংখ্যা | মোট হার |
|---|---|---|
| আই. বি. এম. | ১১৫ | ৬৭.৫ |
| আই. সি. এল. | ৩১ | ১৮.০ |
| হানিওয়েল | ১০ | ৭.০ |
| অন্যান্য | ১২ | ৭.৫ |
| | ১৬৮ | ১০০.০ |

## কম্পিউটার প্রস্তুতকারক

বর্তমানে আই. বি. এম., আই. সি. এল. এবং ই. সি. আই. এল. এই তিনটি কোম্পানী সংখ্যা গণনার কম্পিউটার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে ছেড়ে থাকে। তার মধ্যে আই. বি. এম. এবং আই. সি. এল. প্রধানতঃ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রয়োগের জন্য এই মেশিন তৈরী করে।

বহু দেশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বৃহৎ কর্পোরেশন রূপে আই. বি. এম. ভারতের কম্পিউটার যুগের প্রবর্ত্তক হিসাবে দাবী করে থাকে। ১৯৬৬ সালে বোম্বাই-এ অবস্থিত কারখানা থেকে ভারতের প্রথম কম্পিউটার তৈরীর কৃতিত্ব তার প্রাপ্য। এ ছাড়া এই কারখানায় তথ্য নির্ণায়ক যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরী হয়, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান রপ্তানী সামগ্রী হল মেকানিকাল-কী পাঞ্চ সমেত কোলেটর, ক্যালকুলেশন-পাঞ্চ, রিপ্রোডিউসার এবং অ্যাকাউন্টিং মেশিন। কান্দলাতে এই কারখানার যন্ত্রাংশ সংযোজন কেন্দ্র স্থাপিত। সঙ্গে সংস্থারক্ত অনেকগুলি প্রশিক্ষণ ও সার্ভিস কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। এই কারখানাতেই তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় জেনারেশন কম্পিউটারটি। দেশের সহায় সম্পদের অপচয় না ঘটিয়ে এই যন্ত্রটির কিছু অংশ এখানে তৈরী হয়েছে এবং কিছু অংশ সংযোজিত হয়েছে। আই. বি. এম. বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবসায়িক—উভয় উদ্দেশ্য সাধক গণনা যন্ত্র বাজারে ছেড়েছে। রপ্তানীর জন্য ইলেকট্রনিক কী পাঞ্চ, এবং এমন কি তৃতীয় ও চতুর্থ জেনারেশন কম্পিউটার তৈরীর উচ্চাকাঙ্খামূলক পরিকল্পনা এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। প্রথমে কোলেটার রিপ্রোডিউসার তৈরীর কাজ হাতে নিয়ে উৎপাদন খুব সীমিত হারে আরম্ভ করলেও আজ সেখানে পুরো রেঞ্জের ইউনিট রেকর্ড মেশিন এবং দ্বিতীয় জেনারেশন কম্পিউটার উৎপাদনের মত অবস্থায় পৌঁছন সম্ভব হয়েছে। তবে, সর্ব্বদা গুরুত্ব কিন্তু আরোপ করা হয়েছে স্থানীয় সরবরাহকারী এবং বিশেষজ্ঞদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার প্রতি। সম্প্রতি

আই. বি. এম. স্থানীয় সরবরাহকারীদের উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দানের জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে এবং এমন কি মূলধন দিয়ে সাহায্য করে স্থানীয় ভাবে যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। দাবী করা হয়ে থাকে যে, রপ্তানীর দরুণ বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার লাভ অথবা মূল কোম্পানী থেকে ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে আই. বি. এম. এর কাজকর্ম চলে। কোম্পানী ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী এবং নেদারল্যাণ্ডে পাঞ্চ কার্ডের সাজসরঞ্জাম রপ্তানী করে থাকে।

আই. বি. এম. এর উল্লেখযোগ্য অবদান হল শিল্প ও সরকারী ব্যবস্থাপনার সর্ব্বস্তরে কম্পিউটার ব্যবহারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিবহাল ও সচেতন করা। সর্ব্বাধুনিক কারিগরী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের বন্দোবস্ত করার দিকে এর বিশেষ লক্ষ্য। এই অভিপ্রায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থুম্বার অন্তরীক্ষ গবেষণা কেন্দ্র এবং বাঙ্গালোর ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে এস ৩৬০-৪৪ টাইপের শক্তিশালী কম্পিউটার স্থাপন। এর সাহায্যে বিভিন্ন কোম্পানীর ডিরেক্টর, প্রবীণ ও মাঝারী স্তরের কর্মকর্ত্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নানা ধরণের আলোচনা চক্রের বন্দোবস্ত করা এবং সাফল্যের সঙ্গে পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্ভব হচ্ছে। সরকারী পদস্থ কর্মচারী, প্রবীণ অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার এবং নীতি প্রনয়ণকারীদের আলোচনা চক্র পরিচালনার সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কম্পিউটারের যোগ্যতা এবং কর্ম ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সাধারণভাবে সচেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যন্ত্র হিসাবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

আই. সি. এল. বা আন্তর্জাতিক কম্পিউটার লিমিটেড আর একটি স্মরণীয় নাম। পুরোপুরি ভারতীয় মূলধনের সহায়তায় ভারতে তথ্য নির্ণায়ক মেশিন তৈরীর স্বপ্নকে এই কোম্পানী বাস্তবে পরিণত করে। ১৯৬৩-৬৪ সালে সীমিত হারে সাধারণ বৈদ্যুতিক সর্টার তৈরী শুরু করে ক্রমে ক্রমে এই কোম্পানী বৃটেনে অবস্থিত মূল কোম্পানীর অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ১১ একর জমির ওপর স্থাপিত পুণার কারখানাটিতে সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এই কারখানা শুধু যে আজ দেশের চাহিদা মেটাচ্ছে তাই নয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, সুইটজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং হল্যাণ্ডের বাজারেও সে এই মেশিন পাঠাচ্ছে। আরও উল্লেখযোগ্য হল সম্প্রতি কয়েক বছরে অনেক বেশী সংস্থা আই. সি. এল এর ১৯০০ PERT প্যাকেজ ব্যবহার করছে নেটওয়ার্ক টেকনিকের জন্য। সার, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া এবং তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কার্য্যে এই PERT প্যাকেজের চাহিদা যথেষ্ট।

এই কোম্পানীর মৌলিক উদ্দেশ্য হল দেশী জিনিষপত্র এবং বিশেষজ্ঞদের উপযুক্তরূপে কাজে লাগাবার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। এই অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানী, জটিল ধরণের সাজ-সরঞ্জাম তৈরীর স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বনের অভিপ্রায়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। কোম্পানীর কর্মকর্ত্তা এবং যন্ত্রবিদগণ আমদানীর পরিপূরক ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। তাঁদের মতে ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী উৎপাদনের সর্ব্বাধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য এই প্রয়াস অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। আবদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করার সাহসে [illegible] বিজ্ঞানীদের [illegible] সম্পর্কে [illegible] এসেছে। কোম্পানী ইতিমধ্যে [illegible] জেনারেশন কম্পিউটার মেশিনও তৈরী করে ফেলেছে। শতকরা ৫০ ভাগের ও বেশী দেশী উপকরণ আছে এতে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক নির্মিত কমপিউটরের একটি নমুনা

ভারতের ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন টি ডি. সি.-১২ রিয়েল টাইম ডিজিটাল কম্পিউটার উৎপাদন সুরু করেছে। এক লক্ষ টাকার বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা সমেত যার দাম প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই মেশিন এ বছরেই বাজারে ছাড়া হবে বলে আশা করা যায়।

# কম্প্যুট্যর কি এবং কিভাবে এটি কাজ করে

মানুষের মস্তিস্ক মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের সাহায্যেই মানুষ আজ তার শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে। মস্তিস্কের জোরেই সে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরতে পারে—সমস্যার সমাধান কোরতে পারে—গণনা কার্য্য চালাতে পারে—কথাবার্ত্তা, হিসেব নিকেশ স্মরণ রাখতে পারে। এমন কি, মানুষ এমন যন্ত্র তৈরী কোরতে পারে যা মানুষের মতই সব কাজ কোরতে পারে বরং মানুষের চেয়ে হাজারো গুণ তাড়াতাড়ি সেই কাজ করে ফেলতে পারে। পারেনা কেবল নিজের মাথা খাটিয়ে মানুষ যে ভাবে কাজ করে, সেই ভাবে কাজ কোরতে। এর কাজের জন্যে মাল মশলা মানুষকেই যোগান দিতে হয়। অনুগত ভৃত্যের মত সে মানুষের নির্দেশে কাজ করে যায়।

এক দিক থেকে এই ইলেক্‌ট্রনিক মস্তিস্ককে মানুষের মস্তিস্কের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মানুষের মস্তিস্কে এক হাজার কোটি স্নায়ু আছে, যার একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে—শব্দের বেগে এগুলি কাজ করে। সবচেয়ে বড় কমপিউটারে লক্ষ লক্ষ অংশ রয়েছে—ইলেকট্রন টিউব, ট্রানজিসটর আর সুইচ—যেগুলি ধ্বনির গতিতে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।

একটি কমপিউটার এক সেকেণ্ডের মধ্যে হাজার হাজার সংখ্যার যোগফল বের কোরতে পারে। কোন কোন কমপিউটর এক সেকেণ্ডে ৭০ হাজার অক্ষর পর্য্যন্ত পড়ে ফেলতে পারে। মানুষের মস্তিকের বিভিন্ন অংশ যেমন এক একটি পৃথক পৃথক কাজ করে, একটি কমপিউটরের অংশগুলিও তেমনি এক একটি পৃথক পৃথক কাজ করে।

কোন সমস্যা বিচার বিবেচনা করার জন্যে যেমন সেটি মস্তিস্কের মধ্যে প্রবেশ করা দরকার তেমনি কমপিউটরকে " সমস্যা সমাধান কোরতে হবে সেই বিষয় বস্তুটি সংক্রান্ত মালমশলা কমপিউটরটির মধ্যে ভরে দেওয়ারও দরকার হয়। কমপিউটরের যে অংশটির মধ্যে তথ্যাদি ভরে দেওয়া হয় তাকে বলা হয় 'ইনপুট'।

মেসিন যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় মালমশলা তৈরী করে এই মেসিনের মধ্যে রেখে দেওয়াই হোল প্রথম কাজ। মেসিনের ভাষায় মালমশলা তৈরী করাকে বলা হয়-'কোডে' পরিণত করা। সমস্যার প্রত্যেকটি অংশ এই 'কোডে' পরিণত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কখনো কখনো সমস্যা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ছিদ্রিত কার্ডে ভরা হয়, এর প্রত্যেকটি অক্ষর চুম্বকীয় টেপে রেকর্ড হয়—যেমন এই টেপের ভাষা বুঝতে পারে। কোন কোন মেসিন আবার কথা বলার আওয়াজ বুঝতে পারে। এই সব মেসিনের 'ইনপুটে' মাইক্রোফোন লাগানো থাকে। কমপিউটরের বিষয় বস্তু তৈরী করাকে বলা হয় 'প্রোগ্রামিং'।

মানুষের মস্তিস্কের এক ভাগকে যেমন সব কিছু স্মরণ রাখতে হয়, ইলেকট্রনিক মস্তিস্কের এক ভাগকেও তেমনি সব কিছু স্মরণ রাখতে হয়। যে ভাগটি এই কাজ করে তাকে বলা হয় 'স্মৃতি।' কোন কোন কমপিউটরে তথ্যাদি রেকর্ড করা হয় চুম্বকীয় সিলিণ্ডারে, আবার কোন কোন মেসিনের মধ্যে অতি সূক্ষ 'কোর' থাকে। আবার কোথাও থাকে ক্যাথোডরে টিউব। কমপিউটর আপনার 'স্মৃতি'তে রাখা তথ্যাদি ব্যবহার কোরতে পারে এবং এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময়ের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য তৈরী করে দিতে পারে। স্মৃতি বিভাগ থেকে তথ্যাদি কমপিউটিং বিভাগে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। স্মৃতি বিভাগ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা ব্যবহার করার আগে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়। কমপিউটর এটা নিশ্চয় করে নেয়, যে তথ্য সে ব্যবহার করতে যাচ্ছে সেটা ঠিক।

মূলতঃ কমপিউটর দু প্রকারের হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সেগুলি থেকে উত্তর পাওয়া যায়। এক প্রকারের কমপিউটরকে বলা হয় 'এনালোগ' বা অনুরূপ কমপিউটর। এগুলি পরিমাপের কাজ করে বৈদ্যুতিক কারেন্ট, বিদ্যুৎশক্তি, তাপ, গতি ইত্যাদি এই ধরণের কমপিউটরে মাপা যায় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য জানিয়ে দেয়। গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজেও এগুলি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার, বিমান চালনা এবং শিল্পে এগুলি নতুন নতুন নিয়ন্ত্রণ প্রণালী উদ্ভাবনে সাহায্য করে। এই কমপিউটর তাপ, গতি ইত্যাদির অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে যা নানা রকম প্রশিক্ষণ কার্য্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংখ্যা বা ডিজিটাল কমপিউটর উত্তর বের করবার জন্যে সংখ্যা ব্যবহার করে। এই কমপিউটরে সমস্যা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি দিতে হয় সংখ্যার সাহায্যে এবং উত্তরও

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন
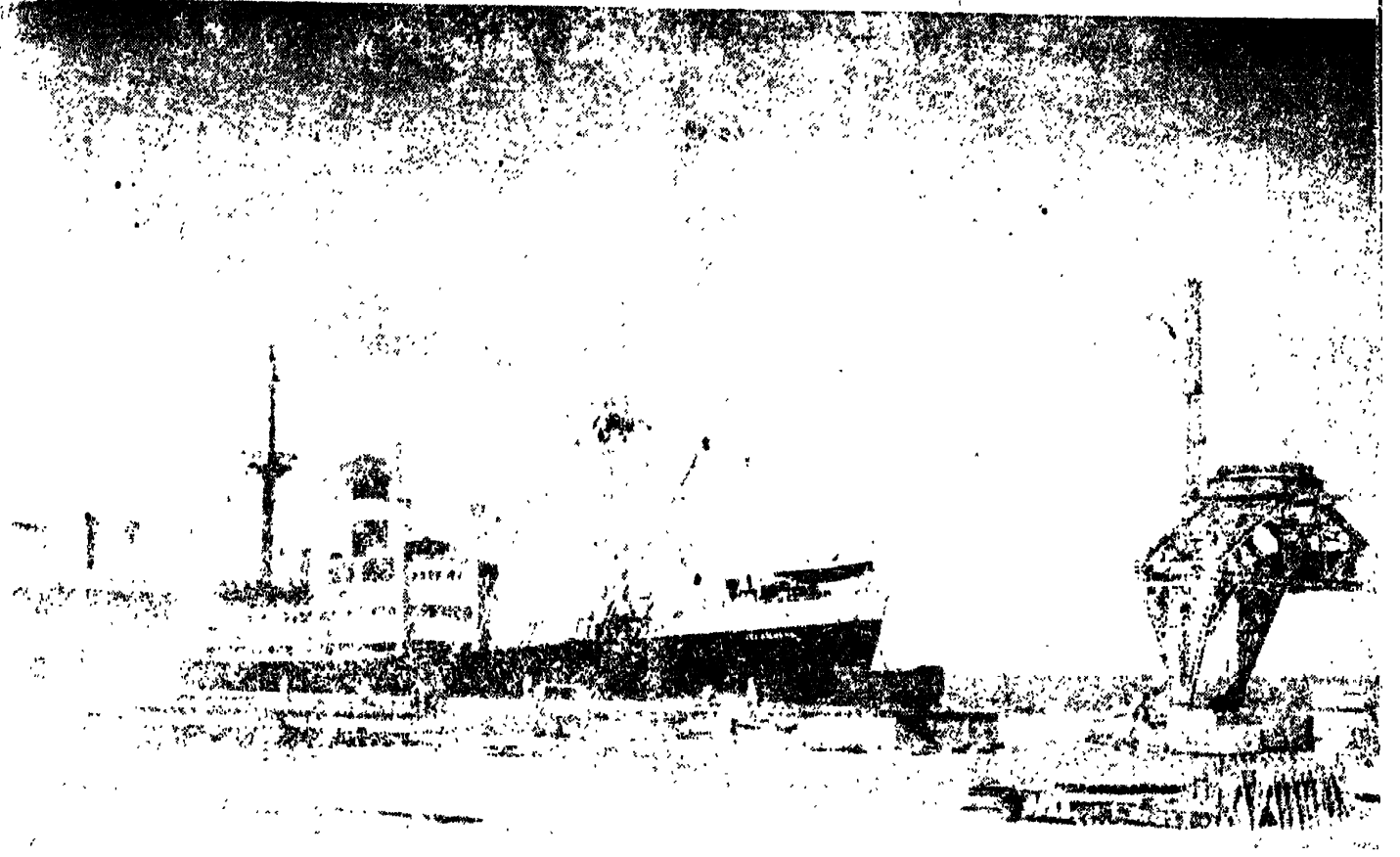
কান্দালা বন্দরের একটি দৃশ্য

# দেশীয় বন্দরগুলিই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে

যে কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ থেকেই সেই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতিরেকে কোন দেশেরই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের বিশেষ ধরণের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশীর ভাগই নির্ভর করে সমুদ্র পথের ওপর। কেন না, প্রথমত: দেশের সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চল, আর দ্বিতীয়ত: এই অঞ্চলের প্রতিকূল রাজনৈতিক আবহাওয়া। সমুদ্র পথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের তটরেখা বরাবর অবস্থিত বন্দরগুলি। বন্দরগুলি দু ধরণের কাজ করে থাকে; এক, বহির্বিশ্বের, মালপত্র দেশে আনয়ন অর্থাৎ আমদানি আর দুই, দেশীয় পণ্যকে বিদেশে পাঠান বা রপ্তানি। তাই কি বাণিজ্যিক, কি সামরিক উভয় দিক দিয়েই বন্দরগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হরিমোহন সাক্সেনা

ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্ব উপকূল বরাবর তটরেখার মোট দৈর্ঘ্য হল ৫৬৮৯ কিলোমিটার। এই তটরেখার ওপর ৮টি বড়, ২১টি মাধ্যম শ্রেণীর এবং ১৪৪টি ছোট বন্দর অবস্থিত। ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলি হ'ল বোম্বাই, কলকাতা, কোচিন, কাণ্ডলা, মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম। এ ছাড়া পারাদ্বীপ এবং মারমাগোয়া বন্দর দুটিকে বড় বন্দর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্যই এই বন্দরগুলির মাধ্যমে

হয়ে থাকে।

নীচের তালিকা থেকে ভারতের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে দেশের বড় বড় বন্দরগুলির ভূমিকা কি, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

## ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রধান প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে আমদানি—রপ্তানি বাণিজ্য :

| বন্দর | আমদানি (টনে) | রপ্তানি (টনে) |
|---|---|---|
| বোম্বাই | ১,২০,৯৫,৯২১ | ৪৩,০৮,৯৫৭ |
| কলকাতা (১৯৬৭-৬৮) | ৪৮,৮৫,১৯২ | ৪১,০৭,০৩৫ |
| কোচিন | ৩৭,৮২,৫০০ | ১৪,০৭,০৩৬ |
| কাণ্ডলা | ১৭,০৯,২৪৬ | ৩,২৬,৪৫৪ |
| মাদ্রাজ | ৩০,২১,৮৩৬ | ২৩,৫৬,১৭০ |
| বিশাখাপত্তনম (১৯৬৭-৬৮) | ২৪,১৩,৯৬৬ | ৪০,৯২,৭৮৫ |

ভারতীয় বন্দরগুলির মধ্যে বন্দর হিসাবে বোম্বাই সবচেয়ে বড়। এখানকার বন্দর এলাকার মোট বিস্তার হ'ল ১৮৮০ একর আর শুধু ডক এলাকার ক্ষেত্রফল হ'ল ৭০০ একর। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের পণ্য সামগ্রী প্রধানত এই বন্দরের মাধ্যমেই রপ্তানি হয়ে থাকে। এই বন্দর থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্য সামগ্রীগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান জিনিষগুলি হ'ল পশম এবং পশমজাত বস্ত্র, সুতীর কাপড়, তৈলবীজ, অভ্র, চামড়া, কাঁচা চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি এবং এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত জিনিষপত্রের মধ্যে আছে নানান ধরণের রাসায়নিক জিনিষপত্র, খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, কার্পাস তুলো, লৌহ এবং ইস্পাতজাত দ্রব্য, কয়লা ইত্যাদি। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই বন্দরের মাধ্যমে মোট ১৬৪ লক্ষ টন মাল আমদানি রপ্তানি হয়েছে। বোম্বাই এর পরেই বন্দর হিসাবে কলকাতার স্থান। কলকাতা বন্দরে ডক আছে দুটি, খিদিরপুর আর কিং জর্জ ডক। হুগলী নদী বরাবর কলকাতা থেকে সমুদ্রের দূরত্ব হ'ল প্রায় ১২৮ কিলোমিটার। এখানে অর্থাৎ, কলকাতা বন্দরে জাহাজের যাতায়াত শুধু জোয়ারের সময়ই হয়ে থাকে। এখান থেকে রপ্তানিকৃত জিনিষপত্রের মধ্যে প্রধানপ্রধান হ'ল কয়লা, চা, চিনি, অভ্র, লোহা এবং ইস্পাতের জিনিষপত্র, গালা ইত্যাদি। আর এখানে আমদানিকৃত জিনিষপত্রের মধ্যে, প্রধান প্রধানগুলি হ'ল খাদ্য দ্রব্য, গন্ধক, টিনের চাদর, খনিজতেল, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি। এই বন্দরে একই সময়ে ৭৫টি জাহাজের নোঙর করার ব্যবস্থা আছে এবং এই বন্দরের মাধ্যমে প্রতি বছর ১৩৪০ লক্ষ টন মাল আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে।

গোয়ার মারমাগাঁও বন্দর। খনিজ লৌহ রপ্তানির জন্যে প্রসিদ্ধ

পূর্ব উপকূলের অন্য দুটি বড় বন্দর হ'ল মাদ্রাজ এবং বিশাখাপত্তনম। মাদ্রাজ বন্দরে ২১টি জাহাজ একই সময়ে নোঙর করে থাকতে পারে। এখান থেকে রপ্তানি হয় খনিজ দ্রব্য, কাঁচা চামড়া, তামাক, মোটা কাপড়, বাদাম তেল ইত্যাদি আর আমদানি হয় কয়লা, খনিজ তেল, কাঠ কাগজ, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি। বিশাখাপত্তনম বন্দর থেকে রপ্তানিকৃত জিনিষপত্রের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজই প্রধান। জাপানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের অধিকাংশই হয়ে থাকে এই বন্দরের মাধ্যমে।

পশ্চিম উপকূলের অন্য দুটি বড় বন্দর হ'ল কোচিন এবং কাণ্ডলা। কোচিন সমুদ্রে জলের গভীরতা যথেষ্টই। তাই এখানে সারা বছর জাহাজ চলাচলে কোন অসুবিধা দেখা দেয় না। দেশ বিভাগের পর করাচী বন্দর পাকিস্তানে পড়ে যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছিল, সেই ক্ষতি পূরণের জন্যই কাণ্ডলা বন্দর গড়ে তোলা হয়েছে।

কাণ্ডলা বন্দরটি গড়ে উঠেছে একটি স্বাধীন বন্দর হিসাবে। এই বন্দর থেকে রপ্তানি হয় লবন, কার্পাস, ন্যাপথা, সোপস্টোন আর হাড় এবং আমদানি হয় খনিজ তেল, ফসফেট, গন্ধক এবং যন্ত্রপাতি। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই বন্দরে সর্ব সাকুল্যে ২৬১টি জাহাজ এসেছিল।

উপরোক্ত বড় বড় বন্দরগুলি ছাড়াও অনেক ছোট ও মধ্যম শ্রেণীর বন্দরও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন রাজ্যে এদের সংখ্যা কিরূপ তা নীচের তালিকায় দেওয়া হ'ল :

তালিকা—২

বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ছোট এবং মাধ্যম শ্রেণীর বন্দরের সংখ্যা

| রাজ্য | মধ্যম শ্রেণীর বন্দর | ছোট বন্দর |
|---|---|---|
| মহীশূর | ২ | ১৯ |
| তামিলনাড়ু | ৩ | ৭ |
| মহারাষ্ট্র | ২ | ৪৭ |
| গুজরাট | ১০ | ৪০ |
| কেরল | ২ | ৯ |
| উড়িষ্যা | — | ১ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ২ | ৫ |
| আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | — | ১৫ |

মধ্যম শ্রেণীর অনেক বন্দরকে এমন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে করে এগুলিতে বড় বড় বন্দরগুলির সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। মাঙ্গালোর এবং তুতীকোরিন বন্দরের নির্মাণকার্য্য প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে। মধ্যম শ্রেণীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলি হ'ল পোরবন্দর, ভাবনগর, ভেরোভাল, ওখা, আলেপ্পী, মাণ্ডভী, পন্ডলম, রত্নগিরি, কোজীকোড, মাসুলীপত্তনম, কাকীনাড়া, ত্রিবান্দ্রাম ইত্যাদি। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মধ্যম শ্রেণীর বন্দরগুলি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তা তালিকা-৩ থেকে বোঝা যায়।

তালিকা-৩

১৯৬৮-৬৯ সালে মধ্যম শ্রেণীর বন্দরগুলি মারফৎ আমদানি রপ্তানি :

| বন্দর | আমদানি (টনে) | রপ্তানি (টনে) |
|---|---|---|
| কুড্ডালোর | ৮৮,৯৯৭ | ১,০৭,৪৫ |
| কাকীনাড়া | ৮২,২৫২ | ৪,২৪,৯৬৪ |
| নাগাপত্তনম | ১,৩৯,৭৫৩ | ১৪,৫৪৩ |
| তুতীকোরিন | ৪,৭৫,৫২২ | ৪,৬১,৯০১ |
| আলেপ্পী | ২০,৬৫৭ | ২২,১৮০ |
| কোজীকোড | ১,০২,৬০৮ | ১,৬২,২৪১ |
| মাঙ্গালোর | ১,২৫,১২৫ | ৩,৬১,০৫১ |

## বন্দর উন্নয়ন ও নৌবহণ নিগম

১৯৭১-৭২ সালে বন্দর উন্নয়নের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল ৭৬.৯৪ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যয় হয়েছে এই অঙ্কের শতকরা ৮৮ ভাগ অর্থাৎ ৬৭.৭১ কোটি টাকা। চতুর্থ যোজনায় এই বিষয়ে ২৬০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে; যার মধ্যে যোজনার প্রথম তিন বছরেই ব্যয় হবে এই অর্থের শতকরা ৫৯ ভাগ অর্থাৎ ১৫১.৮১ কোটি টাকা।

ভারতীয় নৌবহণ যথাক্রমে ১৯৭০-৭১ ও ১৯৬৯-৭০ সালে মুনাফা করেছে ৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে নৌবহণ নিগমে আরও ৬টি জাহাজ যোগ দেওয়ায় পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে এই সংস্থার অধীনে জাহাজ ছিল মোট ৭৯টি এবং ঐ সময়ে পরিবহণ ক্ষমতা ছিল ৮,৮৪,৫৯৬ টন। নৌবহণ নিগম কি বেগে এগিয়ে চলেছে, তা এর ১৯৭৩ সালে ৩১শে মার্চ তারিখের পরিবহণ ক্ষমতার (৪,৯৮,৮০০ টন) দিকে লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যাবে।

কোচিন থেকে কাজু বাদাম রপ্তানী হচ্ছে
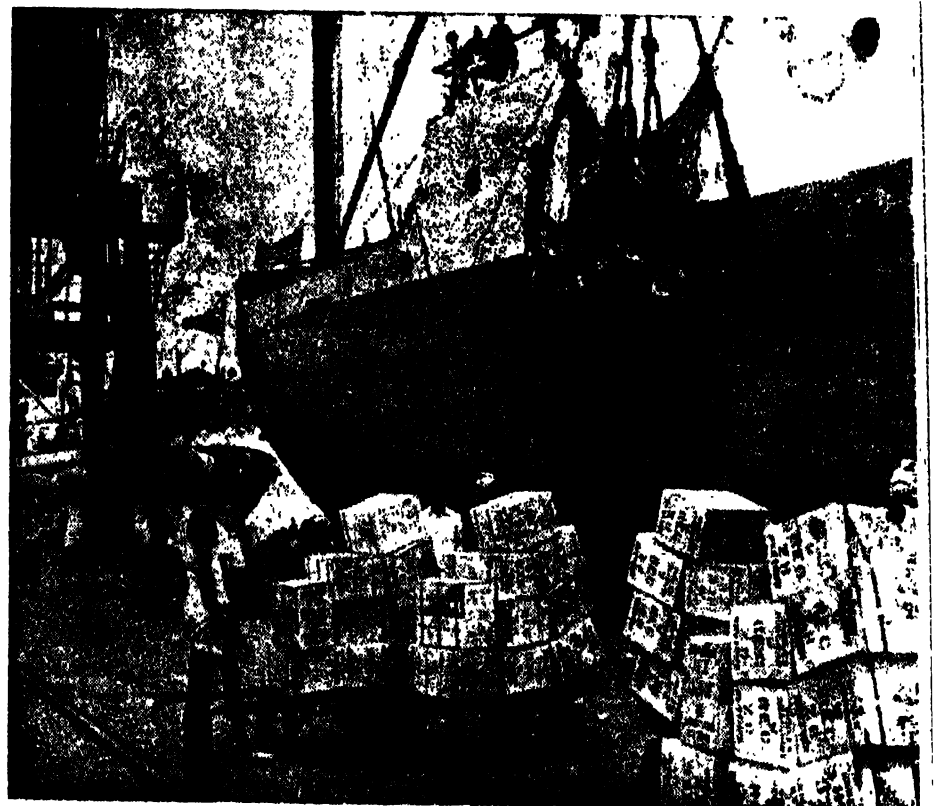
# আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

# ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো
লালন-পালন করতে
পারছেন কি না

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

**সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়**

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

**লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবারের জন্মনিরোধক**

**মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়**

# খড়গপুরের ভারতীয় প্রযুক্তি বিদ্যায়তন

অশোক মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখন পুরোপুরি ইংরেজ আমল। খড়গপুরের যেখানে আজ ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব টেক্‌নলজী (সংক্ষেপে আই. আই. টি.) গড়ে উঠেছে, সেই খানেই ছিল কুখ্যাত হিজলী বন্দী শিবির। গত তিরিশ দশকের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী ধৃত দেশ প্রেমিকদের বিচার করার আগেই আটক করে রাখা হ'ত এই বন্দী শিবিরে। আজকের যে কোন ভ্রমণেচ্ছু দর্শক খড়গপুরের আই আই. টি.র দিকে তাকিয়ে ভাবতেও পারবেন না যে একদিন এখানেই ছিল রাজবন্দীদের কাছে বিভীষিকাময় সেই কুখ্যাত হিজলী, যেখানে গড়ে উঠেছে ভারতের আশা, উদ্দীপনা, প্রাচুর্য ও গর্বের প্রতীক ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট্ অব টেকনলজী।

আই. আই. টি. র বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা দেড় শতাধিক। এই শিক্ষায়তণের আদর্শ শুধু মাত্র শিক্ষাদান, উচ্চতর অধ্যয়ণ বা গবেষণাই নয়; অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যুগ্মভাবে শিক্ষা ও গবেষণার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও এর কর্মসূচীর অন্তর্গত। আই. আই. টি. ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পাদিত একটি মৈত্রী চুক্তি অনুসারে ২৫ জন অতিথি-অধ্যাপক এই ইন্‌স্‌টিটিউটে এসে কিছুকাল শিক্ষাদান করে গেছেন। আবার এই শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের মধ্যে ৩৫ জন সদস্যকে (faculty members) উচ্চতর অধ্যয়ণের জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

ভারত সরকার দেশে যে পাঁচটি প্রযুক্তি বিদ্যায়তণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার মধ্যে ১৯৫১ সালে স্থাপিত খড়গপুরের এই আ.ই. আই. টি. ই সর্বপ্রথম। বর্তমানে এখানে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-সমেত মোট ১৬টি বিভাগ আছে।

এই শিক্ষায়তনে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষাদান ছাড়াও উচ্চতর গবেষণায় ডক্টরেট্ ডিগ্রির শিক্ষাক্রমও চালু আছে। এখানে বিভিন্ন প্রযুক্তি বিদ্যায়তনের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের জন্য একটি গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাক্রমও চালু করা হয়েছে। বস্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপকদের উচ্চতর কারিগরি প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষাদানের জন্য এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবেই রসায়ন ও ঐ বিভাগে যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রেও এখানে ১৯৬৭ সাল থেকে একটি গ্রীষ্মকালীন ক্লাসও খোলা হয়েছে। যে ও জুন মাসে আট সপ্তাহের জন্যে এই শিক্ষাক্রম চালু থাকে। গ্রীষ্মকালীন ক্লাসগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেই অধ্যাপকেরা আবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে যান।

এ ছাড়া, আই. আই. টি. তে দেশে যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে চালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে একটি শিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা ও লুইজিয়ানা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সদস্যও এ ব্যাপারে ইন্‌স্‌টিটিউটের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রালয় ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সাহায্যে এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার একটি পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্পে একদল কৃষি বিশেষজ্ঞ এই গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। কেন্দ্রটিতে কতকগুলি বিশেষ ধরণের প্রকোষ্ঠ তৈরী করা হয়েছে। এগুলিতে ধান চাষের উপযুক্ত সব রকম পরিবেশই আছে। বিভিন্ন প্রকারের মাটিও এখানে রাখা হয়েছে। এই সব প্রকোষ্ঠে বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পাবেন কেমন করে ধানের চারা বিভিন্ন পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে।

এই কেন্দ্রে জমি কর্ষণের জন্যে লাঙ্গল আবিষ্কারের কাজও শুরু হয়ে গেছে। ট্রাক্টরে যে সব লাঙ্গলের ফলা ব্যবহৃত হয় সেগুলি পশ্চিমী দেশগুলির জমির পক্ষে প্রযোজ্য [illegible] দেশের জমি কর্ষণের উপযোগী যথাযথ লাঙ্গল আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে। আই. আই. টি. র কৃষি বিশেষজ্ঞেরা নানা ধরণের মাটির উপর সঠিক লাঙ্গল প্রয়োগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন। এ সবের প্রয়োজনীয়তা হল এই, যে জমি কর্ষণ, বীজ বপন ইত্যাদি চাষের কাজে চাষীর অনেক সময় চলে যায়। উন্নততর কৃষি-যন্ত্রপাতি চাষীর সময় ও পরিশ্রম বাঁচাতে পারে, ট্রাক্টরে জ্বালানীর খরচও কম লাগতে পারে এবং যন্ত্রপাতির গোলযোগ কম হবারও সম্ভাবনা থাকতে পারে। জলবায়ুর উপরও নির্ভরশীলতা

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

# মহাকাশ আয়োগ

ভারত সরকার অনতিবিলম্বে একটি মহাকাশ আয়োগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উদ্দেশ্য হ'ল, মহাকাশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা এবং তার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের দ্রুত উন্নতি সাধন। প্রস্তাবিত এই আয়োগের সভাপতি হবেন অধ্যাপক এস. ধাবন,—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের সভাপতি এবং আয়োগের প্রধান কার্য্যালয় হবে ব্যাঙ্গালোরে।

আয়োগের কাজ হবে সরকারের মহাকাশ বিভাগীয় নীতি নির্দ্ধারণ করা এবং মহাকাশ সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে সরকারী নীতি প্রয়োগ করা। পারমানবিক শক্তি আয়োগ এবং ইলেকট্রনিক্স আয়োগের গঠন এবং কর্মপদ্ধতি যে ধরণের, মহাকাশ আয়োগের গঠন এবং কর্মপদ্ধতিও মোটামুটি সেই ধরণেরই হবে।

এই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধীয় সর্ববিধ কাজের দেখাশোনা ও পরিচালনার ভার থাকবে এই নতুন সংস্থাটির ওপর। সংস্থাটির কাজকর্মের যাতে দ্রুত উন্নতি হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই মহাকাশ আয়োগকে সমস্ত রকমের অপ্রয়োজনীয় বাধাবিপত্তি ও নিয়ম কানুনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। পারমানবিক শক্তি আয়োগের মত এই আয়োগেরও নিজস্ব পূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকবে।

মহাকাশ বিষয়ে কোনও কাজকর্মের উন্নতি নির্ভর করছে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অগ্রগতির ওপর। কাজেই জ্ঞান বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি হেতু আজকের দিনের অনেক প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্রপাতি অদূর ভবিষ্যতে বাতিল হয়ে যাবে। এই আয়োগটি নতুন এই প্রযুক্তি বিদ্যায় নব নব জ্ঞান সংযোজন, বিজ্ঞানের এই শাখার নতুনত্ব, তার বিশেষ ধরণের উন্নয়ন প্রকৃতি এবং এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় নব নব প্রয়োগের কথা মনে রেখেই এর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## খড়গপুর বিদ্যায়তন

( ৯ পৃষ্ঠার পর )

কমে যাবে। ফলে, সময়ের আগেই জমি তৈরি ও বীজ বোনা হওয়া সম্ভব। সমগ্রভাবে, কম খরচে বেশী ধান উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

উচ্চতর মানের প্রযুক্তি কৌশলের কথা ছেড়ে দিলেও, ভারতের সার্বিক উন্নয়নে খড়গপুর আই আই. টি. র এই কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে

## কমপিউটর কি

( ১২ পৃষ্ঠার পর )

পাওয়া যায় সংখ্যার মাধ্যমে। সংখ্যা সংক্রান্ত জটিল সমস্যাদি সমাধানে এই কমপিউটর খুবই কাজ দেয়। পদার্থ বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ করে, ডিজিটাল কমপিউটর খুবই ভাল কাজ দেয়।

কোন কোন ডিজিটল কমপিউটরে মেট্রিক প্রণালী ব্যবহৃত হয়। কমপিউটর সব কাজই করে—১ এবং ০ এই দুটি সংখ্যার মাধ্যমে। উত্তরে, কমপিউটর হ্যাঁ বা না জানিয়ে দেয়। যে কোন সমস্যা দিন, কমপিউটর বলে দেবে সেটি সম্ভব কি না—এই দুটি সংখ্যার মাধ্যমে।

এই কাজের সময় কমপিউটরের নিয়ন্ত্রণ প্রণালী, যা ইলেকট্রণ টিউব এবং ট্রানজিসটরের দ্বারা তৈরী, নির্দ্দেশগুলি পড়তে থাকে এবং দেখে যে নির্দ্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে কি না।

যেখান থেকে চূড়ান্ত ফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'আউট পুট' বা নির্গম।

কখনো কখনো উত্তর রেকর্ড করা হয় চুম্বকীয় টেপে অথবা ছিদ্রিত কার্ডে। কোন কোন কমপিউটর আবার সোজা কাগজের ওপর উত্তর ছেপে দেয়। এতে এক মিনিটে ৫ হাজার লাইন ছাপা হয়।

কমপিউটর অতি দ্রুত গতিতে অনেক প্রকার কাজ করে ফেলতে পারে। যে সমস্যা সমাধানে গণিতজ্ঞদের বছরের পর বছর সময় লাগে, কমপিউটর, গণিত সংক্রান্ত সেই সব সমস্যা কিছু দিনের মধ্যে এমনকি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সমাধান করে দিতে পারে। শিল্প সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলিও এই মেসিন অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ কোরতে পারে।

কমপিউটর আরও ব্যবহার হয়, অন্য কমপিউটরের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরবার জন্যে এবং আরও উন্নত ধরণের কমপিউটর তৈরীর জন্যে। মানুষের চিন্তাশক্তিই কেবল কমপিউটরের কার্য্যকারিতার সীমা হতে পারে। মানুষ যা চিন্তা কোরতে পারে কমপিউটর অনায়াসে তার নকল করতে পারবে।

## প্রামানিক চিত্র

প্রামানিক চিত্র প্রস্তুতে ভারত সর্ববৃহৎ দেশ গুলির অন্যতম। এর অধিকাংশই প্রস্তুত হয় ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসনে। গত বছরে এই ডিভিসনে ১৫টি ভাষায় ৯০টি প্রামাণিক চিত্র প্রস্তুত হয়। দু দশক আগে মাত্র ৫টি ভাষায় বছরে ৩৩টি প্রামাণিক চিত্র তৈরী হোত।

## কমপিউটর শিল্পে

তবে দাম ধার্য্য হবে ১০ লক্ষ টাকার মত। টি. ডি. সি.—১৬ যন্ত্রটির রিয়েল টাইম সংস্করণের দাম হবে ১২ লক্ষ টাকা এবং সাধারণ ভাবে ব্যবহারের জন্য তৈরী যন্ত্রটির দাম পড়বে ২১ লক্ষ টাকা। দু তিন বছরের মধ্যেই এটি বাজারে চালু হয়ে যাবে বলে আশাকরা যায়। উন্নয়ন প্রয়াস হিসাবে ই. সি. আই. এল. ইতিমধ্যে ইলেকট্রনিক্ কমিশনকে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

### বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা

খুব কম লোকেই জানেন যে ভারতে তৈরী তথ্য নির্ণায়ক যন্ত্র ইউরোপের বহু দেশে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হয়ে থাকে। এ থেকেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৬২৯ নং মেশিন কানাডা সমেত ৪০টি দেশে রপ্তানী হয়। ইলেকট্রনিক কী পাঞ্চ রপ্তানী করে গত দু বছরে ৩ কোটি টাকা বেশী আয় হয়েছে।

কম্পিউটার রপ্তানী কার্য্যসূচীর ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়। বর্ত্তমান পরিস্থিতির বাস্তব দৃষ্টি সম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রপ্তানীর বাজারে ভারতের অবস্থা বেশ মজবুত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দ্বিগুণ মূল্যের চাহিদা ধরণের পণ্য সামগ্রী অথবা অন্য টাইপের কম্পিউটার রপ্তানীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে অন্ততপক্ষে কম্পিউটার আমদানী করার জন্য সরকারের প্রস্তাবকে কম্পিউটার প্রস্তুতকারকরা স্বাগত জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা প্রশিক্ষণ এবং বিপনন ক্ষেত্রে বড় রকমের বিনিয়োগে সহায়ক।

ভারতে কম্পিউটারের যথোপযুক্ত ব্যবহার হয়না বলে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে কম্পিউটার প্রস্তুত কারখানাগুলিতে দু শিফটে কাজ হচ্ছে কি করে? সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠানের মতে সপ্তাহে গড়পড়তা ৭৬ ঘন্টা কাজ হওয়া থেকেই আভাস পাওয়া যায় কত অধিক সংখ্যায় এই যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। এমন কি তুলনামূলক বিচারে মার্কিন মুলুকের চেয়েও বেশী বলা চলে।

আমদানী করা যন্ত্রাংশের সংযোজন অথবা পুরানো যন্ত্রের মেরামত বা সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে ভারতের কম্পিউটার প্রস্তুত ফার্মগুলি খুবই ভাল কাজের পরিচয় দিচ্ছে। সরকারের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ফার্মগুলির এখন উচিত আবার নতুন করে চিন্তা করা এবং এই বিষয়টিকে একাধারে চ্যালেঞ্জ ও সুবর্ণ সুযোগ বলে গণ্য করা। সমাধান হিসেবে বলা যায় আধুনিক ও সূক্ষ্ম যে সব জিনিষের গবেষণা কার্য্যে আরও কিছুদিন আমাদের বিদেশের জ্ঞান এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর থাকতে হবে, সেগুলির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে সরকারের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়নের উপযুক্ত সময় এটা।

## পশ্চিম বঙ্গে দু'বছরে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা

পৃষ্ঠার পর

দিন বোঝায়, তা হলে এই কর্মসূচী অনুযায়ী বছরে ৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হবে। সেচ ব্যবস্থার প্রসারণের ফলে বর্দ্ধিত কর্মসংস্থান ছাড়া ভূমিহীন কৃষক এবং অল্প জমির মালিক এমন ৪,১০,০০০ লোকের জন্যও পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের বন্দোবস্ত হবে।

এ সব ছাড়াও প্রকল্পের কাজে যে সব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বসানো হবে সেগুলি চালু অবস্থায় রাখার জন্য এবং এগুলির তত্ত্বাবধান করার জন্য আরও বহু লক্ষ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। পণ্য দ্রব্যের বিপনন, যানবাহন ইত্যাদি কাজেও আরও ৬০,০০০ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

প্রকল্পের নির্মাণ কার্য্য চলাকালে দক্ষ অদক্ষ শ্রমিকের পূর্ণ কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাও কম নয়, প্রায় ১৬,০০০ মত।

## পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫ পৃষ্ঠার পর

করা।

(২) সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটানো পরিবার পরি-কল্পনা এবং পুষ্টির সঙ্গে সংহতি রেখে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দ্ধারণ করা।

(৩) গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

(৪) বাস্তহীন শ্রমিকদের বাসগৃহের উপযুক্ত বাস্তভূমির ব্যবস্থা করে দেওয়া;

(৫) গ্রামাঞ্চলে পথঘাট সংস্কার এবং বৈদ্যুতীকরণের জন্য ব্যাপক দ্রুত কার্যসূচী গ্রহণ;

(৬) শহরের বস্তি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা; সংক্ষেপে, এই পরিকল্পনায়, যারা সমাজে এখনও পর্যন্ত অবহেলিত—যারা সবার নীচে—যে অঞ্চলগুলির অধিবাসীরা অনগ্রসর, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জল সরবরাহের সর্বনিম্ন চাহিদা মেটানোর এক বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, পঞ্চম পরিকল্পনায় সরকারী কর্মক্ষেত্রের পরি-ধিকে আরও বাড়ান হয়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ১৬ হাজার থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে [illegible] হয়েছে। ইহা চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের দ্বিগুণ। সেই সঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধান ও সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা থেকে ১১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার এবং ৬.৭ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের প্রস্তাবও অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই প্রগতিশীল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত হলে একদিকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে উৎপাদনের সুষম বন্টন ব্যবস্থা ভারতের অর্থনীতি থেকে দারিদ্র মোচন করতে সক্ষম হবে এবং পক্ষান্তরে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বয়ংম্ভরতা অর্জনের পথ সুগম হবে।

REGD. NO. D-233

## সাম্প্রতিক পটভূমিকায় ভারতের অর্থনীতি

৪ পৃষ্ঠার পর

কোটি টাকার ধার্য্য হয়েছিল। প্রকৃত রপ্তানি ঘটেছিল ১১৫ কোটি টাকার মত। ১৯৭১-৭২ সালে ১০০ কোটি টাকার এক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হলেও প্রকৃত রপ্তানি ১১৫ কোটি টাকার বেশী হবে না বলে মনে হয়। আগামী বছরে এজন্যে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ২১০ কোটি টাকা থেকে হ্রাস করে ১৭৫ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘাটতি মেটানোর জন্য ইস্পাত ব্যাঙ্ক স্থাপন করে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অগ্রিম প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইস্পাত আমদানী করে তা প্রয়োজনমত সরবরাহ করাই হবে এই ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী।

আগামী ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্যপথের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যাতে করে যুগপৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। পরিকল্পনার অভিলক্ষ্য সুষ্ঠু অগ্রগতি বিধান, বর্দ্ধিত মাত্রায় বিনিয়োগের জন্য সম্পদ আহরণ, স্বয়ম্ভরতার জন্য অধিকতর প্রয়াস এবং কর্মসংস্থান ও সামাজিক ন্যায় বিধানের জন্য আরও বেশী মাত্রায় বিনিয়োগ সাধন। তাই বর্তমান বছরে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার সামগ্রিক আকার হল ৩,৯৭৩ কোটি টাকা অর্থাৎ গত বছরের চাইতে তা ৩৭৫ কোটি টাকা বেশি। পল্লীঅঞ্চলে কর্মসংস্থান, শিক্ষিত বেকারদের চাকুরীসংস্থানের মত জরুরী কর্মসূচী এবং খরা প্রপীড়িত এলাকার জন্য সাহায্য বাবদ বাড়তি ব্যয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংভরতা অর্জনের জন্য অতিরিক্ত দশ লক্ষ টন করে কাপাস, কাঁচাপাট এবং তৈলবীজ উৎপাদনের বিশেষ কর্মসূচীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই তিনটি সামগ্রী একত্রে ৪০ শতাংশ বাণিজ্য ঘাটতির জন্য দায়ী। ইস্পাত ও সারের ক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলেছে। বিনিয়োগের ৩০ শতাংশ কেবল ইস্পাতের জন্য নির্দ্ধারিত। এছাড়া বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলিকে, আগের বছরের বকেয়া ব্যয়কে, সমাপ্ত প্রায় নির্মাণ প্রকল্পগুলিকে সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে এবং শিল্পে উৎপাদনী শক্তিকে পুরোপুরিভাবে যাতে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে খুঁটিনাটি পর্য্যালোচনা করা হচ্ছে।

বর্তমান পর্য্যায়ে খেত খামারে যে সমস্ত কাজ চলেছে সে সকল কর্মসূচী ছাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষ প্রকল্পকে অগ্রাধিকারের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে যাতে মধ্যবর্ত্তী মূল্যায়ণের আলোকে নির্দ্দিষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করা যায়। স্বয়ংম্ভরতা অর্জনের জন্য আমাদের যে প্রয়াস করতে হবে তার লক্ষ্য শুধু মাত্র বহুলমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়; তার লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। আমাদের কারিগরি প্রতিভাকে বিকশিত করে তাকে এতখানি উন্নত করতে হবে যাতে রপ্তানি পণ্যের সমুচিত উৎকর্ষ সাধন করা যায়। তাই শ্রমিক, মালিক, কৃষক, কারিগর, প্রযুক্তি বিশারদ ও বিজ্ঞানী, এ সকলের সহযোগিতা সমান সবেই কাম্য। যুদ্ধোত্তর নতুন বছরে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা যে সাহস ও নির্ভীকতার সঙ্গে করছে তাতে এই প্রত্যয়বোধ সকলের মনেই প্রবল হয়ে উঠেছে যে আমরা সত্তরের দশকে দারিদ্র্য, অভাব ও অনগ্রসরতা দূরীভূত করে এক নতুন যাত্রাকালের সন্ধান অচিরেই লাভ করতে সমর্থ হব।



## আমাদের বন্দর গুলিই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে

১৫ পৃষ্ঠার পর

ভারতের সমস্ত বড়বড় বন্দরগুলির প্রশাসনই পোর্ট ট্রাস্ট বোর্ডের অধীন। ছোট এবং মধ্যম শ্রেণীর বন্দরগুলির পরিচালন ভার রাজ্য সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত করা আছে। বন্দর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি রাষ্ট্রীয় বন্দর পরিষদ স্থাপন করেছেন। চতুর্থ যোজনায় বন্দর উন্নয়নের জন্য মোট ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে যে লক্ষ্যমাত্রা স্থিরকরা হয়েছে, তা হল ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাত বন্দরগুলিতে মাল চলাচলের ক্ষমতা ৯ কোটি মেট্রিক টনে পৌঁছবে। চলতি যোজনায় হলদিয়া, ম্যাঙ্গালোর এবং তুতীকোরিণ বন্দরের উন্নয়নে হাত দেওয়া হয়েছে।

বন্দর উন্নয়নের ব্যাপারে এই যোজনায় আর যে সব কাজ হচ্ছে, তার মধ্যে আছে মাদ্রাজ এবং মারমাগোয়া বন্দরে খনিজ লোহা জাহাজ থেকে ওঠান এবং নামানোর জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা ও বিশাখাপত্তনমে একটি বহির্বন্দর স্থাপনের ব্যবস্থা করা। কোচিনে একটি তেল ডক্‌ এবং বোম্বাই বন্দরের সহায়ক হিসাবে নবা সেবা বন্দরের উন্নয়নও এই যোজনাকালেই সমাপ্ত হবে বলে আশাকরা যাচ্ছে। এ ছাড়া কালক্রমে আর যে কাজটিতে হাত দেওয়া হবে, সেটি হল বন্দরগুলির আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা।

ভারতীয় বন্দরগুলির উন্নয়নের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নত হবে, ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভীরেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

# ধনধান্যে

চতুর্থ বর্ষ ঃ ৩ ১৫ই জুলাই ১৯৭২ ২৫ পয়সা
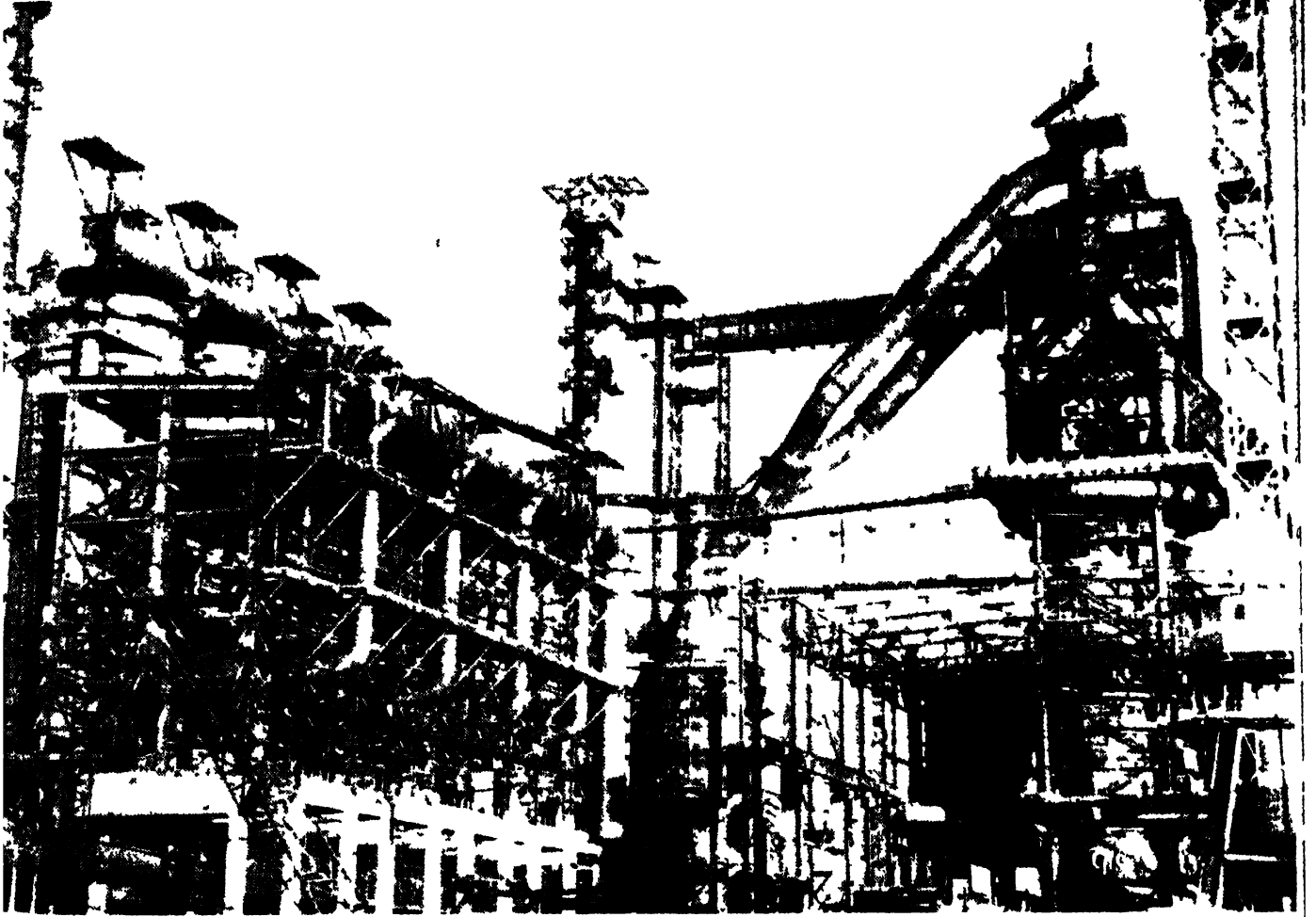
ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা

★

পঞ্চম যোজনার ভাবনা চিন্তা

★

গ্রাম বৈদ্যুতিকীকরণ

# অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ

গত ২৮শে জুন ১৯৭২, অধ্যাপক মহলানবীশ পরলোক গমণ করেছেন। ২৯শে জুন ছিল তাঁর ৭৯ তম জন্মদিন। তাঁর পরলোকগমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের হাল ধরে ছিলেন যে সব বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, তাঁদের একজন অন্তর্হিত হলেন।

এদেশে সরকারী মহলে তাঁর পরিচয় অধ্যাপক হিসাবে। কিন্তু এ দেশের বিজ্ঞানী মহল তাঁকে জানত পদার্থবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ এবং পরিকল্পনাকার হিসাবে। অধ্যাপক মহলনাবীশ জীবন শুরু করে ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে। এই কলেজেই তাঁর জীবনের দীর্ঘ ত্রিশটি বছর অতিবাহিত হয়। সংখ্যাতত্ত্বে তাঁর অনুরাগের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট—যা কালক্রমে পৃথিবীর মধ্যে সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক বিখ্যাত গবেষণাগার হয়ে উঠেছে। পরিকল্পনাকার হিসাবে তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশের সুসম এবং সর্বাঙ্গীন উন্নতি। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দেশকে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনায় তিনি কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করে ছিলেন। তাঁর বিরাট কীর্তির মধ্যে আর একটি হ'ল, ভারতীয় অর্থনীতির কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি জিনিষ—ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সিসটেম। এই সব কিছুই হয়েছে মূলত তাঁর একক প্রচেষ্টায়—তাঁর কীর্তির মধ্যে পরিস্ফুট রয়েছে তাঁর বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ, তাঁর বিজ্ঞানী মনের ছাপ, তাঁর বৈপ্লবিক সংগঠন ক্ষমতা, তাঁর কর্মে

তৃতীয় কভারে দেখুন

ঐকান্তিকতা আর তাঁর স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর জন্য গর্ববোধ ও উৎকণ্ঠা।

প্রচলিত ধ্যান ধারণার প্রতি তিনি কোন দিনই আস্থাশীল ছিলেন না—তা সে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গতই হোক না কেন—সব সময়েই সব কিছুতেই তিনি খুঁজে বেড়াতেন এক মৌলিক সমাধান।

তিনি বলতেন, "সমাজের কাছে বিজ্ঞানের গুরুত্ব নির্ভর করছে কি পরিমাণে এই গুরুত্ববোধ প্রচলিত ধারণা ও তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষা করতে সক্ষম, তার ওপর।"

তাঁর বিশ্লেষণ ধর্মী মন কখনই বাস্তব সমস্যার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে ভুল করত না আর সেই জনাই তাঁর সঙ্গে যারা কাজ করার সুযোগ পেয়ে ছিলেন তাদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে তিনি কখনই ব্যর্থ হন নি। সংখ্যাবিজ্ঞান এবং জাতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় (system) তাঁর অবদান, তাঁকে পৃথিবীর মানুষের কাছে চিরকাল অমর করে রাখবে।

জাতিপুঞ্জের পৃষ্ঠ পোষকতায় সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ক নমুনা তৈরীর জন্য গঠিত উপ আয়োগের (sub-commission) সভাপতি হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে অথচ অল্প খরচে নমুনা সংগ্রহ সম্বন্ধে কি করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, সে ব্যাপারে তাঁর মৌলিক অবদানের কথা সারা জগৎ জানে। ন্যাশনাল স্যামপল সার্ভে (N. S. S.) ২০ বছর ধরে যার সর্বেসর্বা ছিলেন তিনি, সেই এন এস. এস দেশের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সুসঙ্গত পরিকল্পনা রচনায় এবং এ ব্যাপারে নীতি নির্দ্ধারণে সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে। তাঁর অন্যতম কীর্তির মধ্যে আর একটি হ'ল কেন্দ্রীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সংস্থা (C. S O). সংস্থার প্রধান কাজ হ'ল সরকারের যাবতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কাজের সমন্বয় করা। এই সি. এস ও. এবং এন এস. এস. কে নিয়েই তৈরী ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল অফিসিয়াল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সিসটেম। অধ্যাপক মহলানবীশের অক্লান্ত পরিশ্রম, মৌলিক চিন্তাধারা এবং পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সংখ্যা বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও এই বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা না থাকলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল অফিসিয়াল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সিসটেম কোন কালেই বাস্তবে পরিণত হত না।

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার জগতে তাঁর প্রবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি হ'ল ১৯৪৯ সালে জাতীয় আয় কমিটির সভাপতি হিসাবে তাঁর নিয়োগ। তাঁর চোখে ভারতের দারিদ্র, বেকারী এবং হীন জনস্বাস্থ্য অবস্থার সমস্যাগুলি কোন দিনই ছোট করে দেখা দেয় নি। তাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁকে জাতীয় আয় সম্বন্ধে সমীক্ষা

# ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

১৫ই জুলাই ১৯৭২ : ২৪শে আষাঢ় ১৮৯৪

Vol Iv : No : 3 : July 15 1972

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক

দ্বারকা নাথ মুন্সী

সহ সম্পাদক

সমর ঘোষ

উপ-সম্পাদক

দিলীপ কুমার ঘোষ

সংবাদদাতাগণ

সুভাষ বসু ( কলকাতা )

এস. ভি. রাঘবন ( মাদ্রাজ )

ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ( শিলং )

রসকট কৃষ্ণ পিল্লে ( ত্রিবান্দ্রাম )

অবিনাশ গোডবোলে ( বোম্বাই )

সিদ্ধার্তন কারিয়াল ( দিল্লী )

ফোটো অফিসার

কে নারায়নস্বামী

প্রচ্ছদ পট

বোকারো ইস্পাত কারখানার এক অংশ

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

## যুগবাণী

'অন্যের' কাছ থেকে ধার করা নয়, একান্তভাবে নিজেদের সামর্থ্য দ্বারা যা কোরতে পারা যায়, তারই ওপর শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করে একটি জাতির প্রকৃত শক্তি। আমি বুঝি দুটি জিনিস—এক আত্মনির্ভরতা, দুই আত্মবিশ্বাস।'

—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

### এই সংখ্যায়

# বাণিজ্য নীতি ঃ নতুন দিক

**সম্পাদকীয়**

বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এল. এন. মিশ্র গত ২৭ই জুলাই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেডে এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আভাস পাওয়া গেছে। এবারের সম্পাদকীয়তে ঐ ভাষণেরই সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরা হ'ল।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে, সে বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ যেহেতু ক্রমশই কমে আসছে; তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় বৈদেশিক সাহায্য আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, শুধু এই শর্তে যখন সাহায্যকারী দেশগুলি এই অজুহাতে আমাদের নিজের ভাগ্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কোন রকম নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করা নিছক এক মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

সম্প্রতি আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে বেশ কিছু উন্নতি দেখা দিয়েছে। বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে দেখা গেছে যে শিল্পজ রপ্তানির পরিমাণ অন্তত বার্ষিক শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। এই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে কতকগুলি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। দু'বছর আগে পার্লামেন্টে আমাদের রপ্তানী নীতি সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয়, তাতে কৃষিজ ও খনিজ পণ্যদ্রব্যের তালিকায় আরও নতুন নতুন জিনিষ যোগ করার সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি এবং পুরাতন দ্রব্যগুলি ছাড়া অন্যান্য জিনিষ উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপের কথাও বলা হয়েছে। এ জন্য শিল্প নীতি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য বা আর্থিক নীতিগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে এখনও আমাদের অনেক কিছু অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু রপ্তানি প্রসারের জন্য একটি শুভ সূচনা যে আমরা করতে পেরেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

এ ছাড়াও যা দরকার, তা হ'ল, আমাদের বাণিজ্য নীতিতে কিছু গঠনমূলক পরিবর্তন আনা। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারের ভূমিকা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে মোট আমদানি পণ্যদ্রব্যের প্রায় তিন চতুর্থাংশই আমদানি হয় ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে। শুধু আমদানি বিকল্পের ক্ষেত্র, নতুন ধরণের কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকারী ভূমিকা বেড়ে চলেছে। মিনারালস এণ্ড মেটালস ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে ৪৬টি পণ্য এখন লেনদেন হয়ে থাকে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ কতকগুলি পণ্য লেনদেনের জন কটন কর্পোরেশন কাজু কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড ইত্যাদি ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং পাট, অভ্র, চোবড়, শুকনা ফল ইত্যাদির জন্য এই ধরণের আরও সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মোটামুটিভাবে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের এখন অবস্থা এই রকম, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের পথে এখনও অনেকগুলি বড় বাধা রয়েছে। প্রথম, উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানি দ্রব্যগুলি উন্নত দেশগুলির বাজারে ক্রমশই বেশী করে শুল্ক সম্বন্ধীয় বাধার সম্মুখীন হচ্ছে; তাছাড়া, কৃত্রিম বিকল্প পণ্যের সমস্যা, অর্থ বিনিয়োগের সমস্যা তো আছেই।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে বাধাগুলি শুধু বিদেশ থেকেই আসছে না; স্বদেশেও এ ব্যাপারে নানা ধরণের অসুবিধা আছে। তার মধ্যে একটি বড় অসুবিধা হ'ল কাঁচামাল সরবরাহে ঘাটতি। ইস্পাত শিল্পের কথাই ধরা যাক। দেশীয় শিল্পপতিদের যাতে ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল পেতে অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডে ষ্টীল ব্যাঙ্ক স্থাপন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য আরও সমস্যাগুলি হ'ল যেমন নতুন বাজারের সন্ধান, রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য মজুত রাখা, রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান, বিদেশের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ধরণ বদলানো, পণ্যদ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়ন, রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদি।

নতুন বাজারের সন্ধান করার ব্যাপারে আমরা কিছু পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছি ঠিকই; তবুও এ ব্যাপারে আমরা সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিচ্ছি এশিয়ার দেশগুলির বাজারের ওপর। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি ইত্যাদির ফলে আশা করা যায় যে, এ দুটি দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া নেপাল, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং দক্ষিণপূব ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতেও আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতিরা সম্ভবত আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির প্রতি এখনও যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। এখানেও আমাদের সুযোগের অভাব নেই বলে মনে করা হয়। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক লেনদেনই শুধু বাড়ছে না, শিল্প ও প্রযুক্তি-বিদ্যা সম্বন্ধীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের দুর্দিনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের সঙ্গে অধিকতর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে এই দেশগুলি বেশ উৎসুক। তাই সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই সব দেশে আমাদের পণ্যদ্রব্য যাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায়, সে জন্য দেশের শিল্পপতিদের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এশিয়া, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বাজার প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। এ ব্যাপারে ক্রেতার চাহিদা, রুচি এবং বিপননের বিষয়ে নানা অসুবিধা দূর করা নিঃসন্দেহে একটি কষ্ট সাধ্য ব্যাপার; কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতি সমাজকে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁরা এ দায়িত্ব পালনে অবশ্যই এগিয়ে আসবেন।

# সিমলা শীর্ষ বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মি: জেড্ এ. ভুট্টোর মধ্যে শীর্ষ বৈঠকের জন্য গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে জল্পনা কল্পনা চলেছে। এত জল্পনা কল্পনার কারণ এই, যে বৈঠকটির ফলাফলের ওপর ভবিষ্যতের অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান নির্ভর করেছে। সকলের কাছেই এটি খুব সুখের কথা যে, এই বৈঠকে কতকগুলি মঙ্গলময় লক্ষ্যে পৌঁছান গেছে এবং এই লক্ষ্যগুলির সার্থক রূপায়ণের ওপরই নির্ভর করছে এই দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যতের শুভ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক। গত ২৫ বছরের অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে যে সংঘর্ষমূলক তিক্ততার সম্পর্ক বর্তমান আছে, তার স্থান নেবে এক শুভ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক।

গত ৩রা জুলাই এই দুই নেতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেই চুক্তির প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে যে, ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের সরকার আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ ও বাদ বিসংবাদের সম্পর্ক আছে, তাতে ইতি টেনে দিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে এক বন্ধুত্ব ও ঐক্যের সম্পর্ক যাতে স্থাপিত হয়, যার দ্বারা এই উপ মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। এর ফলে এই দুই দেশই এখন থেকে তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য তাদের যাবতীয় সম্পদ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

২৫ বছরের সংঘর্ষে দুই দেশেরই ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধে, যুদ্ধহেতু দুই দেশের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় ঘটেছে, সে কথা ছেড়ে দিয়েও কত প্রাণ- কত অস্ত্রশস্ত্র এবং জনসাধারণের কত সম্পত্তি যে নষ্ট হয়েছে, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। বছরের পর বছর ধরে দুই দেশেরই প্রতিরক্ষা বাজেটের অংক স্ফীত হয়ে উঠেছে কারণ দুই দেশেরই ছিল পারস্পরিক আক্রমণ ভীতি-প্রসূত নিজ নিজ ভূখণ্ড রক্ষা করার চেষ্টা। এর ফলে দুই দেশই উন্নততর মারণাস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে—ফলে এত বিরাট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত ধোঁয়ায় পর্যবসিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান দারিদ্রের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, এই বিরাট অংক বিনিয়োগ নিতান্তই অর্থহীন ; যা আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পাকিস্তানের পক্ষে এ কথা আরও বেশী পরিমাণে প্রযোজ্য, কেন না, সাম্প্রতিককালে ঐ দেশ তার বাজেটের অর্দ্ধেকেরও বেশী পরিমাণ অর্থ শুধু প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করে আসছে।

চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে যে সে ভারতের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের নীতিতে ইতি টেনে দিয়ে নীতি মেনে নেবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ও দুই দেশের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টিকারী মূল সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করে যাবে। এর ফলে দুই দেশই তাদের নিজ নিজ এই বিরাট অংকের অপচীয়মান সম্পদকে সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপে বিনিয়োগ করতে পারবে এবং তার দ্বারা সুস্থতর অর্থনীতি গড়ে তোলা—জনকল্যাণের বহু প্রতীক্ষিত এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

ভারত বরাবরই দুই দেশের মধ্যেকার সমস্ত বড় সমস্যাগুলিকে শক্তি প্রয়োগ বর্জনের মাধ্যমে এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের ওপর জোর দিয়ে এসেছে। ১৯৪৯ সালে ভারত যুদ্ধ বর্জন চুক্তিতে পাকিস্তানকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। তারপর বছর ধরে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কোন না কোন ভাবে এই অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন। চুক্তিমধ্যে পাকিস্তানও 'যুদ্ধং দেহি' ভাব বজায় রাখার কুফল সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ অবহিত হয়েছে।

আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বর্তমান চুক্তি পারস্পরিক শান্তির এক নব যুগের সূচনা করবে। যার ফলে উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর এমন, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশের জনগণের উন্নতমানের জীবনযাত্রার দীর্ঘ পোষিত আশা পূর্ণ হবে।

# পঞ্চম যোজনার ভাবনা চিন্তা

পরিকল্পনা কমিশনের তৈরী পঞ্চম যোজনার খসড়াটি নিয়ে গত ৩০ এবং ৩১শে মে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ আলোচনা করে দেখেছেন। এতে জনসাধারণের দারিদ্রের ওপর সোজাসুজি আঘাত হানা এবং দেশের ২২ কোটি মানুষকে তাঁদের নিম্নতম প্রয়োজন মিটিয়ে অন্তত বেঁচে থাকবার মত অবস্থায় নিয়ে আসবার কথা বলা হয়েছে।

এতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, গত দু' দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং মোট জনসংখ্যার তুলনায় গরীব লোকেদের অর্থাৎ যাঁদের জীবনযাত্রার মান একটি প্রাথমিক সর্বনিম্ন ব্যয় ক্ষমতার স্তরের নীচে, তাঁদের অনুপাত কিছু পরিমাণে কমেছে ঠিকই, কিন্তু সংখ্যাগত দিক দিয়ে দেখলে দু' দশক আগেও গরীব লোকের সংখ্যা যা ছিল, আজও তাই আছে, কিছুই কমেনি। এই জনসমষ্টিকে সর্বনিম্ন ব্যয় ক্ষমতার স্তরে আনতে গেলে এখনও ৩০ থেকে ৫০ বছর সময় লাগবে। তাই এই দীর্ঘকাল ধরে এই সমস্যার সমাধান না করে চুপচাপ বসে থাকা যেমন একদিক দিয়ে সম্ভব নয়, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও নয়।

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলিতে উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের মধ্যে বৈষম্য বর্তমান ছিল। এই পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ করে, সেই সম্পদকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির কাজে বিনিয়োগ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে, খসড়ায় বলা হয়েছে যে, যোজনা সুরু হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত যোজনায় এই ধরণের লক্ষ্য বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু আজ আমাদের অর্থনীতি এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে যখন আরও বেশী পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা এবং দারিদ্র, বেকারত্ব ও নিম্নমানের কর্মসংস্থান সমস্যার সরাসরি সমাধান করা সম্ভব। দারুণ দারিদ্র বলতে যা বোঝায় তা হ'ল, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট স্তরের নীচে থাকা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী মাথাপিছু প্রতি মাসে ব্যয় ক্ষমতা ২০ টাকার নীচে চলে যাওয়াকেই দারুণ দারিদ্র বলা হয়ে থাকে। বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী এই অঙ্কটি বেড়ে ৩৭.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ২২ কোটি মানুষ এই স্তরের নীচে আছে। সমস্যার আকার এবং এই নির্দিষ্ট ব্যয় ক্ষমতার স্তরের নীচে আছে এমন মানুষের সংখ্যা সব রাজ্যে একই নয়। শহরের অধিকাংশ দরিদ্র লোকের অবস্থাই মোটামুটি ভাবে বলা যায়, গ্রামের দরিদ্রদের চেয়ে ভাল। তাই আমাদের প্রধান দৃষ্টি হল গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের ওপর।

দারুণ দারিদ্রের প্রধান কারণ হল প্রকট বেকারত্ব, নিম্নমানের কর্মসংস্থান এবং কৃষি ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অসংগতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়লেই শুধু এই সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্য চাই এই সমস্যাগুলির ওপর সোজাসুজি আঘাত হানা। এই নীতির মূল বিষয়বস্তু হল কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে এমন করতে হবে, যার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে শাসনতান্ত্রিক ও কারিগরী বাধাবিপত্তিগুলি সহজেই দূর করা যায়।

গরীব লোকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কিন্তু শুধু তার দ্বারাই দেশের ২২ কোটি মানুষকে সর্বনিম্ন ব্যয় ক্ষমতার স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না; আরও যা চাই, তা হল অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র যেমন ডাল, তেল, কাপড়, চিনি, জ্বালানি ইত্যাদির মূল্যমান স্থির রাখা। তাই উৎপাদন ও বণ্টন নীতিগুলিকেও ঢেলে সাজাবার দরকার হবে যার ফলে এই জিনিষগুলি সুলভ হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করা, বিকল্প জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করা ও আমদানি বিকল্পের নানান কৌশল ইত্যাদিকে কি করে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান যায়, তা দেখতে হবে। সেই সঙ্গে ধনী সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় নয় এমন জিনিষপত্রের ব্যয় আগের তুলনায় অনেক হ্রাস করা দরকার, যার দ্বারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই ধরণের একটি বন্টন নীতি গ্রহণ করার জন্য বেতন, আয়,

মুনাফা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা ও কার্য্য প্রণালীর বেশ কিছু পরিবর্তনও অবশ্যই করতে হবে।

## লাভজনক কর্ম্মসংস্থান

লাভজনক কর্মসংস্থানের সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে তোলাই হল আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। পঞ্চম যোজনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি পানীয়জল, গৃহ-নির্মাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা ছাড়াও দারুণ দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কর্মসৃষ্টিকারী প্রকল্পে হাত দেওয়া হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে ক্ষুদ্র সেচ, জমি সংরক্ষণ, অঞ্চল উন্নয়ন, পশু পালন, বন সৃষ্টি, মাছের চাষ, পণ্য সম্ভার গুদামজাত করা এবং তা বিপননের ব্যবস্থা করা, কৃষি ভিত্তিক ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা, পূর্ত্ত সম্বন্ধীয় কাজকর্ম ইত্যাদির বিশেষ কর্মসূচী এবং খরা এলাকার জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচী। উন্নয়নমূলক কাজকর্মের এই সব খাতে চতুর্থ যোজনায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ছিল ৩৬০০ থেকে ৩৯০০ কোটি টাকা এবং যোজনার শেষ বছরের জন্য বরাদ্দ হল প্রায় ১০৭৫ কোটি টাকা।

শাসনতান্ত্রিক, প্রতিষ্ঠানমূলক ও অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম যথা সম্ভব সম্প্রসারিত করে কি পরিমাণে কর্মসৃষ্টি করা যায়, তা দেখাই হল পঞ্চম যোজনা প্রস্তাবনার মূল লক্ষ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া প্রস্তাবনায় অনেকগুলি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে: সৃষ্ট সম্পদের দ্বারা উৎপাদন বাড়িয়ে তুলে এবং জন কল্যাণ মূলক কাজকর্ম বৃদ্ধি করে গ্রামাঞ্চলে কত বেশী সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব, ক্ষুদ্র শিল্প, বাণিজ্য ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে কত বেশী সংখ্যক মানুষের জন্য কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব, লাভজনক কর্মসৃষ্টির পথে বর্তমানে যে সব প্রতিষ্ঠানমূলক, শাসনতান্ত্রিক, কারিগরী ও অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি আছে, সেগুলিকে কি পরিমাণে দূর করা সম্ভব, দরিদ্রদের নূন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে পরিমাণ কর্মসৃষ্টির প্রয়োজন এবং যে পরিমাণ কর্মসৃষ্টি আমরা করতে পারি, এ দু'এর মধ্যে ব্যবধান কত থাকবে।

## সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম্ম

খসড়া প্রস্তাবনায় এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে কর্ম সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য যে সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে তার সাহায্যকারী কর্মসূচী হিসাবে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ কর্মসূচীগুলিও চালু রাখার দরকার হবে এবং চতুর্থ যোজনায় যে সব বিশেষ কর্মসূচীর কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল সেগুলিও চালু থাকবে। খসড়া প্রস্তাবনায় দাবী করা হয়েছে যে, এই সব কর্মসূচী-গুলিও চালু রাখার দরকার হবে এবং চতুর্থ যোজনায় যে সব বিশেষ কর্মসূচীর কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, সেগুলিও চালু থাকবে। খসড়া প্রস্তাবনায় দাবী করা হয়েছে যে, এই সব কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, কৃষি বিজ্ঞানী ইত্যাদি শিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসৃষ্টি হবে। কর্ম সম্ভাবনার সুযোগগুলি আরও বেড়ে যাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অধিকতর প্রয়োগের দ্বারা। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র সমস্যার উপর ভূমিসংস্কারের নিয়মকানুনের কি সংঘাত দেখা দিয়েছে, তাও চলতি বছরে নির্দ্ধারণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি এমন হতে হবে, যেন তা দিয়ে ভূমিসংস্কার কার্য্যকারী হবার পর ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য অন্তত: নূন্যতম পরিমাণে দেওয়ার জাতীয় কর্মসূচীকে চালু রাখা দরকার হবে।

## নূন্যতম প্রয়োজন

একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নূন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে, সেই কর্মসূচীর আওতায় পড়ে: ১৪ বছর বয়স ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, নূন্যতম পরিমাণে জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা যাতে জনসাধারণ পেতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা (এর মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করাও অন্তর্গত,) গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ, ভূমিহীন কৃষকদের জন্য গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ এবং রাস্তাঘাটের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলি থেকে বস্তি দূরীকরণের ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সংবিধানের নির্দেশ হল, সংবিধানের সূচনা থেকে দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের সব ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, চতুর্থ যোজনার শেষ নাগাদ ছয় থেকে এগার বছর বয়:সীমার মধ্যেকার সমস্ত বালক-বালিকার শতকরা ৮৪ জন এবং এগার থেকে চৌদ্দ বছর বয়:সীমার শতকরা ৪০ জন কিশোর-কিশোরী এই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসবে। শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংখ্যাগত দিক দিয়ে এখনও বিরাট আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে, বিশেষ করে বালিকা ভর্ত্তির ব্যাপারে এই বৈষম্য আরও প্রকট। ১৯৭৫ সালের মধ্যেই ছয় থেকে এগার বছর বয়:সীমার সমস্ত বালককে স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে আনা সম্ভব হলেও, সমস্ত

বালিকাকে এই গণ্ডীর মধ্যে আনা বেশ দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। এগার থেকে চৌদ্দ বছর বয়ঃসীমার মধ্যেকার শতকরা ৫০ জনের বেশী কিশোর-কিশোরিকে সম্ভবত পঞ্চম যোজনার শেষেও স্কুলের আওতায় আনা যাবে না। স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয়ত ষষ্ঠ যোজনার গোড়ার দিকে এই বয়ঃসীমার সব কিশোর-কিশোরীকে স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

খসড়া প্রস্তাবনায় সমাজের সর্বস্তরে অশিক্ষা দূরীকরণ এবং অধিক পরিমাণে ছাত্র ভর্তির জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রত্যেক গ্রামের প্রতি ১.৫ কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫ কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে কথা বলা হয়েছে তাও ভৌগলিক দিক থেকে বেশ সুষমতার পরিচায়ক।

## সর্বনিম্ন পরিমাণ জনস্বাস্থ্যমূলক সুযোগ-সুবিধা

জনসংখ্যা ঘনত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সুলভ করে তোলা দরকার। বর্তমানে দেশে প্রতি ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ লোকের জন্য একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে ৮ থেকে ১০টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। অর্থাৎ প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওপর প্রায় ১০,০০০ লোককে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য প্রতি ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ লোকের জন্য একটি করে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা। পঞ্চম যোজনাকালে যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসকের চাহিদা মেটাবার জন্য এবং জনসাধারণের প্রত্যেকের জন্য অধিকতর চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সুলভ ক'রে তোলার জন্য হয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ত্রি-বার্ষিক শিক্ষাক্রম (ডিপ্লোমা) চালু করা প্রয়োজন হবে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ভেষজ বিজ্ঞানের খাতে উন্নতি হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার হবে, তার সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত করে তোলাও প্রয়োজনীয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর রূপায়ণে যেন গুরুত্ব হ্রাস না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও একান্ত কর্তব্য। বর্তমানে এ বিষয়ে যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, সেগুলির প্রয়োগ তো আরও গুরুত্ব সহকারে চলবেই, তা ছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমস্যার সঙ্গে একীভূত করার কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে।

ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো কর্মসূচীর একটি সবিশেষ অঙ্গ হিসাবেই প্রসূতি এবং স্কুলে পাঠানোর উপযুক্ত নয় এমন শিশুরা যে প্রোটিনের অভাবজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেই সমস্যার মূলে কুঠারঘাত করতে হবে। তাই প্রসূতি এবং অল্প বয়স্ক শিশুদের পুষ্টির সমস্যা একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়। এই বিষয়কে কতখানি অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব হবে, তা অবশ্য আমাদের কর্তব্য পালনে দক্ষতা এবং প্রসব করানোর জন্য উন্নততর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ক্ষমতার ওপরই নির্ভরশীল।

বৃদ্ধ এবং বিকলাঙ্গ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার কথাও ভাবতে হবে। জনসাধারণের এই অংশটুকুর জন্য যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন হবে।

দেশের মোট ৫,৬৭,০০০ গ্রামের মধ্যে দেখা গেছে, প্রায় ১,৫০,০০০ গ্রামে জল সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্যমূলক সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই। অথবা এই গ্রামগুলির জলে লবণ, লৌহ এবং ফ্লুওরাইড জাতীয় মলিনতা আছে। এমনও অনেক গ্রাম আছে যেখানে পানীয় জলের সরবরাহ অপ্রচুর অথবা সেখানে হরিজন ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকজনদের জল সরবরাহের সুব্যবস্থা নেই। খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বর্তমানে রাজ্যগুলি গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ খাতে বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত ব্যয় করে থাকেন। ১৯৭২-৭৩ সালে এই বরাদ্দের পরিমাণ আরও ২০ কোটি টাকা বাড়বে। ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে পঞ্চম যোজনার শেষে এই খাতে বরাদ্দ ১০০ থেকে ১২০ কোটি টাকা পর্যন্ত করার দরকার হবে।

গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের জন্য গৃহ-নির্মাণের এক বিরাট ও ব্যাপক কর্মসূচী পঞ্চম যোজনায় গ্রহণ করা হবে। উদ্দেশ্য হল, সমস্ত রাজ্যেরই যথেষ্ট সংখ্যক ভূমিহীন কৃষককে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা।

গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে, পঞ্চম যোজনার শেষে ১,৫০০ এর বেশী জন অধ্যুষিত সমস্ত গ্রামেই সব ঋতুতে খোলা থাকে এমন রাস্তাঘাট নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকেও এমনভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে, যার ফলে পঞ্চম যোজনার শেষ নাগাৎ সমস্ত রাজ্যের গ্রামীন জনসাধারণের অন্তত শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ মানুষ এই সুবিধা ভোগ করতে পারেন। রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে অবশ্যই সুসমন্বিত এক পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন হবে।

বস্তি উন্নয়ন সমস্যাটিকে দু'দিক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, প্রথম, বস্তি অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরুন্নয়ন এবং দ্বিতীয়, সামগ্রিক ভাবে পারিপার্শ্বিক

অবস্থার উন্নয়ন। এ জন্য, আঞ্চলিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে দু'ধরণের কর্মসূচী রূপায়ণ করার জন্য জমি অধিকার করার প্রয়োজন হবে। ১৯৭২-৭৩ সালে এগারটি শহরে (কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, কানপুর, লক্ষ্নৌ, পুনা এবং নাগপুর) বস্তি অপসারণ, গৃহ-নির্মাণ ও বস্তি উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ভাবে একটি ২০ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। বাকী অঞ্চলগুলির জন্য প্রথম কর্তব্য হল, কোন্ কোন্ শহরে সমস্যা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে, তা নির্ণয় করা এবং সমস্যার প্রকৃতি ও আকার অনুযায়ী নগর উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

সুতরাং আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রথমেই যা করা প্রয়োজন, সেগুলি হল :

(১) প্রত্যেক জেলায় বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা, যার দ্বারা ১১ বছরের ঊর্দ্ধ বয়ঃসীমার নীচে সকল শিশুকে পঞ্চম যোজনাকালে স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় এবং সে জন্য কি অঙ্কের অর্থ ব্যয় প্রয়োজন তা নির্দ্ধারণ করা। ১১-১৪ বছর বয়ঃসীমার মধ্যেকার কিশোর-কিশোরীকে পঞ্চম যোজনাকালে স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে আনার জন্য রাজ্যগুলিকে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব কর্মসূচী প্রণয়ন করতে বলা হবে। এই বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য হবে সমস্ত রাজ্যেই যেন শতকরা ৫০ জন এই বয়ঃসীমার কিশোর-কিশোরীদের স্কুলের আওতায় আনা যায়। (২) পঞ্চম যোজনার শেষাশেষি নাগাৎ প্রতিটি ব্লকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা করার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচীর রূপায়ণে হাত দেওয়া। প্রতিটি ব্লকের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা এবং এগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী, চিকিৎসার কাজে লাগে এমন যন্ত্রপাতি ও ওষুধ পত্রের যথাযথ বন্দোবস্ত করা।

(৩) পঞ্চম যোজনার শেষাশেষি নাগাৎ দেশের সমস্ত গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য এক বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

(৪) ১,৫০০ বা ততোধিক জন অধ্যুষিত গ্রামে সব ঋতুতে খোলা থাকে এমন রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার একটা মোটামুটি হিসাব করা।

(৫) ৫ লক্ষ বা ততোধিক লোকের বাস যে সমস্ত শহরে, সেগুলি থেকে বস্তি অপসারণ এবং সেই সঙ্গে উন্নততর গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা করার জন্য একটি নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করা।

(৬) পঞ্চম যোজনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী রচনা এবং তজ্জন্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্য্যবেক্ষণমূলক কাজকর্মে যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তা মঞ্জুর করা।

(৭) অনুন্নত রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ রাজ্যগুলিকে গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের এমন কর্মসূচী রূপায়ণ করতে বলা, যার দ্বারা রাজ্যের গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ৪০ জন বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হন।

এই পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে হলে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য জন সহযোগিতার প্রয়োজনও অবশ্যই হবে।

আনুমানিক হিসাবে যা দেখা গেছে, তা হল, পাঁচ বছর ধরে এই প্রস্তাবিত কর্মসূচী রূপায়ণ করতে প্রায় ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। প্রতিটি রাজ্যের জনসাধারণের নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করা হবে, তার মূল কথা হল প্রতিটি রাজ্যের জন্য সঠিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও সম্পদের বরাদ্দ করা।

## মোট বিনিয়োগ

খসড়া প্রস্তাবনায় এই সব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পঞ্চম যোজনার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ১০,০০০ থেকে ১১,৫০০ কোটি টাকা। খসড়া প্রস্তাবনায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই পরিমাণ বিনিয়োগের ফলে দেশের বেকারী সমস্যার তো যথেষ্ট সুরাহা হবেই, পরন্তু এর দ্বারা 'গরীবি হটাও' এর উদ্দেশ্য সাধনেও যথেষ্ট এগোন যাবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে এই প্রকল্পগুলি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা সত্বেও এ কথা ঠিক যে এগুলি যোজনার একটি সামান্য অংশ বিশেষ ছাড়া কিছুই নয়। উপরোক্ত প্রকল্পগুলি সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে হলে এবং ১৯৭৮-৭৯ সালের পরেও উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে হলে কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এই কথা ভেবেই পঞ্চম যোজনার জন্য প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ চতুর্থ যোজনার বিনিয়োগের দ্বিগুণ করতে হবে। খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, পঞ্চম যোজনাকে পূর্ণমাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ও উৎপাদনের ধরণ কিছু পরিবর্তিত করা দরকার হবে। এ ছাড়া উপযুক্ত ভাবে এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ব্যাপকতর

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার যে পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তাকে ঢেলে সাজাবার জন্য পূর্বেই একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান দরকার।

অনুমান করা হচ্ছে, এই পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে ৬০০০ থেকে ৭,৫০০ কোটি টাকা যোগাড় করতে হবে এর মধ্যে রাজ্যগুলি সংগ্রহ করবে ২,৫০০ কোটি টাকা এবং বাকী অংশটি কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করবেন। যার অর্থ হল, চতুর্থ যোজনার মত পঞ্চম যোজনাতেও প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

খসড়া প্রস্তাবনায় কর ফাঁকি দেওয়া ও সব রকমের কর এড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য এবং আয় বৃদ্ধির পথকে সুগম করার জন্য কর ব্যবস্থায় ব্যাপক আকারের প্রত্যক্ষ সংস্কার সাধনের কাজে হাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষি আয়কে কর ব্যবস্থার অন্তর্গত করার জন্য এবং চতুর্থ যোজনার অবশিষ্ট বছর দুটিতে এই ব্যাপক কর ব্যবস্থা সংস্কারের কাজে লাগাবার কথাও এতে বলা হয়েছে।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তির ব্যাপারে সম্প্রতি যে সাংবিধানিক সংশোধনগুলি হয়ে গেছে, তার উল্লেখ করে খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে বর্তমান সম্পদ থেকে উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত আয় সংগ্রহ এবং শহরাঞ্চলে সম্পত্তি ও জমি জায়গা থেকে উদ্বৃত্ত যে বিরাট অংকের অনুপার্জিত আয় হয়, সেগুলিকে সম্পদ সংগ্রহ প্রচেষ্টার অন্তর্গত করতে হবে। কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধনকালে সংগৃহীত সম্পদের যাতে উপযুক্ত পুনর্বন্টন হয় এবং তা যাতে জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## স্বয়ম্ভরতার পথে

পঞ্চম যোজনার প্রারম্ভেই স্বয়ংভরতা লাভের জন্য আমাদের কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে খসড়া প্রস্তাবে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ১৯৮০-৮১ সালে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছুতে পারব বলে আশা প্রকাশ করছি, তা নিতান্তই কতকগুলি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আছে। তাই এই ঈপ্সিত অবস্থাটিকে আমাদের লক্ষ্য বলে বিবেচনা করার কোন কথাই উঠতে পারে না। এ সম্বন্ধে খসড়া প্রস্তাবনায় আরও যা বলা হয়েছে, তা হল তৃতীয় যোজনার শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত খাদ্য সাহায্য সমেত মোট ৭০১ কোটি টাকার মত সাহায্য পেয়েছে এবং খাদ্য সাহায্য ছাড়া ৪৭২ কোটি টাকার মত সাহায্য পেয়েছে।

১৯৭১-৭২ সালে খাদ্য ঋণ ও খাদ্য বহির্ভূত ঋণের পরিমাণ আশা করা যাচ্ছে, যথাক্রমে ৫২৮ ও ২০২ কোটি টাকার মত হবে। অনুমান করা হয়েছে, যে এই ভাবে একটানা আমদানি সংকোচন ও রপ্তানি বৃদ্ধি চলতে থাকলে ১৯৭৩-৭৪ সালে এ ব্যাপারে চতুর্থ যোজনার লক্ষ্য মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণের অর্দ্ধেকেই আমাদের প্রয়োজন মিটে যাবে। পঞ্চম যোজনার শেষে স্বয়ম্ভরতা লাভ করার লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে আমাদের বর্তমান নীতি, প্রতিষ্ঠানমূলক ব্যবস্থা ও সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও যা দরকার, তা হল, বিদেশের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলিতে কি পরিমাণ ও কি ধরণের চেষ্টা চালানো দরকার, তা ভাল ভাবে চিন্তা করে দেখা। এ বিষয়ে আমরা কি পরিমাণে সফল হব, শুধু তার ওপর ভিত্তি করেই বলা সম্ভব যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার না করেই বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে ইতি টেনে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা। যদি তা না হয়, তা হলে আমাদের লক্ষ্য সাধনের জন্য বিনিয়োগের ধরনকে কি ভাবে এবং কতটুকু পরিবর্তিত করা দরকার, তা ভেবে দেখতে হবে। এ সব কথা বিবেচনা করেই খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, পঞ্চম যোজনার কর্মকাণ্ড সুরু করার গোড়াতেই ধরে নিতে হবে যে ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাৎ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে অবশ্য এ কথা পরিষ্কার করে বলা আছে যে, পঞ্চম যোজনার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই জিনিসগুলি আবার ভেবে দেখতে হবে।

নীট সাহায্যের পরিমাণকে শূণ্য অবস্থায় নামিয়ে আনার অর্থ হল এই যে, তখন আমাদের যে পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন হবে তা শুধু ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করার জন্য। ঋণ পরিশোধ বাবদ সাহায্য যে পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হবে, সেই পরিমাণেই আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনও কমে যাবে। যে ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করতে হয় সে ক্ষেত্রে এ সাহায্য কোন রকম সর্তযুক্ত সাহায্য নয়। এই কারণে, খসড়া প্রস্তাবনায় বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণের (সাহায্য) ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

যোজনা কমিশন, পঞ্চম যোজনা রচনার কাজ ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ চরম ভাবে ঠিক করবেন, বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

# ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা
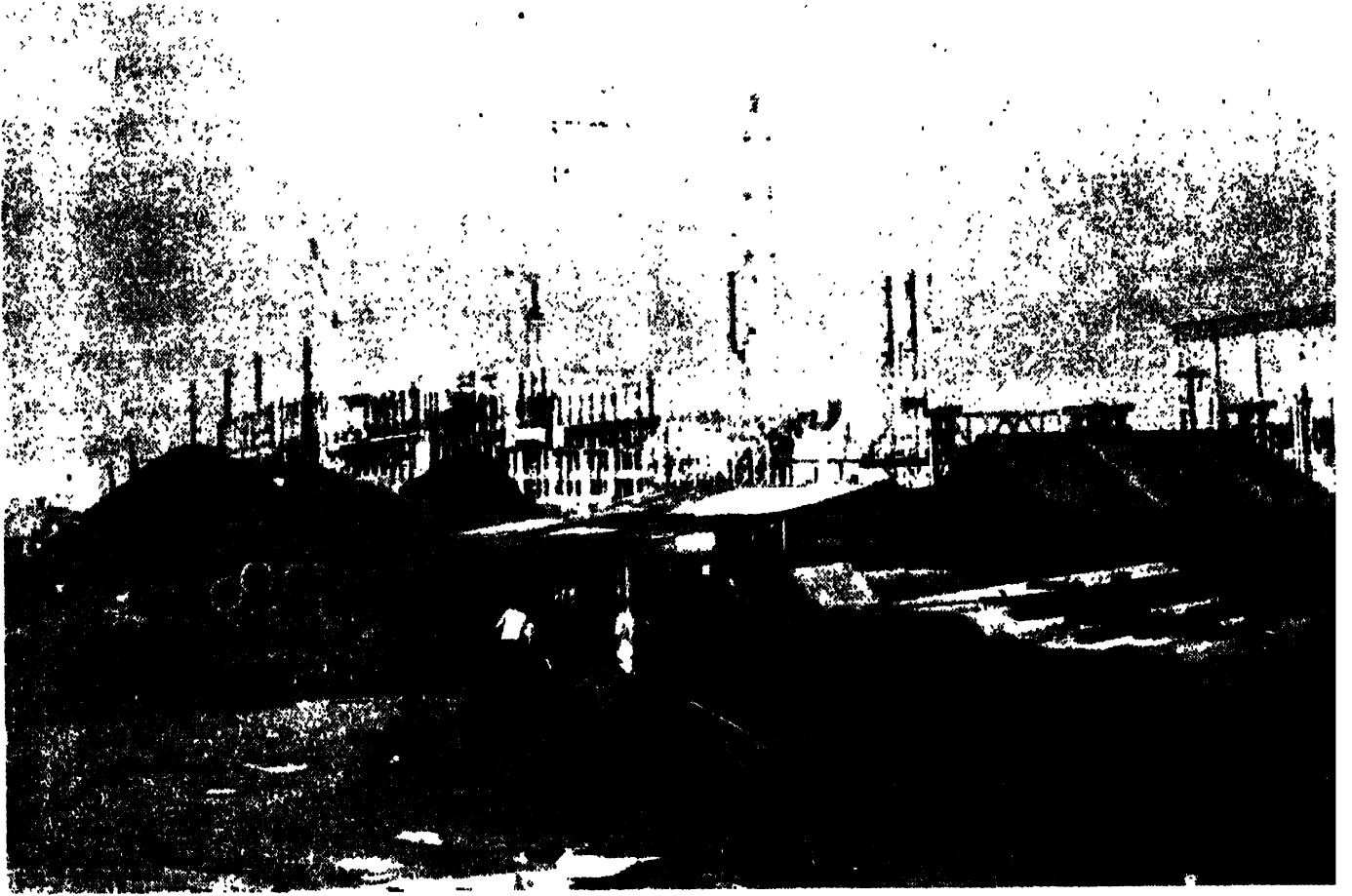
বোকারো কারখানার একটি দৃশ্য

# বোকারো ষ্টীল প্ল্যাণ্ট

ভারত এবং সোভিয়েৎ রাশিয়ার মধ্যে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৬৫ সালে উভয় সরকার এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এতে বলা হয় যে সোভিয়েৎ সরকারের সহযোগিতায় ভারতে বিহার প্রদেশে হাজারিবাগ জেলার বোকারোতে এক ইস্পাত কারখানা তৈরী করা হবে। পুরোপুরি চালু হওয়ার পর, এই কারখানা থেকে বছরে চার মিলিয়ন টন ইস্পাত পাওয়া যাবে।

বোকারো ইস্পাত কারখানা আমাদের দেশে চতুর্থ সরকারী ইস্পাত কারখানা হতে যাচ্ছে।

## মানিক ব্যানার্জি

এই ইস্পাৎ কারখানা বিভিন্ন পর্য্যায়ে তৈরী হচ্ছে। প্রথম পর্য্যায়ে এখান থেকে বছরে ১·৭ মিলিয়ন টন (ইস্পাত পিণ্ড) ও ৮,০০ ০০০ টন কাঁচা লোহা পাওয়া যাবে।

হিসাব মত প্রথম পর্য্যায়ের কাজ ১৯৭৩ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। এই কারখানা পুরোপুরি চালু হতে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে। প্রাথমিক পর্য্যায়ের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বছরে চার মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছানোর কাজও চলতে থাকবে।

বোকারো ইস্পাত কারখানা ইস্পাত শিল্পের flat products এর চাহিদা মেটাবার এক বিশেষ ভূমিক নেবে।

১৯৭৫ সালে দেশে finished flat products এর চাহিদা আর যোগানের মধ্যে পার্থক্য হবে ১ মিলিয়ন টন এবং সেটা বোকারোতে প্রাথমিক পর্য্যায়ে যে ১.২ মিলিয়ন টন ইস্পাত তৈরী হবে তা থেকে পুরোপুরি ভাবে মেটানো হবে। অনুরূপ ভাবে ১৯৮০ সালে ২.৫৪ মিলিয়ন টনের চাহিদা ও বোকারো থেকে মেটানো হবে যখন বোকারোতে উৎপন্ন হবে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন টন ইস্পাৎ। এতে বছরে ১৫০ কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

প্রথম পর্য্যায়ে যে ১.৭ মিলিয়ন টন ইস্পাত তৈরী হবে তা থেকে ১.৩৬৪ টনের মত হট রোলড্ লাইট প্লেটস, শীটস্ কয়েলস, কোলড রোলড শীটস ও কয়েলস এবং বিভিন্ন ফাউণ্ড্রিতে ব্যবহার করার উপযুক্ত ৮,৮০০০০ টন লোহা পাওয়া যাবে।

সোভিয়েৎ বিশেষজ্ঞ দল এক ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা যুগ্মভাবে প্রথম পর্যায়ের নক্সা তৈরী করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড এর 'দি সেন্ট্রাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডিজাইনিং ব্যুরো-কে' প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সোভিয়েৎ কারিগরী বিশেষজ্ঞরাও বোকারোতে এই কারখানা স্থাপনের কাজ সবসময় তদারক করছেন।

বোকারো ইস্পাৎ কারখানা—যেটা ভারতে সবচেয়ে বড় ইস্পাৎ কারখানা হতে যাচ্ছে তার জন্যে স্থান হিসাবে হাজারীবাগের বোকারোকে নির্বাচিত করা হল এখানকার বিশেষ কতকগুলি সুবিধার জন্য। যেমন খুব কাছেই রয়েছে প্রয়োজনীয় কয়লার খনি ও কয়লা শোধনাগার। প্রথম পর্য্যায়ে নিকটবর্ত্তী কয়লা শোধনাগার থেকে শোধিত কয়লা রেল যোগে নিয়ে আসা হবে এবং আস্তে আস্তে রেলের পরিবর্তে সরাসরি রোপওয়ের ব্যবস্থা হবে। বোনাই অঞ্চলের কিরিবুরু আর মেঘাতাবুরু থেকে আকরিক লোহা পাওয়া যাবে। ব্লাষ্ট ফার্নেসের উপযুক্ত চুণাপাথর আসবে ভবনাথপুর থেকে আর ষ্টিলমেল্টিং শপ এর জন্য কুতেশ্বর থেকে। নিকটবর্ত্তী হিরি অঞ্চলে রয়েছে ডলোমাইট। কোয়ার্টজাইট আসবে সাতনপুর থেকে। আর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যাবে বারবিল অঞ্চলে। এ সবগুলি জায়গাই বোকারোর কাছাকাছি অবস্থিত।

বর্ত্তমানে সাউথ ইষ্টার্ন রেলের এক শাখা লাইন বোকারো ষ্টীল সিটি রেলওয়ে ষ্টেশনকে গোমুণ্ডা ও চন্দ্রপুরার সঙ্গে যোগ করেছে। এই প্ল্যান্ট এর পশ্চিম দিকে এক বিরাট মার্শালিং ইয়ার্ড তৈরী করা হবে যাতে মাল চলাচলের কোন অসুবিধা না হয়।

এই ইস্পাত কারখানার প্রধান অংশগুলি হোল

(ক) কাঁচামাল রাখা ও মেশানোর প্ল্যান্ট
(খ) কোক্ ওভেন বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্ট
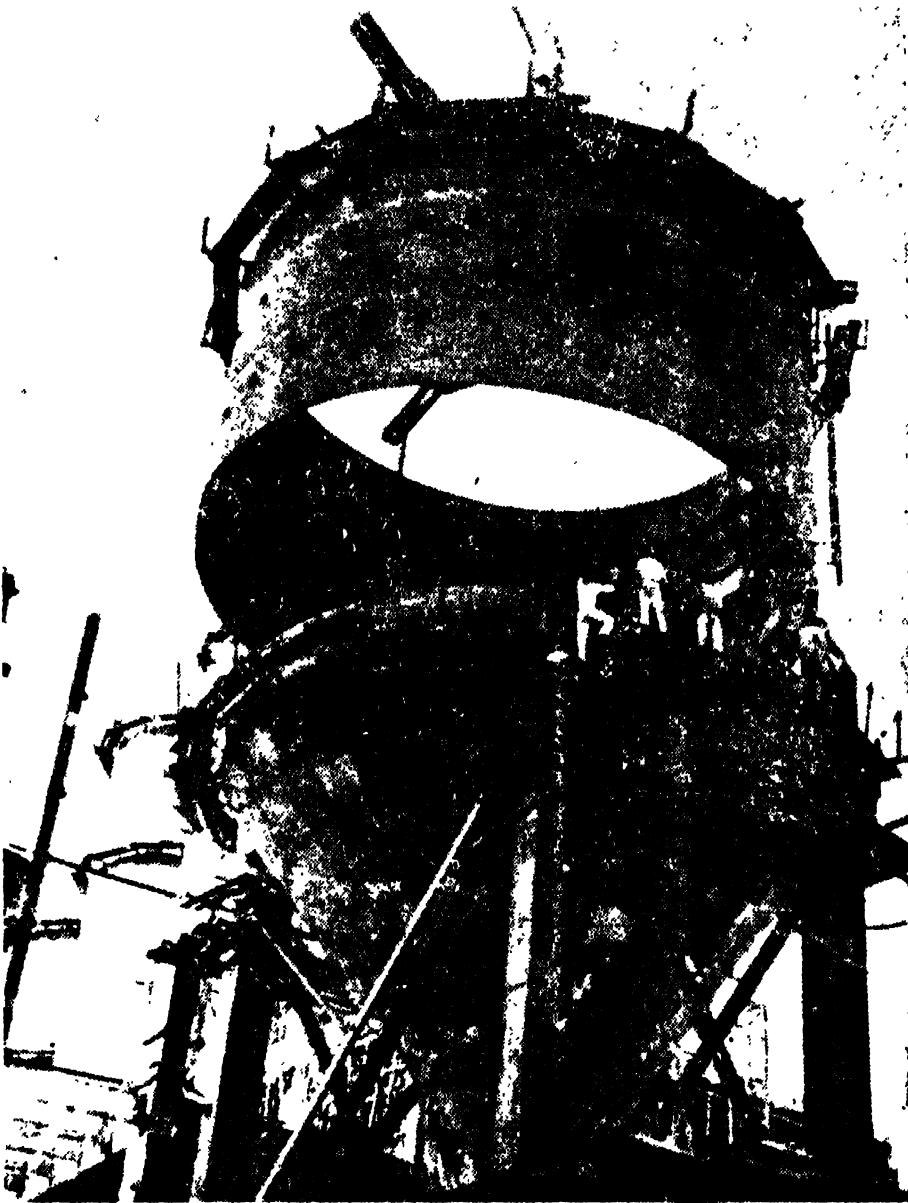
ব্লাষ্ট ফার্নেসের একটি অংশে কাজ চলেছে

(গ) সিন্টারিং প্ল্যান্ট

(ঘ) ব্লাষ্ট ফার্নেস ও এ্যানসিলারি ফসিলিটিজ

(ঙ) অক্সিজেন প্ল্যান্ট

(চ) হট রোলিং মিল

(ছ) কোল্ড রোলিং মিল।

খনি সমূহ ও কয়লা শোধনাগার খুবই কাছে হওয়ার জন্য সাতদিনের মত কয়লার যোগান রাখাই যথেষ্ট ধরা হয়েছে। বড় মাপের ও সূক্ষ্ম আকরিক লোহা প্রথমে খোলা জায়গায় জমা রাখা হবে। তারপর এখান থেকে সূক্ষ্ম অংশকে সিন্টারিং প্ল্যান্ট এ এবং বড় আকারের গুলিকে ব্লাষ্ট ফার্নেসে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথম পর্য্যায়ে কোন আকর মিশ্রন প্ল্যান্ট বানান হবে না এবং ৩০ দিনের মত বড় ও সূক্ষ্ম আকরিক লোহা জমা রাখা হবে। সিন্টারিং প্ল্যান্ট এর জন্য ৩০ দিনের মত এবং লাইম এণ্ড ডলোমাইট শপ এর জন্য ৪৫ দিনের মত চুণাপাথর জমা করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া ৪৫ দিনের মত ডলোমাইট ও আড়াই দিনের মত কোক্ জমা রাখবারও ব্যবস্থা হয়েছে।

কোন ইস্পাৎ কারখানার কোক ওভেন কমপ্লেক্সকেই একটা পুরোপুরি শিল্প হিসেবে ধরা যেতে পারে। এখানে শুধু কোক্ই উৎপন্ন হয় না, কোক তৈরী করতে গিয়ে অনেকগুলি খুবই প্রয়োজনীয় রাসায়নিক কাঁচামাল পাওয়া যায়। বোকারোর কোক্ ওভেন অংশে থাকবে।

১। কোক্ হ্যাণ্ডলিং প্ল্যান্ট

২। কোক্ ওভেন ব্যাটারি ও কোক্ বাছাই করার সুবিধা

৩। আলকাতরা পাতনের ব্যবস্থা সহ বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্ট।

প্রথম পর্য্যায়ে কোক্ ওভেন অংশে থাকছে চারটি ব্যাটারি। প্রত্যেক ব্যাটারিতে থাকবে ৬৯টা চুল্লি। এই চুল্লিগুলি থেকে বছরে প্রায় ২ মিলিয়ন টনের মত ব্লাষ্ট ফার্নেসে ব্যবহার করার মত উপযোগী কোক্ পাওয়া যাবে। এই প্ল্যান্ট থেকে যাতে বিভিন্ন বাই প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা থাকবে। এখান থেকে বছরে ১৬,১০০০ টন এ্যামোনিয়া, ৬০০০ টন গ্রেডেড ন্যাপথলিন, ২৬০০ টন কাঁচা এ্যানথ্রাসিন, ১০০০০ টন ক্রিওজোট অয়েল ও ১১,২০০ টন কাঁচা আলকাতরা পাওয়া যাবে।
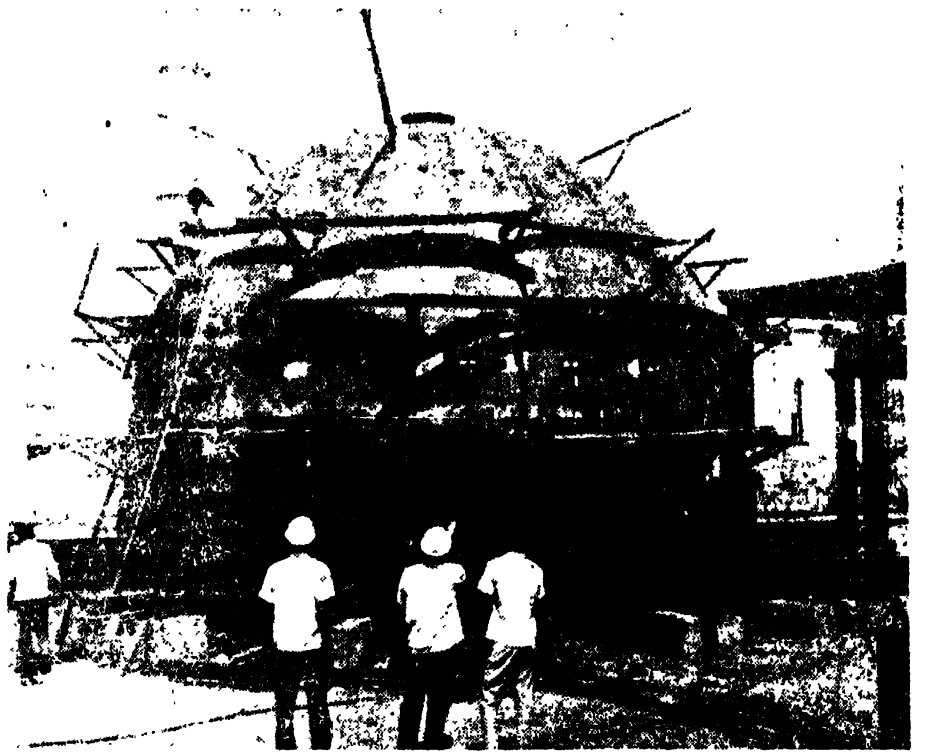
বোকারো ষ্টীল প্ল্যান্টের আর একটি অংশে কাজ চলেছে

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এই রকম আরও তিনটি ব্যাটারি হবে এবং এখান থেকে বেনজিন, টলুইন ও জাইলিন পাবার ব্যবস্থা থাকবে।

বোকারোর মত ইস্পাৎ কারখানায় সমস্ত জিনিষই যাতে পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা থাকবে। সিনটারিং বলতে বোঝায় বিভিন্ন পদার্থের একত্রিকরণ। বোকারোর সিন্টারিং প্ল্যান্টে, এই ইস্পাৎ কারখানারই নষ্ট জিনিষগুলি যেমন সূক্ষ্ম আকরিক লোহা, কোলডাষ্ট ডলোমাইট ও চুণাপাথরের গুঁড়ো কোক ব্রীজ প্রভৃতি গুঁড়ো করে এগুলিকে মিশিয়ে একরকম ছিদ্র যুক্ত শক্ত পদার্থ তৈরী করা হবে। [illegible] সিন্টার ব্লাষ্ট ফার্নেস [illegible] ব্লাষ্ট ফার্নেস [illegible] [illegible] [illegible] পরিষ্কার করার [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] ৫০ ভাগ এই সিনটার [illegible] সিনটার তৈরীর জন্য দুটি সিনটারিং মেশিন বসান হচ্ছে যাদের ক্ষমতা হবে বছরে ৩৩১,৮৫০ টন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আরও একটি সিনটারিং মেশিন বসান হবে।

ইস্পাৎ শিল্পের কারখানার [illegible] জিনিষ হচ্ছে ব্লাষ্ট ফার্নেস। এই

ব্লাষ্ট ফার্নেসেই বিশেষ উত্তাপে কাঁচা আকরিক লোহা ও অন্যান্য কাঁচা রাসায়নিক পদার্থ মিলে তৈরী হয় গলা লোহা। আর কাঁচামালের মধ্যে যে ময়লা থাকে সেটা স্ল্যাগ হিসেবে আলাদা বেরিয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনটি ফার্নেস বসানো হচ্ছে। প্রত্যেকটি থেকে দৈনিক ২,৬৪০ টন ধাতব লোহা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এরকম আরও দুটো ব্লাষ্ট ফার্নেস বসানো হবে। ভারতবর্ষে এগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্লাষ্ট ফার্নেস।

আকরিক লোহা থেকে ব্লাষ্ট ফার্নেসে ধাতব গলা লোহা তৈরী হলে পর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ষ্টীল মেল্টিং শপ এ ইস্পাত তৈরীর জন্য। বোকারোতে ইস্পাত তৈরী হবে এল. ডি. পদ্ধতিতে। এতে উৎপাদন বেশী হবে কিন্তু খরচ কম হবে। ইস্পাত তৈরীর জন্য প্রথম পর্যায়ে বানানো হচ্ছে চারটি ১০০ টনের কনভার্টার যার থেকে বছরে পাওয়া যাবে ১.৭ মিলিয়ন টন ইন্গট ষ্টীল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বসানো হচ্ছে আরও একটা ১০০ টনের এবং দুটো ২৫০ টনের কনভার্টার। এই ইন্গট ষ্টীলগুলি ১৫.৬ টন থেকে ২৬ টন পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হবে এবং ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রয়োজন হলে ২৮ টন ওজনের পর্যন্ত করা যায়।

ষ্টীল মেল্টিং শপ্ থেকে ষ্টীল ইন্গট নিয়ে যাওয়া হবে হট রোলিং মিল ও কোল্ড রোলিং মিল এ। এই রোলিং মিল এর প্রধান কাজ হল ষ্টীল মেল্টিং শপ্ এ যে ইন্গট তৈরী হবে সেগুলিকে বিভিন্ন রকম চাপ ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রয়োজন মত বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরণের পিন্ড ইস্পাতের তার, পাত, প্রভৃতি তৈরী হবে ও এখান থেকে বাজারে চলে যাবে।

বোকারো ইস্পাত কারখানায় বিভিন্ন প্ল্যান্ট এর জন্য যে ধরণের বাষ্পের প্রয়োজন হবে তার বেশীর ভাগই পাওয়া যাবে 'ওয়েষ্ট হীট বয়লার ও ব্যাক প্রেসার টারবো জেনারেটর থেকে।

ব্লাষ্ট ফার্নেস ও অক্সিজেন প্ল্যান্ট ছাড়া অন্যান্য সব প্ল্যান্টের জন্য যে ভারী বাতাস (compressed air) প্রয়োজন হবে তা আসবে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর সঙ্গে অবস্থিত কম্প্রেসার প্ল্যান্ট থেকে। এই কম্প্রেসার প্ল্যান্ট এ থাকছে ৬টা কম্প্রেসার। এছাড়া ব্লাষ্ট ফার্নেস ও অক্সিজেন প্ল্যান্ট এ বাতাস যোগানোর জন্য থাকছে টার্বো ব্লোয়ার ষ্টেশন। এই টার্বো ব্লোয়ার ষ্টেশনেও থাকছে ৬টা কম্প্রেসার।

চুনাপাথর ও ডলোমাইট শপ্ ছাড়া এই ইস্পাত কারখানার সমস্ত শপেই জ্বালানী হিসাবে গ্যাস ব্যবহার করা হবে। ব্লাষ্ট ফার্নেস আর কোক্ ওভেনের গ্যাস মিক্‌চার হিসেবে অন্যান্য শপ্ এ ব্যবহার করা হবে। আর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ব্লোয়ার ষ্টেশন ও বয়লার জ্বালানোর জন্য সরাসরি ব্লাষ্ট ফার্নেসের গ্যাস অমিশ্রিত ভাবে ব্যবহার করা হবে। অমিশ্রিত কোক্ ওভেন এর গ্যাস ব্যবহার করা হবে সিন্টার প্ল্যান্ট, রিপেয়ার শপ্ ও আরও ছোটখাট কয়েকটা কাজের জন্য।

এই ধরণের বিরাট শিল্প চলার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি একান্তই প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক শক্তি যোগান দেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে বোকারোর নিজস্ব থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন। এছাড়াও বোকারো থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের মাধ্যমে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের পাওয়ার সিস্টেমের যোগাযোগ থাকবে এবং প্রয়োজন মত ডি. ভি. সি সিস্টেমের থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া হবে।

এই কারখানার জলের যোগান আসবে ৪৩ কি. মি. দূরে দামোদর নদের 'তেনু ঘাট ড্যাম রিজারভয়ার' থেকে। কারখানার মধ্যে অবস্থিত কুলিং পণ্ড এর সঙ্গে খালের সাহায্যে তেনু ঘাট রিজারভয়ার—এর যোগাযোগ থাকবে। ৩.২৫ বর্গ কি. মি এলাকা নিয়ে কারখানার এলাকার মধ্যে একটা কুলিং পণ্ড ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে। ২.২৫ বর্গ কি. মি আকারের আরও একটি কুলিং পণ্ড দ্বিতীয় পর্যায়ে তৈরী করা হবে।

এই বিরাট কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করা, কোন যন্ত্রাংশ খারাপ হয়েগেলে সারান বা স্পেয়ার পার্টস তৈরীর জন্য কারখানার ভিতরেই আলাদা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা থাকছে। বর্তমানে এক ষ্ট্রাকচারাল শপ এই কারখানার বিভিন্ন যন্ত্র তৈরীতে সাহায্য করছে এবং কারখানা পুরোপুরি চালু হয়ে যাওয়ার পর এইটাই মেইনটেনান্স ও মডিফিকেশান শপ্—এর কাজ করবে। এতে সময় যেমন বাঁচবে তেমনি অর্থের ও সাশ্রয় হবে।

বোকারো ইস্পাত কারখানার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর কেন্দ্রীয় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (centralised production control)। এই ইউনিটটি একটি কন্ট্রোল রুম থেকে কাজ করবে যেখানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস, জল, অক্সিজেন প্রভৃতি সমস্ত কিছু সবসময় পাওয়া যাবে। নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য কয়েক জায়গায় 'টেলিভিশন' এরও ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া প্রসেস কন্ট্রোলের জন্য থাকবে কমপিউটার।

যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য বোকারো ইস্পাত কারখানায় থাকছে আধুনিক [illegible] ব্যবস্থা। আভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যব[illegible] শতকরা ৪৫ ভাগ হবে 'কনভে[illegible]

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

# ভারতে স্ত্রী শিক্ষা

## এক দশকের পরিবর্তন (১৯৬১-৭১)

এম. এন. শ্রীদেবা আম্মা

উন্নয়নশীল জাতিগুলির পক্ষে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের জন্য যা অত্যন্ত দরকারী তা হল, পরিকল্পনা সূচীর কোন্ কোন্ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, তা নির্দ্ধারণ করা। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়; তাই শিক্ষা হল, একটি অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়। শিক্ষা এমন একটি বিলাসের বিষয় নয় যে, উন্নয়নের পরও এই বিষয়ে মনোনিবেশ করা চলতে পারে, বরং এটি হল সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। কেন না, কোন জাতির উন্নয়ন নির্ভর করে তার জনগণের ওপর, তাদের আশা আকাঙ্খার ওপর এবং উন্নয়ন কর্মে প্রত্যক্ষভাবে তাদের জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছার ওপর।

### ১৮৮২ সাল ও তার পরে ঃ—

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষার জগতে প্রবেশের অধিকার স্ত্রী জাতিকে দেওয়া হত না এবং তাঁদের জীবন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৮৮২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারা দেশে ভর্তি বালিকার সংখ্যা ছিল ১১৯,৬৪৭ জন অর্থাৎ এই সংখ্যা হল স্কুলে ভর্তি হওয়া বালকের সংখ্যার শতকরা ৩৬ ভাগ মাত্র। সে সময়ে বালক বালিকাদের শিক্ষার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান ছিল, তা এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু গত ৯০ বছরে, এ চিত্র অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখন দেখা যাক প্রাক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনত্তোর ভারতে স্ত্রী শিক্ষার তথা সামগ্রিকভাবে জনশিক্ষার প্রসার কি পরিমাণে ঘটেছে। ১৯০১ সালে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫.৩৫ ভাগ লোক সাক্ষর ছিলেন এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতার মাত্রা ছিল শতকরা মাত্র ০.৬৯ ভাগ। ১৯৩১ সাল অবধি জনশিক্ষার প্রসার ঘটেছে অত্যন্ত মন্থরগতিতে, সে বছর সাধারণ সাক্ষরতার মাত্রা ছিল শতকরা ৯.৫০ ভাগ এবং স্ত্রী শিক্ষার মাত্রা ছিল শতকরা মাত্র ২.৯৩ ভাগ। ১৯৩১ সালে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতার ব্যাপারে ব্যবধান ছিল অত্যন্ত বিরাট, প্রায় শতকরা ১২.৬৬ ভাগ। ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই সাক্ষরতার মাত্রা শতকরা ১৬.৬৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু স্ত্রী লোকদের মধ্যে সাক্ষরতা ছিল শতকরা মাত্র ৭.৯৩ ভাগ। ১৯৬১ সালে সাধারণ সাক্ষরতার মাত্রা শতকরা ২৪.০২ ভাগে এসে পৌঁছলেও, স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতা শতকরা ১২.৯৫ ভাগ ছিল। ১৯৭১ সালে সাধারণ সাক্ষরতা বেড়ে শতকরা ২৯.৩৪ ভাগে এসে পৌঁছায়, এর মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৮.৪৪ ভাগ এবং শতকরা ৩৯.৫১ ভাগ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬১ সালের তুলনায় সাক্ষরতা ১৯৭১ সালে নিঃসন্দেহে বেড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর।

সমগ্র দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতা ১৯৬১ সালে শতকরা ১২.৯৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৭১ সালে শতকরা ১৮.৪৪ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হল, এই দশকে স্ত্রী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪২.৩৯ ভাগ; যা বলা যায়, স্ত্রী শিক্ষা বার্ষিক শতকরা ৪.২৩ ভাগ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের বছরগুলির তুলনায় এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ, তবুও আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির শতকরা ৮১ জনই এখনও নিরক্ষর হয়ে রয়েছেন, এবং স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার ব্যবধান এখনও যথেষ্ট, শতকরা ২১.০৭ ভাগ।

### বিভিন্ন রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার

বিভিন্ন রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৭১ সালের আদমসুমারী থেকে যা জানা গেছে, তা হ'ল স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে কেরলই সবচেয়ে এগিয়ে আছে; এখানে শতকরা ৫৩.৯ জন স্ত্রীলোকই সাক্ষর। এর পরই আসে তামিলনাড়ু, এখানে শতকরা ২৬.৪৩ জন স্ত্রীলোকই সাক্ষর। অন্যান্য রাজ্যগুলির স্থান হল এই রকম:

মহারাষ্ট্র, শতকরা [illegible] জন, পাঞ্জাব, শতকরা [illegible] জন; গুজরাট, শতকরা ২৪.৫৬ জন, পশ্চিমবঙ্গ, শতকরা ২২.০৮ জন, মহীশূর, শতকরা ২০.৭৬ জন এবং হিমাচল প্রদেশ, শতকরা ২০.[illegible] জন। বাকী রাজ্যগুলোতে শতকরা ২০ জনেরও কম স্ত্রীলোক সাক্ষর। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছে রাজস্থান; এখানে সাক্ষর স্ত্রীলোক মাত্র শতকরা ৪.২৬ জন। নীচের দিক থেকে শুরু করলে এর পরই আসে বিহারের নাম, এখানে শতকরা ৮.৩৯ জন স্ত্রীলোক সাক্ষর; জম্মু এবং কাশ্মীর, শতকরা ৯.১ জন; উত্তর প্রদেশ, শতকরা ১০.১৮ জন, মধ্য প্রদেশ, শতকরা ২০.৮৪ জন; এবং উড়িষ্যায় সাক্ষর স্ত্রীলোক মাত্র শতকরা ১৩.৭৫ জন। এই রাজ্যগুলিতে স্ত্রী লোকদের মধ্যে সাক্ষরতার

মাত্রা সর্বভারতীয় মাত্রার চেয়ে কম, সর্বভারতীয় মাত্রা হল, শতকরা ১৮.৪৪ জন।

১৯৭১ সালের আদম সুমারীতে জানা গেছে যে, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে চণ্ডীগড়েই সাক্ষর স্ত্রী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ; এখানে শতকরা ৫৪.১৩ জন স্ত্রীলোক সাক্ষর। উপরের দিক থেকে ধরলে এর পর আসে দিল্লী ; শতকরা ৪৭.৬৪ জন, গোয়া দমন ও দিউতে শতকরা ৩৪.৪৮ জন এবং পণ্ডীচেরীতে শতকরা ৩২.৪০ জন স্ত্রীলোক সাক্ষর। বাকী কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে স্ত্রী লোকদের মধ্যে সাক্ষরতার মাত্রা শতকরা ৩০ জন বা তারও কম। জানা গেছে, নেফাতেই সাক্ষর স্ত্রী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে কম, মাত্র শতকরা ৩.৫৪ জন। আর এর ওপরে হল দাদরা এবং নাগর হাভেলী, যেখানে স্ত্রী লোকদের মধ্যে সাক্ষরতার মাত্রা শতকরা ৭ ৭ জন।

স্ত্রী লোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটার মূল কারণ হল, জনগণের মধ্যে দারিদ্র আর গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে বাড়ীর মেয়েদের স্কুলে না পাঠানোর দারুণ এক কু-সংস্কার। তাছাড়া আর একটি কথা হল এই যে, এদেশে স্কুল বন্ধ থাকার সময়টা চাষে বীজ বপন বা ফসল কাটার সময়ের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে না। ফলে, স্কুলে পড়া চলার মাঝামাঝি অবস্থায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়, ঘরে মায়ের কাজ করে দেওয়া বা চাষবাসের কাজে সাহায্য করার জন্য।

তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সময়টা ঠিক চাষীর ঘরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অনুকূল নয়। যে সব জায়গার স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক আছেন, অর্থাৎ গুরুমশায়ের পাঠশালার শিক্ষা অত্যন্ত নিষ্প্রাণ ও নিরানন্দময়। সোজা কথায় সে শিক্ষা কোন কাজে লাগে না। আবার অনেক জায়গায় ছেলেমেয়েদের অন্য গ্রামের স্কুলে পড়তে যেতে হয়, কিন্তু বাবা মায়েরা তাদের মেয়েকে অন্য গ্রামে পড়তে পাঠাতে একেবারেই নারাজ।

## বিভিন্ন রাজ্যের অগ্রগতি

সমীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে যে, ১৯৬১-৭১ সাল, এই দশ বছরে কেরলেই স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে সর্বাধিক পরিমাণে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এবং উড়িষ্যা এই রাজ্য তিনটি ১৯৬১ সালের মতই এ ব্যাপারে যথাক্রমে তাদের চতুর্থ, দ্বাদশ এবং এয়োদশ স্থান দখল করে আছে। এই দশকে মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুতে উল্লেখযোগ্য ভাবে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ১৯৬১ সালে মহারাষ্ট্রের স্থান ছিল ষষ্ঠ, ১৯৭১ সালে মহারাষ্ট্রের স্থান হয়েছে তৃতীয়। তামিলনাড়ু ১৯৬১ সালে তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিল, ১৯৭১ সালে এই রাজ্যটি দ্বিতীয় স্থানে উন্নত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ১৯৬১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশ যথাক্রমে এ ব্যাপারে অষ্টাদশ এবং একাদশ স্থানের অধিকারী ছিল। ১৯৭১ সালে এই প্রদেশ দুটি যথাক্রমে ষোড়শ এবং অষ্টম স্থানে উন্নীত হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের এই যে প্রবণতা, তা নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক হলেও বিহার এবং রাজস্থানের মত পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি লক্ষিত হয়নি। বরং এই রাজ্য দুটি তাদের ১৯৬১ সালের স্থান থেকে আরও পিছিয়ে পড়েছে। বিহার এবং রাজস্থান তাদের ১৯৬১ সালের যথাক্রমে পঞ্চদশ এবং সপ্তদশতম স্থান থেকে ১৯৭১ সালে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশতম স্থানে নেমে এসেছে।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে দিল্লী যা ১৯৬১ সালে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল, ১৯৭১ সালে গণনায় সে তার স্থানটি হারিয়েছে চণ্ডীগড়ের কাছে। পণ্ডিচেরী মণিপুর এবং মেঘালয়েও (মেঘালয় বর্তমানে একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছে) এ ব্যাপারে অবনতি ঘটেছে। লাক্ষাদ্বীপ এবং ত্রিপুরাতে অবশ্য স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে. প্রথমোক্ত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলটি দুটি স্থান এবং শেষোক্ত রাজ্যটি একটি স্থান এগিয়ে গেছে।

## স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের হার

পরের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে ১৯৬১-৭১ এই দশকে, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার কতখানি ঘটেছে তা দেখান হল।

তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, শতকরা হিসাবে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে বেশী ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে, ১১২.৬২ শতাংশ হারে এবং তার পরই আসে হিমাচল প্রদেশের নাম, ১১১.১৫ শতাংশ হারে। এই প্রবণতা থেকে যে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল, এই রাজ্য দুটি স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে অত্যন্ত অনুন্নত রাজ্য রাজস্থান, সেখানে সাক্ষর স্ত্রী লোকের সংখ্যা মোট স্ত্রীলোক সংখ্যার শতকরা মাত্র ৮.২৬। এখানে ১৯৭১ সালে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের হার লক্ষিত হয়েছে মাত্র শতকরা ৪১.৪৮ ভাগ। এর পরেই আসে বিহারের নাম এখানে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে শতকরা ২৩.০৪ ভাগ। এটি মোটেই একটি শুভ লক্ষণ নয়। অন্ধ্রপ্রদেশ ও আসামেও স্ত্রী শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হয়নি, এ দুটি রাজ্যে যথাক্রমে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের হার শতকরা

চতুর্থ কভারে দেখু

| রাজ্য কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল | মোট স্ত্রীলোক সংখ্যার তুলনায় সাক্ষর স্ত্রীলোক সংখ্যার শতকরা (০—৪ বৎসর বয়স্ক বালিকাগণও অন্তর্ভুক্ত) | | ১৯৬১ সালের তুলনায় উন্নয়ন |
|---|---|---|---|
| | ১৯৬১ | ১৯৭১ | |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ১২.০৩ | ১৫.৬৫ | ৩০.০৯ |
| আসাম | ১৫.৬৭ | ১৮.৯১ | ২০.৬৮ |
| বিহার | ৬.৯০ | ৮.৪৯ | ২৩.০৪ |
| গুজরাট | ১৯.১০ | ২৪.৫৬ | ২৮.৫৯ |
| হরিয়ানা | ৯.২১ | ১৪.৬৮ | ৫৯.৩৯ |
| হিমাচল প্রদেশ | ৯.৪৯ | ২০.০৪ | ১১১.১৭ |
| জম্মু ও কাশ্মীর | ৪.২৬ | ৯.১০ | ১১৩.৬২ |
| কেরল | ৩৮.৯০ | ৫৩.৯০ | ৩৮.৫৬ |
| মধ্যপ্রদেশ | ৬.৭৩ | ১০.৮৪ | ৬১.০৭ |
| মহারাষ্ট্র | ১৬.৭৬ | ২৫.৯৭ | ৫৪.৯৫ |
| মহীশূর | ১৪.১৯ | ২০.৭৬ | ৪৬.৩০ |
| নাগাল্যাণ্ড | ১১.৩৪ | ১৯.২১ | ৬৯.৪০ |
| উড়িষ্যা | ৮.৬৫ | ১৩.৭৫ | ৫৮.৯৬ |
| পাঞ্জাব | ১৭.৪১ | ২৫.৭৫ | ৪৭.৯০ |
| রাজস্থান | ৫.৮৪ | ৮.২৬ | ৪১.৪৪ |
| তামিলনাড়ু | ১৮ ১৭ | ২৬.৮৩ | ৪৭.৬৬ |
| উত্তর প্রদেশ | ৭.০২ | ১০.১৮ | ৪৫.০১ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ১৬.৯৮ | ২২.০৮ | ৩০.০৪ |
| | **কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল** | | |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ১৯.৩৭ | ৩০.৯৬ | ৫৯.৮৩ |
| চণ্ডীগড় | ৪২.০০ | ৫৪.১৩ | ২৮.৮৮ |
| দাদরা ও নগর হাভেলী | ৪.০৫ | ৭.৭৭ | ৯১.৮৫ |
| দিল্লী | ৪২.৫৫ | ৪৭.৬৪ | ১১.৯৬ |
| গোয়া, দমন ও দিউ | ২৩.০২ | ৩৪.৪৮ | ৪৯.৭৮ |
| লাক্ষাদ্বীপ | ১০ ৯৮ | ৩০.৩৬ | ১৭৬.৫০ |
| মণিপুর* | ১৫.৯৩ | ১৯.২২ | ২০.৬৫ |
| মেঘালয়* | ২০.৪৫ | ২৩.৭০ | ১৫.৮৯ |
| নেফা | ১.৪২ | ৩.৫৪ | ১৪৯.৩০ |
| পণ্ডিচেরী | ২৪.৬৪ | ৩২.০৪ | ৩০ ০৩ |
| ত্রিপুরা* | ১০.১৯ | ২০.৫৫ | ১০১.৬৭ |
| সর্বভারতীয় গড় | ১২.৯৫ | ১৮.৪৪ | ৪২.৩৯ |

*চিহ্নিত অঞ্চলগুলি বর্তমানে পূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়েছে

# কয়দিন

মহাদেব
পাকড়াশী
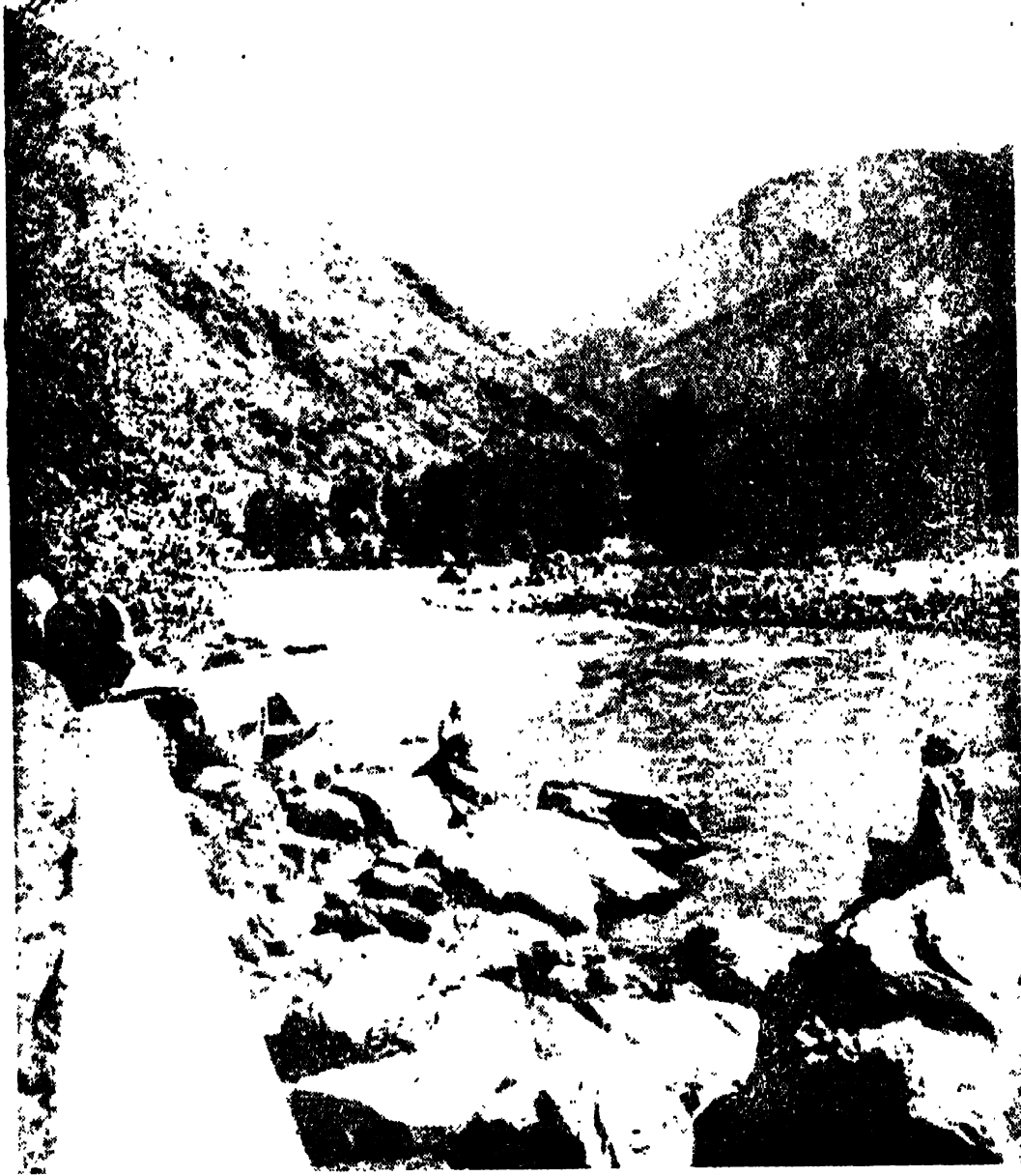
কুলুর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে বিয়াস নদী

"আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত..."

সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। গাড়ী ভর্তি উৎসুক যাত্রী। তারা বিস্মিত, মুগ্ধ এবং কিছুটা এস্তও বুঝিবা। গভীর খাদ একদিকে অন্যদিকে খাড়াই পাহাড় আর পাহাড়ের গা-ও সে রকম সন্নিবদ্ধ নয়। যে কোন সময় আলগা মাটি পাথরের ধ্বস নামতে পারে—নামেও যখন তখন। এ জন্য রাস্তার দু' পাশেই পাহাড়ী কুলিদের বস্তি। তারাই দিন-মজুরী করে ধ্বস সরায়, রাস্তা চলাচলের উপযোগী রাখে। রাস্তার অন্য পাশে গভীর খাদ। মধ্যে দিয়ে তীব্র বেগে পাথরের গায়ে শত সহস্র তরঙ্গ হেনে ফেনা উড়িয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী 'বিয়াশ'—আমরা তাকে জানি বিপাশা নামে। আরও চোখে পড়ছে, পাহাড় থেকে মৃদু মন্দ কলতান তুলে ক্ষীণ কটি নৃত্য রত্য ঝর্ণা ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর বুকে। দূরে পাহাড়ের চূড়া চুম্বনরত মেঘ। একটু

—মেঘ সরে গেল। জেগে উঠল ধবল কিরিট শোভায় গিরি চূড়া। আলোয় কখনও সোনা ছড়ানো রূপ ... বা পটভূমির ঝকঝকে আয়নায় ... প্রতিফলন। সৌন্দর্যপ্রিয় শিল্পী ...পলব্ধি করছে—সুন্দর তুমি চির মুগ্ধ ...

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ দিল্লীবাসী ...দের একটি পরিচিত নাম। প্রতি ... গ্রীষ্মের প্রথমাবস্থায় এঁরা দেশ ভ্রমণের ...জন করে আসছেন। এবার স্থির ... প্রায় সপ্তাহ ব্যাপী হিমাচল প্রদেশ ...। স্থান নির্বাচিত হল কুলু ও ...লী। পাহাড় পর্বতে ঘেরা, পাইন, দেবদারু ভরা পর্বতের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি ...তে এবং আপেল, নাসপাতি ও খোবানির ...নের শোভা দেখতে পাব—এ আশায় ...মন না চঞ্চল হয়। অতঃপর দিনক্ষণ ... এবং যাত্রার আশায় দিন গোনা।

অবশেষে প্রতিক্ষার অবসান। এপ্রিলের এক বিকেলে নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলাম তিন বন্ধু। মালপত্র গাড়ীর ছাতে তুলে তবে নিশ্চিন্তি। সবাই উঠে পড়েছেন বাসে—বাস ছাড়ি ছাড়ি করছে। সবাই কোরাস ধরলেন—"আমাদের যাত্রা হোল শুরু ওগো কর্ণধার"। কর্ণধার পঞ্চনদীর তীরের দেশের অধিবাসী আমাদের কলরবের শরিক হয়ে 'সৎশ্রী আকাল' বলে মাসিভিনু গাড়ীর পাল তুলে দিলেন।

সোঁ সোঁ করে বাস এগিয়ে চলেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে। সারাদিনের উদ্বেগ আনন্দের ক্লান্তিতে সবাই একটু তন্দ্রাবোধ করছেন। কিন্তু কমলি ছাড়লে তো। লম্বা জুলফি, বাবরি চুল, হরে রাম হরে কৃষ্ণ মার্কা জামা ও চোংগা প্যান্টের দল ঐ সময়টাকেই তাদের কীর্ত্তনের উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছেন এবং নাম সংকীর্ত্তনে বদ্ধপরিকর। চললো গান সপ্তম তানে—সে কি "গান" না গান বাজী একমাত্র নিপীড়িত শ্রোতারাই তা মালুম করবেন। ঠাট্টা, হাসির হররা—কোথায় পালাল ঘুম। আবার সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। 'কর্ণধার' সর্দারজীও ব্যাপার স্যাপার দেখে আমাদের ঠাট্টায় যোগ দেন।

হৈ হট্টগোল থামতে থামতে রাত্রি দেড়টার সময় চণ্ডিগড়ে পৌঁছে গেলাম। বাস জার্নির ক্লান্তির পর সবাই যে যার মত একটু শোবার আয়োজন করছি। শুয়েছিও বা। এঁ্যাও। গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে যায় কারা? মধ্য রাত্রে পঞ্চম বাহিনীর অজানিত আক্রমণ! জ্বালাও আলো, বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদ। ডজন ডজন রক্ত পিপাসু ক্যাপিটালিষ্ট ছারপোকা! ওঠ্ ওঠ্, খাট ঝাড়, খাট ঝাড়, মার মার রব। সে রাত্রে আর কারোর ঘুম এলো না।

ভোর হতে আমরা সামান্য প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম চণ্ডিগড় শহর দেখতে। লোহা আর কংক্রীটে তৈরী সুন্দর সুন্দর ইমারত। সাজান গোছান বাড়ী, চওড়া পরিষ্কার রাস্তাঘাট এবং কংক্রীটে তৈরী ধূসর গুরুদোয়ারা....সবই ধূসর। প্রাণহীন পাষাণপুরী বলেই সবার ধারণা হবে। "ইটের ইট তাহার মাঝে মানুষ কীট।" শহরে কর্পোরেশনের ট্যাক্স নেই। বর্তমানে শ্বেতহস্তীর খরচ বইছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রদেশ যুক্তভাবে। আর এক মজার জিনিষ দেখলাম। একই শহরে রাস্তার এধারে পাঞ্জাব সরকারের রাজভবন অন্য পারে হরিয়ানার। শহরে অবশ্য আকর্ষণীয় বস্তু আরও ছিল, তবে সময়ের অভাবে সব দেখা হয়ে উঠলো না।

—সারা গাছ ভরে আছে

আমি আর আমার চাষের ফসল

বেলা বাড়ার আগেভাগে এবার আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম বিলাসপুর অভিমুখে। বিলাসপুরে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফিট উঁচু বিলাসপুর, পাহাড় ঘেরা কুলু উপত্যকায় প্রবেশ পথ বলা চলতে পারে। এখান থেকেই পাহাড় চড়ার আসল আনন্দ। গাড়ী চলছে ধীরে ধীরে—এঁকে বেঁকে। পাশে পড়ছে কখনও খাড়াই পাহাড় কখনও বা গভীর গিরিখাদ। ওঠা নামার ছুটোছুটি খেলায় কখন এক সময় সূর্য পড়ে এল। অস্তগামী সূর্য আকাশের গায়ে আবীর মাখিয়ে, মেঘের

কপোল রাঙিয়ে, পাহাড়ের নগ্ন উত্তুঙ্গ উদ্ধত বক্ষে প্রেমিকের বিদায়ের শেষ সোহাগ চিহ্নটুকু এঁকে দিল।

লজ্জানম্রা কুন্ঠিতা সাক্ষী প্রকৃতি এস্ত পদে এগিয়ে এসে আঁচলের আড়াল দিয়ে শেষ অঙ্কটির যবনিকা টেনে দিলেন। সন্ধ্যার আঁধার এসে ঝপ করে রঙ্গমঞ্চের সব প্রদীপ নিভিয়ে দিল।

আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে আমরা যখন কুলুতে এসে পেঁছলাম তখন রাত আটটা-নটা। বাসের ঝাঁকুনি খেতে খেতে সকলেই অল্প-বিস্তর পরিশ্রান্ত। তাই সবাই একটু কিছু মুখে দিয়েই শুয়ে পড়তে ব্যস্ত। পরের দিন থেকে আবার টানা প্রোগ্রাম।

মধ্য রাত্রে এক সময় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। না, এবার ছারপোকার আক্রমণে নয়। জানালার কাঠের কার্নিসে বৃষ্টির নিবিড় ঐক্যতান। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে কাঁপিয়ে পড়ছে বন্ধ কাঁচের ওপর ঝন ঝন শব্দে। বৃষ্টি বৃষ্টি। জানালার কাঁচে মাথা রেখে উদাসী হাওয়ায় ঝড়ের রাতে প্রকৃতির অভিসার দেখার চেষ্টা করেছি ব্যর্থ হয়ে কখন যে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেও পারিনি।

পরের দিন সকালেও বৃষ্টির বিরাম নেই। বর্ষায়াত দূর পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেও দেখার অনুমতি নেই। সমস্ত শূণ্য জায়গা মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। ভেসে আসছে পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণার কলতান; গম গম করে চারিধার কাঁপিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী বিপাশার রুদ্রমূর্ত্তি। গত রাত্রের বৃষ্টির দরুন তার তেজ আজ দেখে কে! যৌবনমদমত্তা নদী অদৃশ্য প্রেমিকের হাতছানি পেয়ে বলগা হারা ছুটে চলেছে।

ইতিমধ্যে সব ঘর থেকে যে রকম সাজ

কলুতে 'দশেরা' উৎসব

সাজ রব আশাকরা গিয়েছিল, তার আর বিশেষ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোধকরি ঘুম থেকে উঠে ভ্রমণ বিলাসীদের মনের অজান্তে প্রকৃতির স্নানকেলী দেখবার একটা দুষ্ট বুদ্ধি চেপেছিল। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রসিক প্রবরগণ তাই চুপে চুপে উপভোগ করে চলেছেন।

কবিরা পাহাড়ী বৃষ্টিকে তুলনা করেছেন নারী মনের সঙ্গে। এই বৃষ্টি এই রোদ, এই হাসি এই কান্না, এই রাগ এই অনুরাগ। ক্ষণে ক্ষণে কতই না পরি[illegible] আকাশে সূর্যের হাসির এক ঝলক [illegible] আমাদের আলস্য দূর। আমরা বে[illegible] পড়লাম। গতকালের বৃষ্টির জন্য হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। বরফের [illegible] পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে পাহা[illegible] প্রায় মাঝামাঝি। হিমেল হাওয়া তার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাল দিয়ে চ[illegible] গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি; কুছ পরোয়া নেই [illegible] লজের ঘোরানো পিচঢালা পথ বেয়ে [illegible]

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

১২ পৃষ্ঠার পর

## বোকারো ষ্টীল প্ল্যান্ট

সিস্টেম' এ। ৫১ ভাগ রেলে এবং ৪ ভাগ সড়ক্ এ।

বোকারো ইস্পাত কারখানাকে ভারতের সত্যিকারের প্রথম "স্বদেশী ষ্টীল" প্ল্যান্ট বলা যায়। কেননা—ডিজাইনিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভারতীয় সংস্থা সমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ ছাড়াও বিল্ডিং ষ্ট্রাকচারের ৯০% ভাগ, টেক্নোলজিকাল ষ্ট্রাকচারের ১00% ভাগ, মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট এর ৬৫% ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্ট এর ৪৮% ইনষ্ট্রুমেন্ট এর ৮0% ও রিফ্র্যাকটরির ৭৭% আমাদের দেশেই তৈরী। বিদেশী মুদ্রা বাঁচানো ছাড়াও এই ইস্পাত কারখানা আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং ও রিফ্র্যাকটরি শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করছে।

এই ইস্পাত কারখানাতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং হবে। প্রথম পর্য্যায়ে আনুমানিক লোকের দরকার হবে ১৩,১00 ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ১৯,২৪0। এর মধ্যে সুপারভাইজার ও টেকনিকাল ষ্টাফ হবে ১২% (প্রথম পর্য্যায়ে ১৫% ও সাধারন কর্মী ৮৩% (৭৯% শতাংশ প্রথম পর্য্যায়ে)।

এই বিরাট কারখানা তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থার কর্মচারীদের থাকবার জন্য এক বিরাট নগরীও গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এর নাম হচ্ছে বোকারো ইস্পাৎ নগরী। এই নগরীতে ১৬,৫00 এর মত বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ থাকছে। এবং অন্যান্য সব নাগরিক সুবিধা যেমন স্কুল, হেলথসেন্টার, হাসপাতাল, বাজার, ক্লাব, পার্ক, অবসর বিনোদন কেন্দ্র, দোকান, সিনেমা প্রভৃতি থাকছে। এই কারখানার কর্মচারীদের কোঅপারেটিভ হাউসিং কলোনী ও তৈরী হচ্ছে এই সঙ্গে।

ভারতের সর্ববৃহৎ ইস্পাত শিল্প বোকারো ইস্পাত কারখানা শুধু যে দেশের ইস্পাতের চাহিদা মেটাবে ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন সরকারি ও আধাসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাগুলিকে, ইস্পাত শিল্প তৈরীর কাজে দক্ষতা অর্জনে খুবই সাহায্য করছে।

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্য্যায়ের কাজ ১৯৭৩ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। তবে দেশের আপত্কালীন অবস্থা ও অন্যান্য নানা কারণে অনেক সময়ই কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম ব্লাষ্ট ফার্নেসটি চালু হয়ে যাবে।

বোকারো ইস্পাত কারখানা ভারতবর্ষের নতুন কর্মযজ্ঞেই যে সাহায্য করবে তাই নয় এই ইস্পাত কারখানা আন্তর্জাতিক ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

## কুলুতে ছুটির ক'দিন

১৮ পৃষ্ঠার পর

বাজারের পথ দিয়ে এগিয়ে চললাম।

সমুদ্র তল থেকে প্রায় ৭000 ফিট উঁচু এই কুলু উপত্যকা। চারদিকে উঁচু উঁচু পাইন, সেগুন গাছের ছায়ায় ঘেরা হিমাচলের রানী কুলু। কুলুর পাহাড়ী ঝর্ণার কুলু কুলু গান, আপেল, নাসপাতি, আখরোট, বাদামের বাগান, তার অনাড়ম্বর অধিবাসীদের জীবন, তাদের মাথার রঙীন টুপি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা সবাই যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে আছে।

হিমাচলের রাজস্ব আয়ের বড একটা অংশ আসে তার বনজ সম্পদ থেকে। বনজ সম্পদের পরই স্থান করে নিয়েছে এখানকার ফল। এখানকার ফল এখন নিয়মিত বিদেশেও পাঠানো হচ্ছে। গম চাষ হলে—বেঁটে জাতের গমের ফলন ও আয় প্রচুর; তাই এদেশীরাও সহজেই এ ধরণের গম চাষে মেতেছে। যব চাষ বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। অন্যান্য খাদ্যশস্য আসে বাইরে থেকে। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে চত্বর কেটে কেটে চাষ, তাই উর্বরতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। খাবার দাবার তাই বেশ আক্রা। এখানকার বাড়ী ঘর অন্যান্য শৈলনিবাসের মতই—পার্থক্য শুধু বাড়ীর ছাদ কাঠের না হয়ে স্লেট পাথরের। বোধকরি মজবুত, হাল্কা ও সহজলভ্য বলেই এর চলন এদেশে এত বেশী।

আমরা পথ চলেছি আনন্দে। খেয়াল হয়নি যে মেঘে মেঘে বেলা বেশ কেটেছে। ফেরা দরকার। পেটের ভেতরেও নানা রকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ফেরে মন আপন ঘরে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আস্তানায় ফিরে এলাম এবারের মত। পৌঁছে শুনি এক বিপদ বেঁধেছে। গত রাত্রে বাস দাঁড় করানো ছিল বাইরের উঠোনে—মাটিতে। সকালে বাস আর মাটির প্রেমের বন্ধন ছেড়ে উঠতে পাচ্ছে না। কেলেংকারি কাণ্ড। বহু ধস্তাধস্তির পর বাস যখন উঠলো তখন ক্রাউন হুইল ভেঙ্গে গেছে। অতএব সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও শুশ্রূষা দরকার। ব্যাপারটি আন্দাজ করে আমাদের করিৎকর্মা ম্যানেজার দাদা ততক্ষণে একটি টেম্পো বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মানালী যাবার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন। গুরু গুরু বলে ম্যানেজারকে নিয়ে কিছুক্ষণ প্রলয় নাচন। আবার বাঁধাছাঁদা শেষ করে গাড়ীর মাথায় চাপিয়ে মানালী যাবার জন্য সবাই তৈরী হয়ে বসেছে। আকাশে পড়ন্ত সূর্যের রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি। আঁকা বাঁকা শীর্ণ পাহাড়ী পথ বেয়ে বাস এগিয়ে চলল শৈল শহর মানালীর দিকে।

দ্বিতীয় কভারের পর

# প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ

করার জন্য এবং দেশ থেকে বেকারী দূর করার জন্য পরামর্শ দেবার অনুরোধ জানালেন, তিনি সাগ্রহে সেই অনুরোধে সাড়া দিলেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কার্যাকারী পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের কথা এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দেশ করার ও দেশের নিজস্ব সম্পদকে যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার অনুরোধ জানালেন তিনি। আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের বড় বড় কোন তত্ত্বই তিনি জানতেন না; তবুও ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি ভাবে এবং কোন পথে চলেছে তা ব্যাখ্যা করে তিনি একটি মডেল তৈরী করতে সক্ষম হন—মডেলটির নাম মহলানবীশ টু সেক্টার মডেল। পরে এটির কিছু সংশোধন করে মহলানবীশ ফোর সেক্টার মডেল তৈরী করা হয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় ঐ জিনিষটি খুব কার্য্যকারী হয়েছে। ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক পরিকল্পনা কমিশনে একজন পূর্ণ সদস্য হিসাবে যোগ দেন।

সংখ্যা বিজ্ঞানে অধ্যাপক মহলানবীশের অবদান শুধু অতুলনীয়ই নয়, তা বহুমুখীও। 'মহলনাবীশ ডিসট্যান্স'—যা প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করার ব্যাপারে একটি অপরিহার্য্য অস্ত্র, 'মহলনাবীশ দুই'চার সেক্টার মডেল'—যা পরিকল্পনায় সম্পদ বিনিয়োগ ও তা বিভিন্ন খাতে উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ, তাঁর ইনটার পেনিট্রেটিং নেট ওয়ার্ক অফ স্যামপলস্—সমীক্ষা ভিত্তিক নমুনা তালিকায় নির্ভুলতা দেখিয়ে দেয় এবং তাঁর ফ্র্যাক্টাইল গ্রাফিক্যাল এ্যানালিসিস—যা অর্থনীতি সংক্রান্ত তালিকাগুলির বিশ্লেষণ করে তা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোয় সাহায্য করে—এগুলি হ'ল সংখ্যাবিজ্ঞানে তাঁর কীর্ত্তির কতকগুলি মাত্র।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি 'সংখ্যা বিজ্ঞান কেন?' এর উত্তরে আজকের পৃথিবীতে সংখ্যাবিজ্ঞানের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করে ছিলেন। ভারতে জাতি ও উপজাতির জন্ম কি ভাবে হ'ল, সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা থেকে আরম্ভ করে যে কোন বাঁধের উচ্চতা নির্ণয়, ধান উৎপাদনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য কি পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করা দরকার, দেশের পক্ষে বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার লাভ করতে হলে বিনিয়োগ নীতি কি রকম হওয়া দরকার, আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাস ঘোষণা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তিনি সংখ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে বার করার পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন।

সংখ্যা বিজ্ঞান ও পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে তাঁর মৌলিক অবদানের জন্য তিনি দেশে বিদেশে অজস্র সম্মান পেয়েছেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন। ১৯৫৪ সালে রয়্যাল ষ্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি এবং ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটির কিংস কলেজ ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ফেলোর সম্মানে ভূষিত করেন। আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাটিসক্যাল ইনসটিউটের সভাপতির পদ তাঁকে দেওয়া হয় ১৯৫৭ সালে। ইউ. এস. এস. আর. এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এর একজন বিদেশী সদস্য হওয়ার সম্মান লাভ করেন ১৯৫৮ সালে, ১৯৬১ সালে আমেরিক্যান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ফেলোসিপ অর্পন করেন। ১৯৪৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬৩ সালে চেকোস্লোভাক এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁকে স্বর্ণপদক দানে সম্মানিত করেন। তা ছাড়া ১৯৬৩ সালে তিনি ওয়ার্লড এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এ্যাণ্ড আর্টস এর ফেলো হন। সোফিয়া এবং ষ্টক হোলম বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ভূষিত করেছেন।

ভারতে ১৯৫০ সালে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। দিল্লী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক ডক্টরেট উপাধী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধীতে ভূষিত করেন। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করেন।

ভারতের যে কোন বিজ্ঞানীর চেয়ে সম্ভবত তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের জন্য বেশী কাজ করেছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিদেশ সচিব হিসাবে তিনি সারা পৃথিবীর খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভায় যোগদান করাতে এবং ভারতের গবেষণাগারগুলিতে স্বল্পকালীন সফর করাতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। তাঁর অনুরোধে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটুটে যে সব বিদেশী বিজ্ঞানী কাজ করতে এসে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন, নোরবার্ট ওয়েনার, জে. বি. এস. হলডেন, স্যার রোনাল্ড ফিশার, শিক্ষাবিদ এ. এন. কোলমোগোরভ, ডব্লিউ. ডি. লীনিক, অসকার ল্যাং এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী র‍্যাগনার ফ্রিশ।

সংখ্যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরেও বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি নিজেকে যুক্ত করে ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘকালের—সংখ্যা বিজ্ঞানের

REGD. NO. D-233

কাজ ছাড়াও তিনি বাংলা ও ইংরাজীতে বেশ কিছু সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন।

বলা হয়ে থাকে [illegible] ন সৈন্যদল, না কোন জাতি, তাদের জাতিকে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিতে পারে; যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি বিশেষই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন—যাঁর কীর্তির সুফল সারা বিশ্বের মানুষ ভোগ করতে পেরেছেন' অধ্যাপক মহলানবীশের ক্ষেত্রেও এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মানবজাতির কল্যাণে অবদানের জন্য তিনি বহুযুগ ধরে মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকবেন।

১৫ পৃষ্ঠার পর

## ভারতে স্ত্রী শিক্ষা

৩০.০৯ এবং ২০.৬৮ ভাগ। হরিয়ানা, নাগাল্যাণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যাতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের হার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হয়েছে ঠিকই, তবুও তারা এ দিকে এখনও গুজরাট, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদির অনেক পিছনে পড়ে আছে। কেরলে সাক্ষর স্ত্রী লোকের সংখ্যা বরাবরই সর্বাধিক; সেখানে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের হার মাত্র শতকরা ৩৮.০৬ ভাগ, যা সর্বভারতীয় হারের (শতকরা ৪২.৩৯) চেয়েও কম।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে গত দশকে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে লাক্ষাদ্বীপেই বেশী হয়েছে, শতকরা ১৭৬.৫০ ভাগ। উপরের দিক থেকে ধরলে এর পর আসে নেফা, শতকরা ১৪৯.৩০ ভাগ, ত্রিপুরা শতকরা ১০১.৬৭ ভাগ এবং দাদরা ও নাগর হাভেলীতে শতকরা ৯১.৮৫ ভাগ। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে মন্থর-গতিতে ঘটেছে দিল্লীতে, শতকরা মাত্র ১১.৯৬ ভাগ। নীচের দিক থেকে ধরলে এর পর যেগুলি আসে, যথাক্রমে তা হল, মেঘালয় শতকরা ১৫.৮৯ ভাগ; মণিপুর শতকরা ২০.৬৫ ভাগ, চণ্ডীগড় শতকরা ৩৮.৮৮ ভাগ, পণ্ডীচেরী শতকরা ৩০.০৩ ভাগ, গোয়া দমন দিউ শতকরা ৪১.৬৮ ভাগ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শতকরা ৫৯.৮৩ ভাগ। দিল্লী ১৯৭১ সালে তার ১৯৬১ সালের সর্বোচ্চ স্থানটি শুধু চণ্ডীগড়ের কাছে হারায় নি, পরন্তু এখানে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের হার অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে গ্রাম ভারতে যদিও যথেষ্ট পরিমাণে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত বালক এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত বালিকার মধ্যে সংখ্যাগত ব্যবধান যথেষ্ট পরিমাণে কমেছে, তবুও মেয়েদের স্কুলে না পাঠানোর যে কুসংস্কার তা গ্রাম ভারত থেকে এখনও মুছে যায়নি; জনশিক্ষার বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাপক সরকারী সচেতনতার অভাব আর দেশে নেই। বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ তা কৃষি উৎপাদন বাড়ান, সমাজ উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাই হোক না কেন, তা কার্যকরী ভাবে রূপায়িত করা যাবে না, যতদিন আমাদের জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ নিরক্ষর থাকবে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদের মধ্যে অশিক্ষাই হল, বালিকাদের যথেষ্ট সংখ্যায় স্কুলে ভর্তি হওয়া এবং ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা। তাই ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালানো এবং নানান উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে।

দেশ উন্নয়নের পথে শুধু অর্থ বা অর্থকরী মূলধনের অভাবই একমাত্র বাধা নয়, সুশিক্ষিত জনশক্তির অভাবও এ ব্যাপারে একটি মারাত্মক ধরণের বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। অনুন্নত অর্থনীতিতে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি, তা এ থেকেই বোঝা যায়, কারণ শিক্ষা নিজেই উন্নয়নের সূচনা করে।

## ভারতে তৈরী ট্রানস্‌ফরমার মালাবির পথে

ভূপালের হেভী ইলেকট্রিক্যালস্‌ লি: এ তৈরী ৩টি ট্রানস্‌ফরমার কলকাতা বন্দর থেকে মালাবির পথে রপ্তানি হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় কিস্তিতে ৩টি স্টেশন ইউনিট ট্রানস্‌ফরমার এবং আর্থিং ট্রানস্‌ফরমারও শীঘ্রই পাঠানো হবে। এগুলি বসানো এবং চালু করার জন্যে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ মালাবি যাবেন।

## সলিডস্টেট ফিজিকস্‌ ল্যাবরেটরী

সলিডস্টেট ফিজিকস্‌ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন ধরণের এ্যাক্সিয়াল লেড টিউনার ভ্যারেকটর ডাইয়োড উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি অবশ্য ল্যাবরেটরী স্কেলে করা হয়েছে। এক ইঞ্চি ব্যাসের কতকগুলি সিলিকন স্লাইস তৈরী করা হয়েছে। এই সিলিকন স্লাইসগুলির ক্যাপাসিট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্সের রিপ্রোডাকটিবিলিটি অনুপাত খুব ভাল।

ডাইয়োডগুলি বাঙ্গালোরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চীফ ইনস্পেক্টরেট এ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভীরেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে
কমিশন

# ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

১লা আগষ্ট ১৯৭২ : ১০ই শ্রাবণ ১৮৯৪

Vol Iv : No 4 : August 1 1972


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।




সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা


## যুগবাণী

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্‌দুঃখভাগ্‌ ভবেৎ ॥

সকলে সুখী হোক, সবাই নিরোগ হোক, সকলের কল্যাণ হোক, কেউ দুঃখী না হয়।

## এই সংখ্যায়

# আমাদের কথা

**সম্পাদকীয়**

আজ ১লা আগষ্ট যোজনা পরিবারে আর একটি নতুন সংস্করণ সংযোজিত হোল। এটি হোল যোজনা (মারাঠি)। প্রকাশিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই থেকে। গত ১৫ই জুলাই কেরালার রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম থেকে যোজনা (মালায়ালাম)। প্রকাশিত হতে সুরু করেছে। দুই রাজ্যের রাজধানী দুটিতে যোজনার নতুন অফিস খোলা হয়েছে। যে সব ভাষায় যোজনা প্রকাশিত হচ্ছে সেই এলাকা থেকে যোজনা প্রকাশের নীতি গ্রহণ করার ফলে এই অফিস দুটি খোলা হয়েছে। এর কতকগুলি কারণ রয়েছে। প্রধান প্রধান কারণগুলির একটি হোল সেই এলাকার কৃতী ব্যক্তিদের যোজনার কাজে লাগানো যাতে তাঁরা ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যোজনার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন; তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় সাময়িকী মুদ্রণের কাজের সুবিধা হবে এবং যত দ্রুত পত্রিকাটি প্রকাশ করা যাবে ও সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি যোজনায় স্থান পাবে। সংবিধানে উল্লিখিত সবগুলি ভাষায় যোজনা প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ্য, যাতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোজনার খবর গিয়ে পৌঁছয়। আর তা পরিবেশন করা হবে আঞ্চলিক ভাষায় যাতে তা সকলের বোধগম্য হয়।

সাধারণ মানুষের কাছে যোজনার বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য হোল—দেশে সুপরিকল্পিত উপায়ে যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলেছে সাধারণ মানুষকে সে সম্বন্ধে অবহিত করা এবং সেই সঙ্গে পরিকল্পনা সূচী কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা লাভ করা। প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকেই এই গণসহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনমানসে সঠিক ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে সহযোগিতার অবকাশ কই। তাঁকে জানতে হবে যে, এ পরিকল্পনা তাঁর নিজের জন্যে, তাঁর পরিবারের জন্যে আর—দেশের জন্যে। সেই কারণেই তাঁকে পুংখানুপুংখভাবে এ বিষয় সম্বন্ধে জানতে হবে। এই সময়ে বিশেষ করে এর একটা গুরুত্ব রয়েছে—দেশ আজ এক আমূল সামাজিক পরিবর্তনের সম্মুখীন। এতদিন ধরে যাঁরা দলিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত তাঁদের দিকেই আজ সবচেয়ে বেশী নজর। একথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে, এ যাবৎ সু-উদ্দেশ্যে আমরা যা কিছু করেছি তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। জনসাধারণের অভাব অভিযোগ তাতে ঠিক মেটেনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায় বলা যায়—আমাদের নতুন পথ অনুসরণ কোরতে হবে, সুনির্দিষ্ট সূচী নিয়ে আমাদের দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে, এবং সেটা তখনই সম্ভব হয় যখন জনগণ পরিস্থিতি সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করে সম্মিলিতভাবে এ কাজে এগিয়ে আসবেন এই পরিবর্তনে সাহায্য কোরতে।

জনগণকে অবহিত করার জন্যে নানা প্রকার গণ সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, যাতে মুহূর্তে খবর সংবাদ বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আবার পুস্তক, সাময়িকী, সংবাদ পত্র ইত্যাদি রয়েছে যা মন্থর গতিতে এই সব বার্তা বহন করে। এরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এর ফল বেশ স্থায়ী হয়।

যোজনা এই শ্রেণীভুক্ত এবং বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে, যোজনা নিপুণভাবে এই ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভাষায় যোজনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা, আশা ও নিরাশা, প্রেরণা ও অনীহা জনগণের সামনে তুলে ধরছে এই যোজনা। কয়েক বছরের মধ্যেই অন্যান্য গণসংযোগ মাধ্যমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যোজনাও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কোরবে। জনগণ যাতে তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি যেমন শিশু ও প্রসূতিদের পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, অধিক খাদ্য উৎপাদন পণ্য শস্য, শিল্প সম্পর্ক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে আরও বেশী জ্ঞান লাভ কোরতে পারেন সে উদ্দেশ্যে মূল্যবান তথ্যাদি সরবরাহ করাই হোল সংযোগ মাধ্যমগুলির কর্তব্য। গণ সংযোগ মাধ্যম হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে যোজনা বিগত কয়েক বছর ধরে এই গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এই সামাজিক বিবর্তনে নিজ কর্তব্য সাধনে কৃতসংকল্প।

# পরিকল্পনার সন্ধিক্ষণে

বীরেন্দ্র অগ্রবা

প্রধানমন্ত্রী এমন এক বলিষ্ঠ ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন, যাতে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও তাঁর জীবন ধারণের প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারবে। সেই অনুযায়ী অর্থাৎ জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলি যাতে পূরণ করা সম্ভব হয় পরিকল্পনা মন্ত্রী তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করছেন। তবে এই ব্যবস্থা যদি নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক না হয়, তাহলে 'গরীবি হটাও'—শুধু মাত্র শ্লোগানই থেকে যাবে।

উচ্চ পর্যায়ে ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ হ্রাস করা, জনগণের ব্যাপক চাহিদা অনুযায়ী শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, ভূমিসংস্কারের জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালানো এবং পরিচালন ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন—আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে গেলে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কার্যসূচী প্রণয়ন। অনেক সময় বলা হয়, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ালেই, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এবং পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ দ্বিগুণ করলে, সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে। আরো বলা হয়, মোট জাতীয় উৎপাদন সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাড়ানো আমাদের একমাত্র প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ সামাজিক পরিবর্তন সাধনের বহু দিকের মধ্যে এটি অন্যতম কিন্তু একমাত্র নয়। বছরে ৫০ লক্ষ বেকার ব্যক্তির চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা দানের ভিত্তিতে ৬ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের জন্য, পল্লীঅঞ্চলের ব্যাপক কর্মসংস্থান কার্যসূচীতে ২০০০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার এত কম যে বছরে ৩০ হাজার ব্যক্তির চাকরীর সুযোগ হওয়াও কষ্টকর। কাজেই পরিকল্পনার পুণর্বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে বেকারত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানো সম্ভব হয়।

## গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা

আমাদের মতে, বিকাশমান দেশের পক্ষে পরিকল্পনা একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু দুঃখের কথা, উন্নয়নের সুফল সমাজের দুর্বলতর অংশের কাছে পৌঁছোচ্ছে না। আঞ্চলিক সমতা রক্ষা, পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে ঠিক তা হচ্ছে না। ক্ষেত্র ভিত্তিক পরিকল্পনা এই পরিস্থিতির সুরাহা করতে পারে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা হোল, পরিকল্পনা রচয়িতাগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করবেন, কিন্তু চূড়ান্ত নির্বাচনের ভার থাকবে সংসদের ওপর। পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে পরিকল্পনার নমনীয়তা এবং তার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। ত্রুটিযুক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জনসাধারণের বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের জীবন ধারণের মান খুব একটা উন্নত হয়নি। তবে একেবারেই হয়নি—একথা স্বীকার করা যায় না।

পরিকল্পনার সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে তার বাস্তব অগ্রগতির ওপর। পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া হোল—কতটা উপকার সে পেয়েছে তার থেকেও, কতটা বোঝা তাঁকে বহণ করতে হচ্ছে, তার ওপর। কাজেই জনগণ স্বাভাবিক ভাবেই আশা করতে পারেন যে, সরকারকে শুধু পরিকল্পনা খাতে বেশী বা[য়] করলেই চলবে না, তাকে মূল্যমাণ স্থি[তি-] শীলও রাখতে হবে। গণতন্ত্র এবং গণ[-] তান্ত্রিক পরিকল্পনার ওপর জনগণের আস্থা যদি অক্ষুন্ন রাখতে হয়, তাহলে অন্ততঃ পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে হবে। এবং মূল্যমা[ন] বজায় রাখতে গেলে, অর্থনৈতিক অ[গ্রগতি] দ্রুততর করতে হবে। সম্পদ সংগ্রহে[র] সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হোল, জনগণের [...] থেকে বর্তমানের চেয়ে আরো [...] পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করা। সরকারী [...] পরিচালিত প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ ভাবে [জন-] গণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের [...] পরিচালিত হওয়া উচিত এবং এই [...] থেকে যে অর্থ আসবে, তা পরিক[ল্পনার] জন্যই ব্যয় করা হবে। এই [...] সরকারী সংস্থাগুলিতে, ১৯৭২ [সালের] ৩১শে মার্চ পর্যন্ত, মূলধনী শেয়ার [...] ২৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ [...] হয়েছে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে আরো [...] কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। [...] এই বি[নি]য়োগের বিনিময়ে যা পাচ্ছি, [...] মোটেই আশাপ্রদ নয়। এর [...] সরকারের উচিত, অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় গত তিন বছরের ভুলত্রুটি সংশোধন করে, দেশকে আত্মনির্ভরতা অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ

করা হয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা—দুটি সমার্থক নয়। একটি বিকাশমান অর্থনীতিকে আমদানীর ওপর নির্ভর করতেই হয়, তবে এটা পুষিয়ে নেবার জন্য রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। আমদানীর ওপর আকস্মিকভাবে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, কারণ আমদানীর বিকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কল লাভ কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমদানী বিকল্পের উচ্চ মূল্যের জন্য আমাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যেন ব্যাহত না হয়।

বার্ষিক পরিকল্পনায়, কৃষি ক্ষেত্রে ডাল, খাদ্যোপযোগী তেল, কার্পাস এবং পাটের ওপর উপযুক্ত ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সব পণ্যের মোট উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্যাকেজ কার্য্যসূচী, ছোট ছোট সেচ কার্য্য এবং প্রতিষ্ঠানগত সুযোগ-সুবিধা দরকার। পাটের উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিল্প ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনায় ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, তামা, সার প্রভৃতি প্রকল্পের উন্নয়নের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন তোল বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার। পাট এবং বস্ত্র শিল্পের আধুনিকীকরণ আগেই করা উচিত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ক্ষেত্রে যাতে কাঁচামালের অভাব না দেখা দেয়, সে জন্য প্রাপ্ত সম্পদের ওপর ভিত্তি করে একটি বাজেট তৈরী করা উচিত। মুদ্রাস্ফীতি যাতে দেখা না দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্যয় প্রবণতা বাড়াতে হবে। চলতি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, প্রাপ্ত সহায় সম্পদ যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে, দ্রুতগতিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

## পঞ্চম পরিকল্পনা

পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর করা এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭০ সালের জুন মাসে কর্মপ্রার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার। ১৯৭১ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ লক্ষ ৯৫ হাজার। অবিলম্বে এর মোকাবিলা করা না গেলে, চলতি দশকেই, বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। বর্তমান দশকে অতিরিক্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৬ কোটি হবে বলে ধরা হয়েছে। কাজেই গড়ে প্রতি বছর, ৫০ লক্ষেরও বেশী কাজের সংস্থান রাখা উচিত। ১৯৮৫ সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার, ১৯৮০ সালের মধ্যে সকলকে এবং আগামী ২ বছরের মধ্যে সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু সরকার কি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হবেন? ভগবতী কমিটি ব্যাপকভিত্তিতে পল্লী কর্ম প্রকল্পের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ছোট সেচ প্রকল্প পল্লী বৈদ্যুতিকরণ, সড়ক নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ, পল্লী গৃহ নির্মাণ, পল্লী জল সরবরাহ, শিক্ষা এবং অন্যান্য নির্মাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি। দান্তেওয়ালা (Dantewala) কমিটি ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ে, স্বল্পমেয়াদী পল্লী সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনার সুপারিশ করেছেন। এর ফলে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার (infrastructure) সম্প্রসারিত হবে এবং প্রায় ৮ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ এনে দেবে। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত ৭৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দ্বারা, আগামী ২৪ বছরে, ৪৫ লক্ষ লোকের কাজের সংস্থান করা যেতে পারে। অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ২৫ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই এখনও পর্য্যন্ত কোন আশাব্যঞ্জক ফল দেখা যায়নি।

১৯৮০ সালের মধ্যে সকলের কাছে কাজের সুযোগ এনে দিতে হলে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি শতকরা ১০ ভাগ হারে বাড়াতে হবে। কাজেই দেশে এক উন্নত, সাজ্জন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দের উচিত, এক বলিষ্ঠ এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং এর জন্য অতীতের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

## 'এথরেল' হরমোন তাড়াতাড়ি ফল পাকাতে সাহায্য করে।

[illegible] ফলের কি [illegible] ২৫ [illegible] খরচ করলে [illegible] ৫০টি [illegible] বা পেঁপে খুব তাড়াতাড়ি পাকানো যায়।

[illegible] কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বিভাগের এক একটি সংবাদে [illegible] হয়েছে যে, এক লিটার ১০০ মিলিমিটার [illegible] (-chloroethlv Phosphonic acid) ৫০০ মি [illegible] এর (৫০০ P P M) [illegible] ও প্রায় [illegible] কলা পাকানোর [illegible] দিলে ২৪ থেকে ৪৮ [illegible] সরবরা ও কলা [illegible] কোন [illegible] যেমন সুস্বাদু তেমন রঙ ও গন্ধেও খুব চমৎকার।

# উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা

পি. আর. ব্রহ্মানন্দ

১৯৬৮-৬৯ সালের মূল্যানুসারে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সরকারী ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হবে প্রায় ১৪,৩৫০ কোটি টাকা। লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল ১৫,৯০০ কোটি টাকা; অর্থাৎ মূল হিসেবের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ কম।

১৯৬৮-৬৯ সালের মূল্যমান অনুসারে প্রকৃত আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩২ শতাংশ। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম ২।৩ বছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৪৭ শতাংশ, তবে ১৯৭১-৭২ সালে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের অগ্রগতি হ্রাস পাওয়ায় চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২৩ থেকে ২০ শতাংশ।

১৯৬৪-৬৫ সালকে যদি ভিত্তি বৎসর ধরা যায়, তাহলে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ৪.১ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায়, ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে প্রকৃত আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ২.৯ শতাংশ। শস্য উৎপাদনে সবুজ বিপ্লবের সুফল যেহেতু কেবলমাত্র ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যেই অনুভূত হয়েছে, কাজেই পরবর্তী বছরগুলিতে প্রকৃত আয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা বিস্ময়কর কিছু আশা করা যায় না। সবুজ বিপ্লবের সুফল অন্যান্য শস্য ক্ষেত্রেও যদি পরিব্যাপ্ত হতো তাহলে কয়েক বছর ধরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার বছরে ২.৫ থেকে ৩.০ এসে দাঁড়াতো। বর্ত্তমানে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ বছরে ৩ শতাংশ কাজেই চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার পরবর্ত্তী বছরগুলিতে মোট প্রকৃত আয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশের বেশী আশা করা যায় না।

বৃদ্ধির হার কম হওয়ার কারণগুলি হোল: (ক) সঞ্চয়ের অনুপাত ১৯৬৫-৬৬ সালের ১১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭১-৭২ সালে ৮ থেকে ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। (খ) বিনিয়োগের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল ১৩.৪, ১৯৭১-৭২ সালে তা কমে গিয়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। (গ) মূলধনী উৎপাদনের আনুপাতিক উর্দ্ধগতি। (ঘ) শিল্প ক্ষেত্রে দারুণ সঙ্কট। (ঙ) বিদেশী মূলধন আগমন হ্রাস পাওয়া। (চ) পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিনিয়োগের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ। (ছ) রপ্তানি বাণিজ্যে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়া।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নকালে আশা করা হয়েছিল, ১৯৭০-৭১ সালে প্রকৃত জাতীয় আয় দ্বিগুণ হবে এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় দ্বিগুণ হবে ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ। কিন্তু বর্ত্তমান পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭০-৭১ সালে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হলেও, মাথাপিছু আয় ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্য্যন্ত মাত্র ৩১ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ, মাথাপিছু আয় খুব বেশী হলে শতকরা ৪৬ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়তে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধারণা করা হয়েছিল যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রকৃত আয় দ্বিগুণ হবে এবং মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবে ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ।

মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ না হবার কারণ আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। প্রকৃত আয় বৃদ্ধির গড় হার ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ছিল ৪.১ এবং ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে এই হার ছিল গড়ে বার্ষিক ৩ শতাংশ। প্রথম পরিকল্পনায় আয়ের স্বাভাবিক হার (চক্রবৃদ্ধি হারে) বছরে ১.৫ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে, ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে ৩ শতাংশে এসে দাঁড়ালো, এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার বছরে ১.৫ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ০.৪ শতাংশে দাঁড়ালো।

যদি বর্ত্তমানের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার, এই ভাবে হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষেও মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পরিকল্পনার প্রারম্ভিক নথীপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ২২ কোটি লোকের আয় ৩৭০ টাকার নীচে থাকবে। ১৯৭০-৭১ সালের সূচী অনুযায়ী ৩৬০ টাকা হোল জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আয়। শতকরা এই ৪০ ভাগ লোককে জীবন ধারণের ন্যূনতম আয়ের স্তরে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে জাতীয় আয় আরো ৪০৭০ কোটি টাকা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালের জাতীয় আয়ের চেয়ে শতকরা ১২.৫ ভাগ বেশী।

এখন দেখা যাক, পুনর্বন্টনের মাধ্যমে

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

# পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার পথে

পরিকল্পনা কমিশনের তৈরী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার পথে শীর্ষক খসড়া প্রস্তাবনাটিতে বেশ বড় বড় অক্ষরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির কথা বলা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা জোর দিয়েছিলাম কৃষির উন্নয়নের ওপর, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনায় শিল্পোন্নয়নের ওপর। চতুর্থ যোজনায় উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভরশীলতা লাভ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। এ সবের ফলে যদিও আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট [illegible] সাফল্য লাভ করেছি তবুও [illegible] মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্ব এবং [illegible] দারিদ্র্য রয়েই গেছে; ফলে সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলি জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। তাই পঞ্চম যোজনায় জোর আরোপ করা হচ্ছে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর।

পঞ্চম যোজনার লক্ষ্য হল প্রচুর কর্মসংস্থান কর্মসৃষ্টির মাধ্যমে এবং জনগণের ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর দ্বারা বেকারী ও দারিদ্র্য সমস্যার ওপর এক প্রত্যক্ষ আঘাত হানা। এ সবের দ্বারা ক্ষমতাসীন দলের দেওয়া 'গরিবী হটাও'-এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। উদ্দেশ্যটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ২০ বছর ধরে পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে নিম্নতম জীবনযাত্রার মানের নীচে রয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা, ২০ বছর আগের তুলনায় আনুপাতিকভাবে কমলেও সংখ্যাগত দিক দিয়ে কিছুই কমেনি। এঁদের সংখ্যা এখনও ২২ কোটির মত।

নিম্নতম জীবনযাত্রার মান বলতে অন্তত ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী মাথাপিছু ২০ টাকা আয়ের কথা বোঝায়। এই মাত্রার মাথাপিছু আয়ের নীচে যাঁরা রয়েছেন, প্রায় ২২ কোটি মানুষ, পঞ্চম যোজনাকালে তাঁদেরকে অবশ্যই নিম্নতম জীবনযাত্রার মানের স্তরে উন্নীত করতে হবে।

## সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

সি. জন

পরবর্তী যোজনাগুলিতে যদিও এ ধরণের কথা সেই ভাবে বলা ছিল না, তবুও একথা স্বীকৃত যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রচনার মূল কারণ ছিল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূর করা। বর্তমান খসড়া প্রস্তাবে পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির রচনা ও রূপায়ণ সম্বন্ধে নানা দোষত্রুটির উল্লেখ রয়েছে। অতীতের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করেই ভবিষ্যতের জন্য সুন্দরতর পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব এবং তার ফলেই কেবল ভারতে পঞ্চবার্ষিকী যোজনা ব্যাপারে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

গ্রামীণ দরিদ্র লোকদের অধিকাংশই হল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। এঁদের উন্নয়নের ওপরই খসড়া প্রস্তাবনায় সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আশা প্রকাশ করা হয়েছে, ভূমিসংস্কার আইনের দ্বারা উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের মাধ্যমে এই সব মানুষের যথেষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হবে। কিন্তু কিসের ওপর ভিত্তি করে যে আশা প্রকাশ করা হয়েছে তা অস্পষ্ট। মনে রাখতে হবে যে কেবল মাত্র পতিত জমি ও [illegible] পূর্ব বাংলার মত [illegible] জমি পাওয়া গেলেই তা পুনর্বন্টনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব, কেবলমাত্র জমি বন্টনের মাধ্যমে নয়। বস্তুত সবুজ বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন বড় বড় জোতদাররা, যাঁরা তাঁদের মালিকানাধীন জমির পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং ভূমি পুনর্বন্টনের মাধ্যমে [illegible] বলে মনে হয় না।

জমি পুনর্বন্টনের ফলে অতিরিক্ত জমিটুকু যাদের মধ্যে বণ্টন [illegible] হবে, [illegible] তারা অবশ্যই [illegible] হবে; বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত জমি পুনর্বন্টনের সুফল খুব সামান্যই [illegible]। জনসাধারণের কাছে এই সুফল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তেমন কিছু না হলেও, সম্ভবত মানসিক দিক দিয়ে কিছু কম নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জারের রাশিয়ায় ভূমি বন্টনের ফলে কৃষকদের মধ্যে শুধু জমি বুভুক্ষা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, গ্রামীণ দারিদ্র্য সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। অপর পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে জাপানে

ভূমিসংস্কারের ফলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। তার কারণ ভূমিসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে শিল্পেরও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে এবং অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। পঞ্চম যোজনা বিস্তারিতভাবে রচনা করার সময় বিকেন্দ্রীভূত শিল্প প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভারত, আধুনিক জাপানের মত ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারবে।

গ্রামীণ দারিদ্র ও বেকার সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত অপর প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে যে এর জন্যে ক্ষুদ্র সেচ, জমি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন, পশু পালন, বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মৎস চাষ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও কতকগুলি বিশেষ কর্মসূচী যেমন খরা এলাকায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জরুরী কর্মসূচী ইত্যাদি যে বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি আছে, সেগুলিকে ঢেলে সাজিয়ে এবং সেগুলির সমন্বয় সাধন করে ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পানীয় ও সেচের জন্য জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশণ ব্যবস্থার উন্নতি করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলি করতে হবে।

এই সব কর্মসূচী রূপায়ণের অবস্থায় আছে, তবুও এগুলির বেশীর ভাগই দারিদ্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে এখনও সমর্থ হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কর্মসূচী গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক বেকার সমস্যার সুরাহা করতে এখনও সমর্থ হয়নি। ক্ষুদ্র সেচ, পশু পালন, মৎস চাষ, ভূমি সংরক্ষণ এবং খরা এলাকার জন্য প্রস্তুত কর্মসূচীগুলি রূপায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণের আয় বৃদ্ধির এখনও প্রচুর সুযোগ আছে। গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়ে উঠবে; ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি উপকৃত হবেন। সুতরাং এখন যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন নয় বরং কর্মসূচীগুলির মধ্যে বাছাই করা; যাতে কম সুফলদায়ক কর্মসূচীগুলিকে বাদ দিয়ে অথবা কিছু কালের জন্য স্থগিত রেখে অধিকতর সুফলদায়ক কর্মসূচীগুলিতে আরও বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের দ্বারা আরও সুস্থ অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং লাভজনক ক্ষেত্রগুলিতে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ সম্ভবপর হবে, ফলে জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক বেকার এবং নিম্নমানের কর্মসংস্থানের সমস্যা মেটাবার জন্য আরও এমন কিছু করা দরকার, যার দ্বারা চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়, নতুন আশার সঞ্চার হয়। আরও যা প্রয়োজন তা হল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদের যথার্থ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পগুলির সমন্বয় সাধনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে দিয়েই দেশে বেকার ও নিম্নমানের কর্মসংস্থানের ফলে সৃষ্ট নৈরাশ্যজনক অবস্থা দূর করা সম্ভব। স্বাধীনতার ২৫ বছর পরে এবং গত দু দশক ধরে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের পর সুস্থ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য ভিত্তিমূলক বা প্রাথমিক কাজ করার কথা বলা শুধু অসময়োচিত নয় অনুপযুক্ত ও বটে।

খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, জল সরবরাহ, গৃহ-নির্মাণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে বিনিয়োগের ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার সমস্যাটির বেশ খানিকটা সমাধান হবে। এই কর্মসূচীগুলির দ্বারা অনুন্নত এলাকায়, যেখানে এই ধরণের কাজকর্ম বিশেষ কিছুই এ পর্যন্ত হয়নি, সেখানে শিক্ষিত বেকার এবং সাধারণ শ্রমজীবি উভয়ের জন্যই প্রচুর কর্মসৃষ্টি করবে।

কিন্তু কেরল ও তামিলনাড়ুর মত রাজ্যে শিক্ষা প্রসার ও গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচীর কাজ খুবই সীমিত থাকবে! তামিলনাড়ুতে সমস্ত গ্রামই এখন বিদ্যুতায়িত হয়েগেছে এবং কেরল ও তামিলনাড়ু উভয় রাজ্যেই বিনা খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। সুতরাং এই ধরণের রাজ্যগুলিতে গৃহ-নির্মাণ, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যমূলক কর্মসূচীগুলিতে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, কর্মসূচীগুলি দেশের সব জায়গায় একই ভাবে রূপায়িত হবে না। কিন্তু দেশের উন্নত অঞ্চলগুলিতেও বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া দরকার। কেন না এই রাজ্যগুলিতেও বেকার সমস্যা বেশ প্রকট।

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের ধরন যে রকম অর্থাৎ পূর্ববর্তী যোজনার তুলনায় ঠিক তার পরবর্তী যোজনায় প্রায় দ্বিগুণ অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করা; পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগও সেই নিয়মেই হয়েছে। খসড়া প্রস্তাবনা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগ হবে ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশী এবং সেজন্য অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের প্রয়োজন হবে ৬০০০ থেকে ৭০০০ কোটি টাকা। চতুর্থ যোজনায় অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করা হয়েছে ৪০০০ কোটি টাকার; এর অর্থ

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

# চাষীকে জমি দিতে হলে

অজিত কুমার বসু

দেশের অর্থনৈতি বনেদকে পাকাপোক্ত করা তো দূরের কথা। টিকিয়ে রাখাই সম্ভব নয় যদি না কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায়, এ কথা আজ সর্ব্ববাদী সম্মত। ইতিপূর্বে এ কথা স্বীকৃত হলেও অপরিহার্য বলে গণ্য হয়নি। তাই কৃষি উৎপাদনকে গৌন করে পরদেশ-নির্ভর শিল্প সমৃদ্ধির পথকেই মুখ্য করা হয়েছিল। কলকারখানা তিনটি পরিকল্পনায় বেড়েছে কম নয়। কিন্তু তা সত্বেও শিল্পে ও জাতীয় অর্থ-নীতিতে নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

দেশের এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ প্রধানত এই যে, ভারতের কষ্টার্জ্জিত বৈদেশিক অর্থের অধিকাংশটাই লেগে যায় শিল্পের প্রয়োজনীয় কৃষিজ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আমদানি করতেই। বছর বছর খাদ্যশস্য আমদানি বেড়েই আসছিল। ১৯৬১ সাল থেকে ৬৭ সাল পর্য্যন্ত যথা-ক্রমে ১২৯.৬০৬০, ১৪১.১০, ১৮৩.৬০, ২৬৬.৩০, ২৯০.৩০, ৫২৩.৩০ ও ৯৬০.০০ কোটি টাকার শুধু খাদ্যশস্যই আমদানি করা হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ৬৯ সাল পর্য্যন্ত আমদানি করা হয়েছে আনুমানিক অন্তত: ৩৬০০ কোটি টাকার। এ ছাড়া কাঁচা পাট ও তুলো প্রায় দু হাজার কোটি টাকার আমদানি করা হয়েছে। শুধু এই নয়, দুধ তেল (খাবার) ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ও আমদানি করা হয় এবং তাদের পরিমাণ, বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ, আনুমানিক অন্তত: ৬৫০০ কোটি টাকার আমদানি করা হয়েছে ঐ সব জিনিষ। অথচ, ঐ সময়ের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পড়েছে সর্বমোট ৬৯১২ কোটি টাকার। দেখা যাচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য ও কৃষিজ কাঁচামাল যদি আমদানি করতে না হোতো, তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হোতো না বা ঐ টাকায় শিল্পোন্নয়নের উপযোগী যন্ত্রপাতি আনা যেতো। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতির ফলে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশও (যাকে বলে মেনটেন্যান্স গুডস) আমদানি করা সম্ভব হয়নি। তাই অবশেষে ফলন বৃদ্ধি ও কৃষি উন্নয়নকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়লেও এটাও প্রতিভাত হচ্ছে যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে যে মন্দা তা কিছুটা কাটলেও শিল্প সমৃদ্ধির পথ সুপ্রশস্ত হবে না যদি না দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে।

দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষি নির্ভর। এদের তুলনায় চাকুরের সংখ্যা অতি নগণ্য। কলকারখানাতে তো শতকরা একজনও চাকরী করে না। খোদ্য নিয়ে তারা বড় জোর শতকরা ৩.৪ জন। সুতরাং জন-সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হলে এই কৃষি নির্ভর লোকেদেরই আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে হবে। তাই ভূমি-মালিকানা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে প্রকৃত চাষীর হাতে জমি বিলি প্রাথমিক অপরিহার্য্য কাজ বলে দলমত নির্বিশেষে সকলেই আজ আওয়াজ তুলেছেন।

এখানে একটি মূল কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিন তিনটে পরিকল্পনায় কলকারখানা অনেক বেড়েছে বটে কিন্তু দেশের বেকার সমস্যাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। শিল্প সমৃদ্ধি যদি সম্ভব হয়ও তবুও তার দ্বারা এই দারুণ বেকার সমস্যার সমাধান আপাতত সম্ভব নয় আদৌ, সুদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে কিনা তাও সন্দেহের। বছরে শতকরা এক ভাগ লোকের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান যদি হয়ও তো লোকসংখ্যা বাড়বে শতকরা দু ভাগ করে। এই জন্যই প্রকৃত চাষীর হাতে জমি বিলির প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রগণ্য ও অপরিহার্য্য হয়েছে।

ইতিপূর্বে যে ভূমি সংস্কার আইন হয়েছে তা যথাযথভাবে কার্য্যকরী করা হয়নি। তাই ভূমি ও কৃষি সমস্যার সমাধান হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার হয়েছিল। তাই লোকের আশা হয়েছিল যে ভূমি মালিকানার আমূল সংস্কার হবেই। কিন্তু সে আশা নির্মূল হয়েছে।

আইনে ব্যক্তিই মালিকানার ভিত্তি। একই পরিবারের প্রত্যে[illegible] ২৫ একর করে চাষের জ[illegible] রা[illegible] [illegible]রে। তার উপর বাগান, জলাশয়, যার কোন পরিমাণ বাধা নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই আইনের সংশোধন করে বিধানসভায় বিল আনার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাতে প্রধানত প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, ব্যক্তির পরিবর্তে একটা গোটা পরিবারকে মালিকানার ভিত্তি বা 'ইউনিট' ধরা হবে। এ প্রস্তাবে চাষের জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ তথা 'সিলিং' পূর্ব্বৎ ২৫ একরই রাখা হয়েছিল তবে চাষের জমির উপর বাগান, জলাশয়াদি ১০।১৫ একরের বেশী রাখা যাবে না।

যুক্তফ্রন্টের চেয়ে সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে বর্তমান কংগ্রেস সরকার সিলিং কমিয়ে পরিবার ভিত্তি করার প্রস্তাব করেছেন। ব্যক্তির পরিবর্তে পরিবারকে 'ইউনিট' বা ভিত্তি ধরাকে আপাত দৃষ্টিতে মৌলিক পরিবর্তন বলে মনে হবে। কিন্তু কার্য্যত তার দ্বারা বর্তমানে আসল উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আগের ভূমি সংস্কার আইনের জন্য তো বটেই, ধানচাষের 'লেভি' ও উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এড়াবার জন্য আরও বিশেষ করে, অধিক জমির মালিকরা ইতিমধ্যে পরিবার ভাগ করে বসে আছে। তিন একর জমির খাজনা মকুব করা হবে জেনেও জমি ও পরিবার ভাগ করা হয়েছে ও হচ্ছে। কাজেই সিলিং এর উপর অতি কম পরিবারেরই জমি উদ্বৃত্ত হবে। তাছাড়া, 'পরিবার' মানেই স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও পোষ্য নয়। এ ক্ষেত্রে একজনই একটি পরিবার হতে পারে, সে নাবালোক না সাবালোক সে প্রশ্নও আইনে টিকবে না। বাবা মা থাকলে যে ছেলে পৃথক 'সংসার' হতে পারে না, তা-ও নয়। একই বাড়িতে একাধিক সেন্সাস নম্বর, রেশনকার্ড, পঞ্চায়েত করদাতা আছে, তা আজ অজানা নয়।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি নির্ভর জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা কিরূপ এবং তাদের জন্য কত জমির দরকার তার হিসাব দিলেই জমি মালিকানা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের গুরুত্ব ও প্রস্তাবিত আইনের তাৎপর্য্য বোঝা যাবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য (বুলেটিন, অক্টোবর ৬৬) অনুসারে গ্রামের পরিবারগুলির ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম, আসবাব ও তৈজসপত্র, ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য সমুদয় সম্পদে যা আছে তার শতকরা মাত্র ১৩.২ ভাগের অধিকারী গ্রামের শতকরা ৬০.৭টি পরিবার। প্রতি পরিবারের সমগ্র সম্পত্তির মোট মূল্য ২।১ শো টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত, যা গড়ে আনুমানিক বড় জোর দেড় হাজার টাকা। আজকালকার মূল্যমানের তুলনায় এ কতটুকুই বা—এক জোড়া বলদের দামই ১২০০ টাকা, এক বিঘা জমির দাম হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা। নিম্নে হিসাব উদ্ধৃত করা হল :

| পরিবারের শতকরা | সমগ্র সম্পত্তির শতকরা | প্রতি পরিবারের সম্পত্তির মূল্য (হাজার টাকা) |
|---|---|---|
| ২৪. | .৬ | ১।২ পর্যন্ত |
| ১৪.[illegible] | ২.৬ | ১।২-১ |
| ২১.৬ | ৯.০ | ১-২১।২ |
| ১৭.০ | ১৫.২ | ২১।২-৫ |
| ১২.২ | ২১.৮ | ৫.১০ |
| ৬.৮ | ২৩.৬ | ১০-২০ |
| ৩.৩ | ২৬.২ | ২০ এর উর্দ্ধে |

৬১ সালের 'সেন্সাস' বা গণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি আছে শতকরা প্রায় ৩০ জনের। তাদের মধ্যে শতকরা ৭২.২৭ জনের হাতে আছে ০.৫ একর জমি। অর্থাৎ পরিবার প্রতি গড়ে বড় জোর ২ একর। এর উপর আছে ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, যারা গ্রামের লোকসংখ্যার শতকরা ১৬ ভাগ।

ন্যাসন্যাল স্যাম্পল সার্ভের (১৬ শ দফা) তথ্য অনুসারে চাষের জমির মালিক পরিবারদের মধ্যে শতকরা ৪৪.১৫টি পরিবারের হাতে আছে মাত্র শতকরা ২ ১৬ জন ক্ষেত মজুর।

দেখা যাচ্ছে ক্ষেত মজুর সহ শতকরা অন্তত: ৬০।৭০ জনের আর্থিক অবস্থা হীনতম। ইতিপূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে শতকরা ৬০ জনের হীনাবস্থার কথা বলাই হয়েছে। সুতরাং শিল্পোৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন, এমন কি কৃষি উৎপাদন বাড়লেও, শতকরা এই ৬০।৭০ জনের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়াতে পারলে এদের কাছে সে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল্যই নেই। কাজেই পণ্য অবিক্রী থেকে যাবে।

বড় বড় খামার করে উন্নত ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ফসল সুনিশ্চিতই বাড়বে। কিন্তু তাতে কৃষি বেকারিও বাড়বে। কাজেই ফলন বৃদ্ধিতে বিক্রীর সঙ্কট দেখা দেবে। তাই এই সব বিত্তহীন ও অল্পবিত্ত কৃষিজীবিদের হাতে ন্যায্য পরিমাণ জমি দিলে তবেই ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। তাতে কৃষি উৎপাদনও বাড়বে।

এই দীনহীন কৃষি নির্ভরদের জমি দিতে প্রথমত এবং অবশ্যই জমি মাথার সর্বোচ্চ সীমা তথা 'সিলিং' কমিয়ে সেচ এলাকায় মাথা প্রতি তিন একর ও পরিবার প্রতি ১৫ একর এবং অসেচ এলাকায় ৪ একর ও ২০ একর, উভয় ক্ষেত্রেই পরিবার বা মাথা প্রতি যে হিসাবে কম হবে, ধার্য্য করতে হবে। অর্থাৎ তিন জনের পরিবার হবে ৯।১২ একর কিন্তু ৭ জনের পরিবার হবে ২১।২৮ না হয়ে ১৫।২০ একরই হবে। এ ব্যবস্থায় মালিকরা পরিবারের পোষ্য সংখ্যা কমা-বাড়া করে আর ফাঁকি দিতে পারবে না। তাছাড়া, দ্বিতীয়ত: বাগান ও জলাশয়কে এই 'সিলিং' এর মধ্যেই ধরতে হবে, ছাড় দিলে চলবে না। কারণ সকলেই জানেন, এগুলি খুবই লাভজনক এবং ধনীদেরই হাতে আছে। ৩।৪ একর না ৫।৬ একর সিলিং হবে তার চেয়ে বড় কথা জন, মাথা ভিত্তিক 'সিলিং' এ কথা মনে রাখতে হবে।

জমির মালিকদের ও কৃষিজীবিদের মধ্যে প্রধানত দুটি ভাগ আছে। এক অচাষী, যারা পরের শ্রমে তা ভাগে দিয়ে ফসল ভোগ করে। দুই, কৃষিকার্য্যে ও উৎপাদনে নিজের শ্রম নিয়োগ করে। এরাই প্রকৃত চাষী।

প্রথমোক্ত অচাষী মালিকদের মধ্যেও আছে কয়েকটি ভাগ। এক, গ্রামে বাস করে না চাকুরী বা ব্যবসা উপলক্ষে বহু দূরে বা শহরে বাস করে। দুই, ব্যবসায়ী চাকুরে, উকিল, ডাক্তার আদি, যাদের জীবিকার্জনের প্রধান বা একমাত্র অবলম্বন জমি নয়, অনেকের ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত টাকা লগ্নির একটা নিরাপদ অবলম্বন। এদের অনেকেই জমির জন্য ঐ আয়ের পথ ছাড়তে রাজী নয়। তিন জমি বা কৃষিই তাদের প্রধান অবলম্বন।

প্রকৃত চাষীদের হাতে জমি দেবার নীতি দলমত নির্বিশেষে সর্ব বাদী সম্মত। সুতরাং, সর্বপ্রথম আইন করা দরকার যে অত:পর উত্তরাধিকার সূত্রে ছাড়া প্রথমোক্ত অচাষী শ্রেণীর লোকরা জমি আর কিনতে বা দান নিতে বা দান করতে পারবে না এবং বেচতে হলে অনুমতি নিয়ে প্রকৃত চাষীকে বিক্রী করতে হবে। তাতে জমির দাম খুবই পড়ে যাবে। কারণ, অচাষীরাই চড়া দরে জমি কেনে, কালো টাকার লগ্নি করে। তাহলে প্রকৃত চাষীরা অনেকেই নিজে নিজে জমি কিনে নিতে পারবে এবং সরকারের বিলি করার ও খেসারত দেবার দাম কমবে। কিন্তু এখনও যেমন আছে প্রস্তাবিত আইনেও তেমনই অচাষীরা দূর বিদেশে থেকেও সিলিং এর মধ্যে জমি কিনতে পারবে। এটা চাষীর হাতে জমি দেবার নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। চাষীর হাতে জমি দিতেই হবে এবং অচাষীর হাতে জমি রাখা হবে না, এই যখন নীতি তখন আগে থেকে যে অচাষীর হাতে জমি আছে তা না হয় থাকলো কিন্তু আর না অচাষীর জমি কিনতে পারে তা তো করতেই হবে। না হলে বারবারই তো ওদের কাছ থেকে নিয়ে চাষীদের দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেক জমির মালিককেই তার বেশী জমি যেখানে আছে। গ্রামে সপরিবার পাকাপাকীভাবে বসবাস করতেই হবে। একটা অল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা না করলে সব চাষের জমিই সরকারের খাস হয়ে যাবে। শহরে বা দূরে বাস করে জমির স্বত্ব ভোগ করবে, তা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। নীতির দিক থেকে তো বটেই, গ্রামের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিক থেকেও এ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য্য।

তৃতীয়ত:, জরুরী ব্যবস্থা করে নতুন সেটেলমেন্ট করতে হবে এবং সব ভাগ চাষের জমি ও চাষীর নাম রেকর্ড করতে হবে। মিথ্যা রেকর্ড করালে জমি বাজেয়াপ্ত করার ও কঠোর সাজা দেবার আইন করতে হবে। বর্তমানে রেকর্ড নেই। আশ্চর্যের বিষয় যুক্তফ্রন্টের হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রস্তাবেও সে ব্যবস্থা ছিল না। ভাগ চাষ ও ভাগ চাষী রেকর্ড না হলে যত ভাল আইনই করা হোক না কেন তাতে বিবাদ সজ্ঞাষ মামলাই বাধবে সুফল কিছুই হবে না।

চতুর্থত: একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে ভাগ চাষকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে আইন করতে হবে। সরকারী নথিপত্রে যাই থাকুক, বিপুল পরিমাণ জমি ভাগে চাষ হয়। ফলন যতই কম হোক, বিনা খরচে অর্দ্ধেক ফসল পেয়ে মালিকরা লাভবান হন। তাই ধনী মালিকরা ফলন বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে জমি বাড়াবার দিকেই নজর দেয়। গরীব মালিকরাও ভাগ চাষীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে বা অগ্রিম দিতে অক্ষম। ভাগ চাষীরা পুঁজি নিয়োগ করতে পারে না উপরন্তু অভাবের জন্য নিজের জমিতে যথা সময়ে চাষাবাদ করতে পারে না মজুরী করতে হয়। এই সব কারণে ভাগ চাষে সাধারণত ফলন কম হয়ই। ফলন বৃদ্ধির জন্যই ভাগ চাষ তুলে দেওয়া দরকার।

পঞ্চমত: প্রত্যেক মালিককে নতুন করে সবিস্তার ঘোষণা দিতে হবে প্রথম ভূমিসংস্কার আইনের আগে কার কত জমি সর্বমোট ছিল। সরকার থেকেও জরুরী ব্যবস্থা করে ঐ ভূমিসংস্কার আইনের আগের রেকর্ড তদন্ত করতে হবে কার কত জমি ছিল। এই তদন্তে বর্তমানের ঘোষণার সত্যামিথ্যা ধরা পড়বে। ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হলে জমি বাজেয়াপ্ত করার ও কঠোর সাজা দেবার আইন করতে হবে। এই তদন্তে ২৫ একরের বেশী জমি হস্তান্তরিত হলেও সরকারের কাছে খাস হয়ে যাবে এবং মিথ্যা হিসাব দেওয়ার জন্য শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ হস্তান্তরিত জমি বেআইনী বিক্রী ব বেনামী হয়ে থাকলে যার নামে আছে তার যদি পরিবারের মধ্যে পাঁচ এক একরের কম জমি থাকে তবে সে জমি তাকেই বিলি দিতে হবে এবং মালিক যে জমি রেখেছেন তা থেকেই ঐ বেনামী বা বেআইনী বিক্রীর জমি দিতে হবে। জমিদারের বা মালিকের অপরাধের বোঝা না ক্রেতার ঘাড়ে চাপে এবং মিথ্যা চাষী না রেহাই পায়, সেটা দেখা প্রাথমিক দায়িত্ব। এ ছাড়া নতুন করে জরিপ বা সেটেলমেন্ট করতে হবে। আইন করতে হবে, সেটেলমেন্টে মিথ্যা হিসাব দিলে জমি বাজেয়াপ্ত সহ কঠোর সাজা দেওয়া

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

# ষষ্ঠ অর্থ কমিশন

২৬শে জুন, ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর সভাপতিত্বে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী সৈয়দ সাদাত আবদুল মাসুদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ বি. এস. মিনহাস, ত্রিবান্দ্রামের 'সেণ্টার ফর ডেভেলপ্‌মেণ্ট ষ্টাডিসের' ফেলো ডঃ আই. এস. গুলাটি এবং ভারত সরকারের যুগ্ম সচিব শ্রী জি. রামচন্দ্রন। কমিশনের কাজ হবে পঞ্চম যোজনাকালে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করা। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে কমিশনকে তার রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে।

এই প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যকে অর্থ কমিশনে নিয়োগ করা হ'ল। অর্থ কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশন, এই দুই সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হ'ল এর উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশন যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে পারেন সেগুলি এবং পূর্বতন অর্থ কমিশনগুলির ক্রিয়াকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা এই প্রবন্ধে দেওয়া হ'ল।

# নিয়ম ও প্রণালী নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

জি আর ডাওয়ার

সংবিধান রচয়িতাগণ, আর্থিক দিক দিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানে কতকগুলি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছিলেন। সেই সঙ্গে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যাপারে যে অসাম্য বর্ত্তমান আছে, সে দিকেও তাঁরা লক্ষ্য রাখেন। রাজ্যগুলি কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব এবং তার ব্যয়ের অঙ্কের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করার জন্য—যার ফলে কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলির হাতে সম্পদ হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে—মধ্যে মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে সংবিধানে কতকগুলি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলি অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে অর্থ কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে ; যার কাজ হ'ল কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের পর্য্যালোচনা করা।

## সংবিধানে কি বলা হয়েছে

সংবিধানের ২৬৮ নং অনুচ্ছেদে এমন কতকগুলি করের কথা বলা হয়েছে যেগুলি ধার্য্য করবেন ভারত সরকার, কিন্তু সেগুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হবে রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা। এই রকম সাতটি বিষয় আছে, যেগুলির ওপর কর ধার্য্য করে থাকেন ভারত সরকার ; কিন্তু এই করগুলি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সবটাই পেয়ে থাকেন রাজ্য সরকারগুলি এবং পার্লামেন্ট ব্যবস্থিত বন্টন নীতি অনুসারে যা সংবিধানের ২৬৯ নং ধারায় নথিভুক্ত হয়েছে, এই আয় রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকে। তাছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যকে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাবার জন্য বিশেষ সাহায্য হিসাবে বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ দেবার কথা সংবিধানের ২৭০,২৭২ এবং ২৭৫ নং ধারায় বলা হয়েছে।

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে, কর ও শুল্কের ধরণ কি, সেগুলি আদায় করার

ভার কার ওপর এবং আয় কর, আবগারী শুল্ক ইত্যাদি হিসাবে প্রাপ্ত রাজস্বের ভাগ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কে কতখানি পাবে—সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা আছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয় বন্টনের ধরণ কি হবে, সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নীতি বা প্রণালী সম্বন্ধে সংবিধানে কিছুই বলা নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই কর ও শুল্ক বাবদ আয় কি ভাবে বন্টন করা হবে—সে বিষয়ে নানান অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে একটি মত হ'ল, অনিশ্চয়তা এড়াতে গেলে বন্টনের জন্যে নির্দ্ধারিত অর্থে রাজ্যগুলির কার কত অংশ, সে সম্বন্ধে সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। অপর মতটি হ'ল, এই অসুবিধাজনক অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য একটি উপযুক্ত ও কার্য্যকরী নীতি প্রণয়ন করা। এই বিষয়ে এ যাবৎ গঠিত পাঁচটি অর্থ কমিশনের মত ও ধারণা কি ছিল এবং এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কি ভাবে করা যায়; এই প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

## কর রাজস্বের বণ্টন

কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক আরোপিত ও সংগৃহীত কর ও শুল্ক (আয় কর এবং আবগারী শুল্ক ইত্যাদি) বাবদ আয়ের ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্টনের প্রশ্নটি এ যাবৎ গঠিত বিভিন্ন অর্থ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। আয়কর ও আবগারী শুল্ক বাবদ আয় বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে প্রধানত: জনসংখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা এবং রাজ্যগুলির জনসংখ্যার মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কর ও শুল্ক বাবদ রাজস্ব বন্টনের ব্যাপারে একটি ন্যায়সঙ্গত নীতি নির্দ্ধারণ করার প্রশ্নটি ক্রমশই গুরুভার হয়ে উঠেছে। দেখা গেছে, যে রাজ্যগুলিতে জনগণের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম সেই রাজ্যগুলিতেই দেয় অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী; অপরপক্ষে, জনসংখ্যার পরিমাণের সঙ্গে আয় কর রাজস্বে রাজ্যের অবদানের কোন সম্পর্কই নেই। আবার, কোন রাজ্যের আর্থিক চাহিদার সঙ্গে সেই রাজ্য থেকে আদায়ীকৃত আয় কর বাবদ আয়েরও কোন সম্পর্ক নেই।

একটির পর একটি অর্থ কমিশন আয় কর বাবদ আয় বন্টনের বিষয়ে আয়করে সেই রাজ্যের সংগ্রহ বা অবদানের পরিমাণকেই ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে এসেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ অর্থ কমিশনের বক্তব্য হ'ল, "যদিও কোন রাজ্যে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণ বলতে প্রকৃতপক্ষে আয়করে সেই রাজ্যের অবদানের কথা বোঝায় না, তবুও কোন রাজ্যের অবদান নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে সেই রাজ্যে সংগৃহীত আয়করকেই রাজ্যের অবদানের সূচক হিসাবে গণ্য করতে হবে।" কোন রাজ্যে সংগৃহীত আয় করের পরিমাণের ওপরই মোট সংগৃহীত আয়করে সেই রাজ্যের প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ নির্ভর করার অর্থ হ'ল, ধনী রাজ্যগুলি আরও ধনী হয়ে উঠবে এবং গরীব রাজ্যগুলি আরও গরীব হয়ে যাবে।

আবগারী শুল্ক বন্টনের ব্যাপারে তৃতীয় অর্থ কমিশন মন্তব্য করেন, "আমাদের বিবেচনায় মোটামুটি ভাবে জনসংখ্যাকেই বন্টনের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা শ্রেয়; কিন্তু পরে এই অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছেন যে মোট সংগৃহীত আবগারী শুল্কের শতকরা ১০ ভাগ বন্টনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রদ বদল করার জন্য আলাদা করে রাখা দরকার। অন্যান্য অর্থ কমিশনগুলির মত হ'ল, রাজ্যগুলির ব্যয়ের ধরণ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির অভাবে প্রধানত: জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করেই আবগারী শুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই অর্থ বন্টনের অনেকগুলি অসুবিধা আছে এবং এই নীতি রূপায়িত হলে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হবে। তাই শ্রীমতী উরমুলা হিক্স এর মতে এই সমস্যার আসল সমাধানের একমাত্র রাস্তা হ'ল, বিভিন্ন রাজ্যের তুলনামূলক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনের পরিমাণ বিচার করা। এই নীতি কার্য্যকারী হলে অপেক্ষাকৃত ধনী রাজ্যগুলিকে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না, অথচ দরিদ্রতর রাজ্যগুলির পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সমৃদ্ধিতে যে ব্যবধান আছে, তা ক্রমে সংকুচিত হবে।

যাই হোক, এ ব্যাপারে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে কর ও শুল্ক বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ বন্টনে [illegible] কেন্দ্রের কিছু অনুদানের প্রয়োজন আছে, যার দ্বারা পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে সমান সুবিধাজনক অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারে। এর অর্থ হ'ল, বিকল্প নীতিটির এখনও কিছু সংশোধনের দরকার আছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর শুল্ক বন্টনের ব্যাপারে বেশ কিছু যুক্তি আছে এবং সেই কারণে একটি ন্যায়সঙ্গত বন্টন নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে এই ব্যাপারটিকেও হিসাবের মধ্যে গণ্য করতে হবে।

## সাধারণ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে

ডঃ কে. ভি. এস. শাস্ত্রী তাঁর

"ফেডার‍্যাল-ষ্টেট ফিসক্যাল রিলেশনস ইন ইণ্ডিয়া" শীর্ষক বই এ মন্তব্য করেছেন যে, সাধারণ রাজ্যগুলির মধ্যে কর শুল্ক বাবদ অর্থ বন্টন হওয়া উচিত, শতকরা ৯০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের তুলনামূলক মাথাপিছু আয় সূচকের ওপর ভিত্তি করে এবং শতকরা ১০ ভাগ রাজ্যের আয়তনের ওপর নির্ভর করে। সাধারণ রাজ্য বলতে যা বোঝায় তা হ'ল : প্রথম, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ কোন তারতম্য থাকবে না। দ্বিতীয় বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে জমির বিশেষ কিছু পার্থক্য থাকবে না। তাছাড়া রাজ্যের আয়তন এবং তার জনসংখ্যা একে অপরের সাম্য অনুপাতে থাকবে। উক্ত নীতি অনুযায়ী রাজ্যগুলির অংশ নির্দ্ধারণের জন্য ডঃ শাস্ত্রী যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেছেন, তা হ'ল এই রকম :

এই নীতি অনুযায়ী প্রথমেই রাজ্যগুলির অংশ নির্দ্ধারণের জন্যে সেগুলি বাছাই করা প্রয়োজন।

যে রাজ্যে মাথাপিছু আয় পূর্বের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (যেমন নাগাল্যাণ্ড) সেখানে মাথাপিছু আয় রাজ্যগুলির গড়ের তুলনায় অনেক কম হবার সম্ভাবনাই বেশী এবং যেহেতু এটি একটি নবগঠিত রাজ্য, (সম্ভবত এই রাজ্যের অর্থের প্রয়োজনও বেশী) সেই কারণে এই রাজ্যের মাথাপিছু আয় যে কোন সাধারণ রাজ্যের সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের দ্বিগুণ হওয়া দরকার।

নাগাল্যাণ্ড সমেত সমস্ত রাজ্যের মাথাপিছু আয় জানা গেলে প্রত্যেকটি রাজ্যের অংশ সহজেই নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। বন্টনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ যেহেতু আগেই ঠিক করা হয়েছে; এখন নাগাল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্তির ফলে রাজ্যের অংশগুলির যোগফল পূর্ব নির্দ্ধারিত অঙ্কের চেয়ে বেশী হবে। তাই প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব অংশের পরিমাণ কমে যাবে। মূল নীতি অনুযায়ী নির্দ্ধারিত অঙ্ক বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বন্টনের ধরণ কোন রকমেই বদলাবে না।

এই যে পদ্ধতির কথা বলা হ'ল, তা সাধারণ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত হলেও, বিশেষ রাজ্যগুলি অর্থাৎ যেগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বা যেগুলির ভৌগলিক প্রকৃতিতে বিরাট ব্যবধান বর্তমান, সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যাবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়াও এই নীতির ব্যাপারে আর একটি বড় অসুবিধা হ'ল এই যে, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নীতির আওতায় পড়ে না :

যেমন (১) আর্থিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে কোন রাজ্যের অনগ্রসরতা (২) মাথাপিছু আয়ের দিক দৃষ্টি রেখে মাথাপিছু করের বোঝা এবং (৩) সীমান্ত থেকে নৈকট্য ইত্যাদি কতকগুলি রাজ্যের বিশেষ ধরণের সমস্যা। তাই এই বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে একটি আরও যুক্তিসঙ্গত নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছে। ঐ সবের ফলে কর খাতে আয়ের অঙ্ক বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বন্টনের সমস্যাটি সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

## যৌথ কর্ত্তৃত্ব

সংবিধানের ২৮০ (৩) (খ) ধারা অনুসারে, ভারত সরকারের সম্মিলিত অর্থ ভাণ্ডার (consolidated fund) থেকে রাজ্যগুলিকে দেয় সাহায্য বাবদ বরাদ্দ (grants in aid) নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে এবং ২৭৫ এবং ২৮২ নং ধারা অনুসারে আন্তঃরাজ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের ব্যাপারে প্রয়োজন মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংবিধান অর্থ কমিশনকে ক্ষমতা দিয়েছেন।

সম্প্রতি ঘাটতি রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি পূরণে সাহায্য বাবদ বরাদ্দ (grants-in-aid) ক্রমশই আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশন উভয়েই এই সাহায্য বাবদ বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা সম্বন্ধে সমান ভাবে চিন্তিত; কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত দায়িত্ব কার সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এই সমস্যাটি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে কর শুল্ক বাবদ আয়ে রাজ্যগুলির অংশ নির্দ্ধারণ করবার পর যোজনাকালে বিভিন্ন রাজ্যে যে রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয় তা হিসাব করে বর্তমানে অর্থ কমিশনই সাহায্য বাবদ বরাদ্দ মঞ্জুর করে থাকেন। আবার যেহেতু এ ব্যাপারে কোন নিয়ম-কানুন নেই, সেই হেতু রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে সুপারিশ করার ভার পরিকল্পনা কমিশনের ওপর ন্যস্ত। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশনের সম্পর্কে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে; কেন না সংবিধান নির্দেশিত ধারা অনুযায়ী পরিকল্পনা অর্ন্তগত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত বিভিন্ন ব্যায় বরাদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করার ক্ষমতা থেকে অর্থ কমিশন বঞ্চিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে যোজনাকালে বাজেট প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য বাবদ বরাদ্দের সুপারিশ করার ক্ষমতা একমাত্র অর্থ কমিশনের হাতে ন্যস্ত থাকলেও কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসেবে সাহায্য বাবদ বরাদ্দের বেশীর ভাগই বন্টনের জন্য ক্ষমতা দেওয়া আছে পরিকল্পনা কমিশনের হাতে।

এ সবের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি

হয়েছে, তা হ'ল পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ করা শর্তাধীন বরাদ্দ অর্থ কমিশনের সুপারিশ করা নিয়মমাফিক বরাদ্দের চেয়ে ক্রমশই বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে কেন্দ্রের কাছে ক্রমশই আরও বেশী করে রাজ্যগুলির দেনা বেড়ে চলেছে। এই ধরণের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের নিয়ম বলবৎ থাকার ফলে রাজ্যগুলি তাদের উন্নয়ন কর্ম আরও জোরদার করার জন্য কেন্দ্রের ওপর আরও বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। তৃতীয় অর্থ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছে যে, ১৯৬০-৬১ সালে শর্তাধীন বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় রাজ্যের মোট ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ বা তাদের পরিকল্পনা ব্যয়ের চার পঞ্চমাংশের সমান। অপরপক্ষে, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এমন আকার ধারণ করেছে যে, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব সম্পদ এত বেশী পরিমাণে আহরণ করতে পারে না, যার দ্বারা তাদের সব আর্থিক দায়দায়িত্ব পূরণ হতে পারে।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কারণ, একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক সংস্থা রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশন এই দু'য়ের মধ্যে আরও ভাল সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদেই এই বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটা দরকার। একটির পর একটি অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য। এদিকে একটির পর একটি যোজনা রচনা ও রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে পরিকল্পনা বরাদ্দ সুপারিশ করার ভার পরিকল্পনা কমিশনের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটতে পারে দুভাবে: এক রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রের যাবতীয় দেয় ও ও ঋণের ব্যাপারে সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্থ কমিশনের ওপর ন্যস্ত করে অর্থ কমিশনের ক্ষমতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা আর দুই, অর্থ কমিশনকে তুলে দিয়ে এবং পরিকল্পনা কমিশনকেই অর্থ কমিশনে রূপান্তরিত করা।

## সাহায্য বাবদ বরাদ্দ

সাহায্য বাবদ বরাদ্দ মঞ্জুরের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হ'ল এই যে প্রথম অর্থ কমিশন এ ব্যাপারে যে নিয়মকানুনগুলি অনুসরণ করেছিলেন, এযাবৎ সব অর্থ কমিশন ঐ নিয়মকানুনগুলির ওপর ভিত্তি করেই এই বরাদ্দ মঞ্জুর করে আসছেন। প্রথম অর্থ কমিশনের বক্তব্য ছিল, রাজ্যের বাজেটে সাধারণ নয় এমন বা প্রতি বাজেটে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় না এমন ব্যয়ের অঙ্কগুলিকে বাদ দেবার পর সমস্ত রাজ্য বাজেটগুলিকে তুলনার সুবিধার জন্য একই স্তরে আনার পরই কেবল প্রত্যেক রাজ্যের বাজেট প্রয়োজন নির্ণয় করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে অর্থ কমিশনগুলির বক্তব্য হল এই যে, কোন রাজ্য থেকে যে পরিমাণ কর শুল্ক পাওয়া সম্ভব, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তার ওপর, কেন্দ্রীয় সাহায্য মঞ্জুর করার সময় রাজ্যের জনসংখ্যা, মাথাপিছু আয়, বিভিন্ন কর্মসূচীর পূর্ণ রূপায়ণের জন্য পূর্বের বরাদ্দ বহির্ভূত অর্থ এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ বিশেষ সমস্যা ইত্যাদির কথাও মনে রাখতে হবে, তৃতীয় অর্থ কমিশনের মতে সাহায্য বাবদ বরাদ্দের ব্যাপারে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল যে, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় সাহায্য বরাদ্দ করার বিষয়টি অভিন্ন ভাবে প্রযোজ্য করার পথে, এমন কতকগুলি নিয়মকানুনের অভাব।

সম্প্রতি, পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্টনের ব্যাপারে একটি বাস্তব নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ করতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এক তরফা সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ সম্বন্ধে বিবেচনা করার পরই কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হবে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে মূল নীতিগুলিকে মোটেই বিবেচনা করা হয়নি।

## নিয়ম ও প্রণালী নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রাজস্বের সমস্ত নমনীয় উৎসগুলি আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই সমস্ত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত বরাদ্দগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। এই দুই ধরণের বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করার ভার কেন্দ্রীয় সরকার দুটি ভিন্ন ভিন্ন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করেছেন, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সময় ষষ্ঠ অর্থ কমিশন সামগ্রিক অবস্থার বিবেচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি সুসম নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ করবেন। যেমন দুটি হ'ল (১) কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কর ও শুল্ক বাবদ আয়ের বন্টন (২) অনুন্নত রাজ্যগুলির ওপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যগুলির জন্য পরিকল্পনা ও অর্থ ভুক্ত পরিকল্পনা বহির্ভূত সাহায্য বাবদ বরাদ্দ মঞ্জুর করা—এই ধরণের ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্র রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

# দারিদ্র্য ও তার দূরীকরণ

এম. আর. হাজারে

চরম দারিদ্র্যের বিষময় জ্বালা যে কি—তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। সংস্কৃত শ্লোকে আছে, দারিদ্র্য হোল মূর্তিমান মৃত্যু। দারিদ্র্যের স্বরূপ যে কি, দুটি অনুন্নত দেশের বর্ণনার মধ্যে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। দুটি দেশের একটি হোল উত্তর আফ্রিকায় অপরটি হোল দক্ষিণ আমেরিকায়। প্রথম দেশ সম্পর্কে আছে—"সম্পূর্ণ নগ্নপ্রায় একদল নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু—মৃত্যু ও অভাবের তাড়নায় যারা শহরে ছুটে এসেছে; প্রত্যেক সকালে তাঁদেরকে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করে স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে থেকে উচ্ছিষ্টের সন্ধান করতে হয়।" দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে—"শহরের ঝাড়ুদার ও মেথরদের জন্য সেই সব হতভাগ্যেরা অপেক্ষা করে আছে, কখন তাঁরা জঞ্জাল ভর্তি পরবর্তী লরী এনে চালবে।"

টাউনসেণ্ড সম্পাদিত, দি কনসেপ্ট অব পভার্টি (the concept of poverty) পুস্তকে দারিদ্র্যকে বিশেষ করে বিকাশশীল দেশে দারিদ্র্যকে বলা হয়েছে কু-ব্যবস্থা বা পদ্ধতি, যার মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বের জন্য অবিরত সংগ্রাম, বেকারী, নিম্ন আয়, অদক্ষ শ্রমিক, খাদ্যাভাব, ব্যক্তিগত জীবনে গোপনীয়তার অভাব, শিশু শ্রমিক, পলায়নী বৃত্তির অবলম্বন হিসাবে মদ ও ঐ ধরণের মাদক জাতীয় ওষুধপত্র গ্রহণ ইত্যাদি।

## দারিদ্র্যের সংজ্ঞা

J. C. McKenzie খাদ্যের নিরিখে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত করেছেন। তিনি বলেছেন, খাদ্যের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক। আমাদের বেঁচে থাকার সম্পর্ক, আমাদের টিকে থাকার সম্পর্ক। একদিক থেকে খাদ্য আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক ভাব পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেও খাদ্য, অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। জীবনের বহু ঘটনাই খাবার টেবিলে বসে সংঘটিত হয়। বস্তুতঃপক্ষে খাদ্যের অভাব ও অপচয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির জীবন ধারণের মান নির্দ্ধারণ করা যায়। পুষ্টির অপ্রতুলতাকে কখনও কখনও দারিদ্র্য বলে চিহ্নিত করা যায়।

## জীবন ধারণের সূচী

দারিদ্র্যকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পদের অসম বণ্টনের ফল বলে গণ্য করা যায়। Drewnowski এবং scott, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য জীবন-যাত্রার যে সূচী রচনা করেছিলেন, তা নীচে দেওয়া হোল :—

জীবন ধারণ সূচীর স্তর

| বিষয় | পরিমাপ |
|---|---|
| ১. মৌলিক জৈবিক প্রয়োজন | |
| (১) পুষ্টি | ক্যালোরী |
| (২) বাসস্থান | জনাধিক্য |
| (৩) স্বাস্থ্য | মৃত্যুর হার, চিকিৎসা |
| মৌলিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজন | |
| (৪) শিক্ষা—স্কুলে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা। | |
| (৫) অবকাশ যাপন—সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন ও বিনোদন। | |
| (৬) নিরাপত্তা—হিংসাত্মক কার্য-কলাপে মৃত্যু এবং বেকারের সংখ্যা। | |
| ৩। অমৌলিক সাধারণ প্রয়োজন | |
| (৭) উদ্বৃত্ত আয়—সর্বোপরি মৌলিক প্রয়োজনগুলির পর অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো। | |

(ক) সম্পদ—চলতি নগদ আয়, মূল সম্পদ, চাকরী থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, সামাজিক কল্যাণ সংক্রান্ত সুবিধা, দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদির মধ্যে ব্যক্তিগত আয়।

(খ) ক্যালোরী

| | | |
|---|---|---|
| ৩০০০ | ক্যালোরী | গড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় |
| ২৫০০ | ,, | অপুষ্টি |
| ২০০০ | ,, | তীব্র খাদ্যাভাব |
| ১৫০০ | ,, | দুর্ভিক্ষজনক অবস্থা |

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি বৃটেনে, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সামাজিক সংস্কার সত্ত্বেও একদিকে উচ্চ কর হার এবং অন্যদিকে চাকরীর স্বল্পতার ফলে বৃদ্ধ, পিতৃহীন পরিবার, বেকার এবং রুগ্নদের মধ্যে দারিদ্র্য রয়েছে। ঔপন্যাসিক ষ্টাইনবেক এবং অর্থনীতিবিদ গলব্রেথের রচনায় দেখা যায়, এমন কি সচ্ছল সমাজের মধ্যে এখনও দারিদ্র্যের কলঙ্ক রয়েছে!

ভারতে দরিদ্র বলতে কাদের বোঝায় এবং তাঁদের সংখ্যা কত? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই শক্ত। কারণ, এটা নির্ভর করে দারিদ্র্য সম্পর্কে এক একজনের ধারণার উপর এবং তা পরিমাপ করার পদ্ধতির ওপর।

ভোগের বর্তমান মান অনুসারে, ৫৫ কোটি লোকের মধ্যে ২২ কোটি লোক এখনও দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে।

১৯৬৭-৬৮ সালে, ১৫ কোটি পল্লী অধিবাসী এবং প্রায় ৫ কোটি শহরবাসী, জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৯৮০-৮১ সালে, পল্লী এলাকার ৩৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৫০ শতাংশ অধিবাসী জীবন ধারণের মানের চেয়েও নীচে থাকবে। শুধু বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন একজনের কমপক্ষে ২২৫০ ক্যালোরীর প্রয়োজন। ২২৫০ ক্যালোরী উপরিলিখিত সূচী অনুযায়ী তীব্র খাদ্যাভাব জনিত অবস্থার মাঝামাঝি পর্য্যায়ে পড়ে।

পুষ্টি সংক্রান্ত অর্থনীতিতে অবশ্য বলা হয় যে, আমরা যদি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে সকলের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা খুব শক্ত নয়। ১৯৭০-৭১ সালে প্রতিদিন পাঁচটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৬২ পয়সায় সুষম খাদ্য পাওয়া যেত। পুষ্টি, স্বাদ এবং দামের দিক থেকে এটা সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে—এমন কি কেরালাতেও, যেখানে অপুষ্টির হার দেশের মধ্যে সব থেকে বেশী।

এটা সুনিশ্চিত যে, যতদিন মহাকাশ যাত্রার মত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তী ও গাঁয়ে শহরের মত অনগ্রসরতার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সাধারণ ভাবে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় কার্য্যকর পন্থা হোল, দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা; সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি নয়—এডাম স্মিথও এর সঠিক সূচনা করেন নি। দারিদ্র্যের দূরীকরণে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে বৃত্তিদান ছাড়াও বিনামূল্যে সাধারণ এবং কারিগরী ধরণের শিক্ষাদান—দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে বৃদ্ধ, অসুস্থ, অক্ষম ও অভিভাবকহীন পরিবারকে উদার ভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। অন্যান্য আরো পরিচিত উপায় আছে, তবে তার সুষ্ঠু রূপায়ণ এখনও করা যায়নি। যেমন শ্রমিক ও কৃষকদের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা, অথবা সাধারণের প্রয়োজনে লাগে এমন দ্রব্যাদির উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়া, সমাজের বিত্তবান অংশের সুযোগ সুবিধা এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উচ্চ হারে বেতন দানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা, কার্য্যকর ও প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং উচ্চ নীচ ভেদাভেদ দূর করার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সম্পদের সুষম বন্টন প্রভৃতি।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যেসব দেশের সরকার প্রকৃত আগ্রহী, তাদের সুবিধার্থে, ১৯৬৭ সালে Arusiaতে, তানজানিয়ার কার্য্যনির্বাহক কমিটিতে গৃহীত এক প্রস্তাবে আদর্শ আচরণ বিধি নির্ধারণ করা হয়েছে; তাতে বলা হয়েছে, কোন সরকারী নেতা কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন না, একাধিক বেতন গ্রহণ করতে পারবেন না, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হতে পারবেন না এবং নিজস্ব বাড়ী থাকলে তা অন্যকে ভাড়া দিতে পারবেন না। সরকারী নেতাদের মধ্যে মন্ত্রী, সংসদসদস্য, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কাউন্সিলার এবং উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধান পদক্ষেপ হোল, জনগণের মধ্যে জীবন ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের মানের পরিবর্তন ঘটানো।

সমস্ত দিক দিয়ে যদি সাধারণের কল্যাণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তাহলে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে, যে কোন রাষ্ট্রেই, দারিদ্র্য নির্মূল করার কার্য্যসূচী রূপায়ণের জন্য অবিরাম এবং গতিশীল প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

৯ পৃষ্ঠার পর

## চাষীকে জমি দিতে হবে

হবে। অর্থাৎ, একদিক দিয়ে নয়, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সূত্রে জমির হিসাব নিয়ে মেলাতে হবে, তবে মিথ্যা ও বেনামী জমি ধরা পড়বে। এটাই আইনের দ্বারা সম্ভব।

যাদের কৃষি বা জমি প্রধান অবলম্বন নয় এবং অন্যভাবে পর্য্যাপ্ত অর্থোপার্জন হয় তাদের সিলিং তথা জমি রাখার উচ্চসীমা ঐ বাইরের তথা অন্যভাবে আয়ের অনুপাতে কমিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, ধরা যাক, 'সিলিং' জমিতে বার্ষিক গড়ে তিন হাজার টাকা নিট আয় হবে। তাহলে যার বাইরের আয় দু হাজার টাকা হবে তাকে আরও এক হাজার টাকা আয়ের উপযোগী জমি রাখার অধিকার দিতে হবে তার বেশী নয়। অথবা, যার বাইরের আয় তিন হাজার বা তার বেশী, তবে তার কোন জমি রাখার অধিকারই থাকবে না। জমি জীবিকার্জনের অবলম্বন ও জাতীয় সম্পত্তি। সরকারী কর্মচারীরা যেমন প্রাইভেট আর কোন চাকরি করতে পারে না, তেমনি জমির স্বত্বভোগ করলে জীবিকার্জনের বা অর্থোপার্জনের অন্য কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে পারবে না। অথবা, যারা অন্যপথে অর্থোপার্জন করে এবং সেটাই প্রধান তারা জমির স্বত্বভোগ করতে পারবে না। এটাই ন্যায় ও নীতি সঙ্গত।

২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র
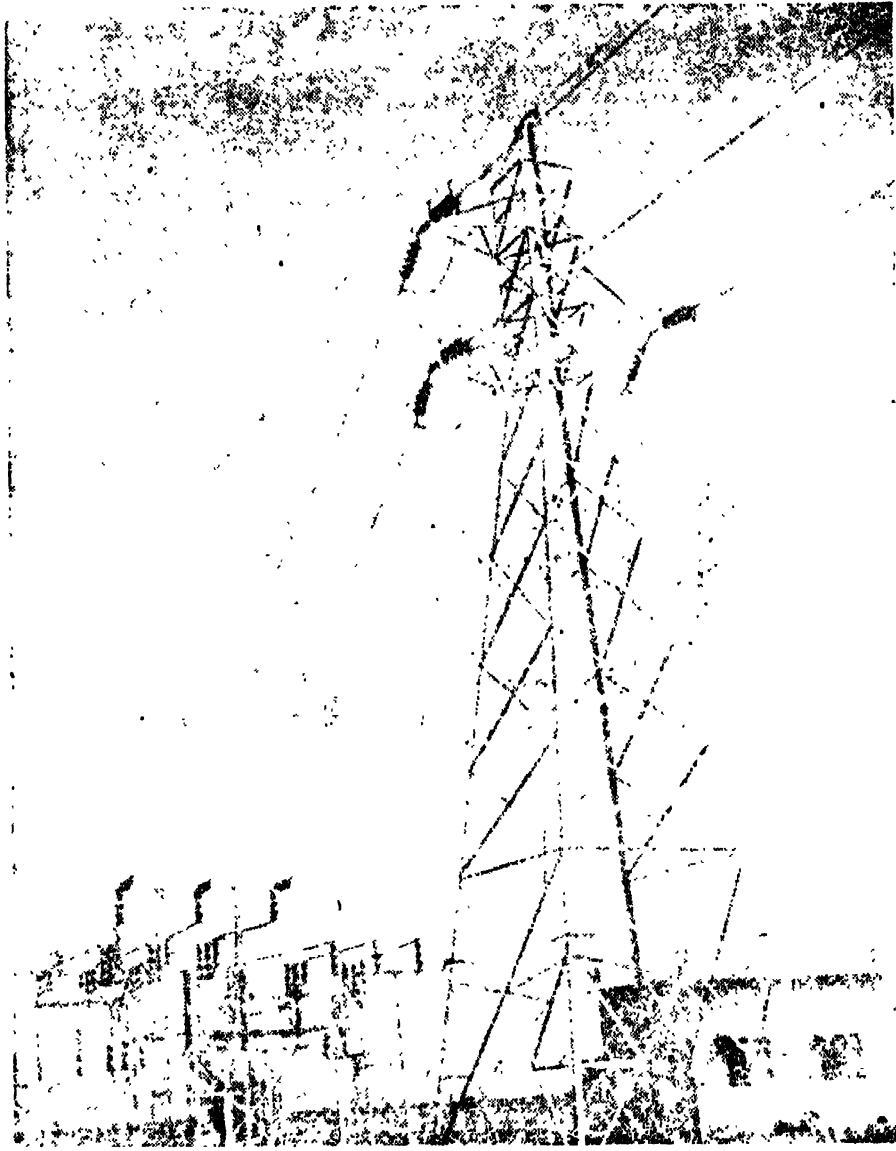
# গ্রাম বৈদ্যুতিকরণে

## পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলা

শ্রী তাপস রঞ্জন দাস

বোঝা যায় দেশ বেশ কিছুটা প্রগতির দিকে এগিয়েছে। তা না হলে গ্রামে গ্রামে চাষীরাই বা অবিলম্বে বিদ্যুতের সুযোগ সুবিধা চাইবে কেন? গ্রাম ঘুরে দেখেছি—এ চাহিদা সর্বত্র। দীর্ঘ দিনের কুসংস্কার মুক্ত এরা। আজ দেখে জেনেছে, ঠেকে শিখেছে। দেখেছে বিদ্যুৎ ব্যবহারে কি পরিমাণ ফসল বছরে কতবার একই জমিতে উৎপাদন করা যায়। চাষ আবাদে বর্ষার জলের ভাবনা আর তাদের বিশেষ বিচলিত করে না। হাতের কাছেই আছে বিদ্যুৎ চালিত নলকূপ।

ভাবতেও পারিনি চব্বিশ পরগণায় বসিরহাটেই চাষী জামসেদ আলির কথায় সেদিন নিরুত্তর থাকতে হবে। কথায় কথায় জামসেদ বলেছিলেন, কলকাতার সব জায়গাতেই কেমন বিজলীর আলো—চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম। অথচ এ শহরটির গা ঘেসে থেকেও তাঁরা বিদ্যুতের সামান্য সুযোগ সুবিধা ভোগে বঞ্চিত। সেইটাই আপসোসের কথা। তবে সেই ক্ষোভ যে জামসেদের আজ আর নেই, তাও জানলাম। তাঁর গ্রামে শীঘ্রই বিদ্যুৎ সরবরাহের জোড় জোড় চলছে। তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হতে বেশি দেরী নেই। বছরে এ যাবৎ তিনি একটি মাত্র ফসল (আমন ধান) পেয়ে এসেছেন; আরও দুটি ফসল সেই একই জমিতে ফলাবার তাঁর সুযোগ আসছে। সত্যিই চব্বিশ পরগণার ৩৮১০টি গ্রাম ও মৌজায় পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সরকার কয়েকটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এ জেলার দুটি মহকুমা-বিশেষ করে সমগ্র ব্যারাকপুর ও আলিপুর সদরের কিছু অংশ—শিল্পাঞ্চল বলে বিদ্যুৎ সরবরাহের বেশকিছু ব্যবস্থা এখানে অবশ্য রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মহকুমার শহর এলাকাগুলিতেও বিদ্যুতের সুযোগ সুবিধা ছিটে ফোঁটা চোখে পড়ে। তবে তা' মুষ্টিমেয় লোক ও ন্যূনতম এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের কথা। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ নিগমের পত্তন হয়নি। চব্বিশ পরগণা জেলায় বিদ্যুৎ আছে তখন এমন গ্রাম বা মৌজার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৭৪। এর পর থেকে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ালো ৪১৮ এ। চিত্রটি নিশ্চয়ই উৎসাহের সঞ্চার করেনা, কারণ

শতকরা হিসেবে সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১০.৯৭ আশ্চর্য হবারই কথা, কারণ এটিই কলকাতার সবচেয়ে নিকটবর্তী জেলা। চব্বিশ পরগণা পেরিয়ে প্রথম যে জেলা পড়ে, সেই নদীয়াতেও তখন এর শতকরা হিসেবে ছিল ১১.১০।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্রুত প্রসার ঘটাতে ইতিমধ্যে গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ নিগম স্থাপিত হয়েছে। এর কাজ হ'ল বিভিন্ন রাজ্যের বৈদ্যুতিকরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে অর্থের সংস্থান করা। এর পরই সুরু হয় দেশজুড়ে গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের এক বিরাট কর্ম যজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিও এর আওতাভুক্ত হ'ল।

এদিকে চব্বিশ পরগণার গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের জন্যে এক সমীক্ষা ইতিপূর্বেই সারা হয়েছে। শিল্পকেন্দ্রিক বারাকপুর মহকুমা ও আলিপুর সদরের শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা মোটামুটি থাকায় এসব জায়গায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে যে সমস্ত অঞ্চলে গুরুত্ব দিতে চাইলেন, সেগুলি হল—বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমা, তাছাড়া বারাসাত মহকুমা, আলিপুর সদর মহকুমার গ্রামাঞ্চল এবং বিস্তৃত সুন্দরবন এলাকা সহ ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা।

সমগ্র চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে চারটি পৃথক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই চারটির মধ্যে তিনটিই বর্তমানে গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ নিগমের অনুমোদন লাভ করেছে, সেই সঙ্গে পরিকল্পনাগুলির জন্যে অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই চারটি পরিকল্পনার প্রথমটিতে হাবড়া-বনগাঁ-গাইঘাটা-স্বরূপনগর চারটি থানা এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রায় দু বছর হল, গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ নিগম এই পরিকল্পনা বাবদ ৫৪.৫৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্ত এলাকার যথারীতি কাজও এগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলকে নিয়ে। বিদ্যুৎ পর্ষদের এই বিশেষ পরিকল্পনাটিতে ১৩টি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ নিগম কর্তৃক অনুমোদিত এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্য ৯১.৬৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। বর্তমানে পরিকল্পনাটির কার্যক্রম অনুসারে কাজ করার তোড় জোড় চলছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাটির মধ্যে রয়েছে বারুইপুর-সোনারপুর-বিষ্ণুপুর তিনটি থানা এলাকা। এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭১.৭৬ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত পরিকল্পনাটির জন্য অর্থ মঞ্জুর হয়েছে মাত্র দু'মাস হল।

চতুর্থ পরিকল্পনার আওতাভুক্ত বজবজ ফলতা-ডায়মণ্ডহারবার তিনটি থানা এলাকার বৈদ্যুতিকরণের খসড়াটি উক্ত নিগমের কাছে দীর্ঘকাল হল পেশ করা হয়েছে। এতে ব্যয়ের অঙ্ক ধরা হয়েছে ৮২.২৬ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনাটি এখনও অনুমোদন লাভ করেনি তবে শীঘ্রই করবে বলে পর্ষদের আশা।

কাজ কতটা এগিয়েছে, তার কিছুটা আভাস দেওয়া যাক। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ জেলায় বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা ৫৭৪। এর মধ্যে ১৯৭০-৭১ সালে মাত্র ৩৪টি মৌজাকে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়; তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে ৭৩টি মৌজা এবং একমাত্র এই এপ্রিল মাসেই ১১টি মৌজায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি অনুযায়ী বৈদ্যুতিকরণের গতির হার কিছুটা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

এ জেলার বৈদ্যুতিকরণের জন্য এই যে পরিকল্পনা, তার প্রতিশ্রুতি কি? কাজের সময় সূচীত ধরা হয়েছে মাত্র পাঁচটি বছর। ঠিক করা হয়েছে এ সময়ের মধ্যে এক হাজারের মত মৌজাকে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে। এ ছাড়া এ সময়ের মধ্যে ৩ হাজার নলকূপে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ আবাদে জল সেচের সুবিধা করে দেওয়া এবং প্রায় ৫০ হাজার গৃহে বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছে দেবার কথাও এই চারটি পরিকল্পনাতে প্রস্তাবিত হয়েছে।

তবে বর্তমানে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যের দশ হাজার মৌজাকে বৈদ্যুতিকরণ করতে হলে, এই জেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি তাদের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এতে পরিকল্পনার কিছু রদবদল হওয়াও সম্ভব। তাতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঐ কাজগুলি শেষ করে এ জেলার আরো নতুন নতুন মৌজাকে বৈদ্যুতিকরণের আওতাভুক্ত করার সুযোগও আসতে পারে।

## পটাশ প্রয়োগে তামাকের ভালো ফলন হয়

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, হেক্টার প্রতি ১০০ থেকে ২০০ কেজি: পটাশ প্রয়োগে তামাকের গাছ ভালোমত বেড়ে ওঠে আর উৎপাদনও হয় উঁচু।

পটাশিয়াম সালফেটের মাধ্যমে পটাশ সমমাত্রায় দু'বার দিতে বলা হয়েছে। মোট পটাশের একভাগ গাছ পোঁতার আগে আর বাকী ভাগ গাছের শিকড় শক্ত হওয়ার পর।

তামাক চাষে পটাশ কম হলে গাছের পাতা কুঁচকে গিয়ে তার চারপাশ [illegible] হয়ে যায়, ফলে তামাক পাতার মান হয় খুব নীচু স্তরের।

# ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশ পরিস্থিতি, ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ ও তার দরুণ উদ্ভূত সমস্যাবলীর ব্যাপকতা সত্ত্বেও ১৯৭১-৭২ সালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বলা চলে। ১৯৭০-৭২ সালে রপ্তানির দরুণ আমাদের আয় হয়েছিল ১৫৩০ কোটি টাকা। সে জায়গায় গত বৎসর বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৬২০ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ সালে রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.১, ৮.৩, এবং ৬ ভাগ। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৭০-৭১ সালকে এক গৌরবজনক বৎসর বলে অভিহিত করা চলে। এই বৎসরই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৭.৬ কোটি টাকা। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কোন সময়েই ঘাটতির পরিমাণ এত কম ছিলনা। এই উন্নতির হার পরবর্তি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে বজায় রাখা যায়নি, ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। এর কারণ হল ডলারের মূল্য হ্রাসের ফলে গত বৎসর আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং আমেরিকা ও অন্যান্য কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপনের ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য কথঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি, ইস্পাত উৎপাদনে ঘাটতি ও খনিজ লোহার রপ্তানি হ্রাস প্রভৃতি নানা প্রকার কারণেও রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতকগুলি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে রপ্তানি সম্পর্কিত ভারত সরকারের নীতি ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে লোকসভায় উত্থাপিত রপ্তানি নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটিতেই বিধৃত আছে। বর্তমান ব্যবস্থায় রপ্তানি শিল্পগুলিকে লাইসেন্স ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির রপ্তানি সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় সাহায্য করবার জন্য ভারত সরকার রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Trade development authoirty) গঠন করেছেন। শিল্প লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থাগুলিকে ভারি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশ করা, শিল্পের আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে এই কর্তৃপক্ষ নানা প্রকার সাহায্য করে থাকেন। সম্প্রতি এই কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০০০টি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থার একটি সমীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন যে এর মধ্যে অন্ততঃ ২২৫টির প্রভূত উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারলে রপ্তানি যোগ্য দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বিস্তৃত কর্মসূচীও গ্রহণ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State trading corporation) ও মিনারেলস ও মেটালস ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি বড় অংশ গ্রহণ করছে। রপ্তানি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনমত ভারত সরকার আরও বহু সংস্থা গঠন করেছেন, যেমন কাজু কর্পোরেশন, পাট কর্পোরেশন, চা কর্পোরেশন তুলা কর্পোরেশন এবং প্রজেক্ট এণ্ড ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি। রপ্তানির ব্যাপারে নানা প্রকার সাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান এই সংস্থাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া সবসমেত ১৯টি রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (export promotion council) গঠিত হয়েছে। এই পরিষদগুলির প্রধান কর্তব্য হল রপ্তানি শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা দান, রপ্তানি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং রপ্তানি পণ্যগুলির গুণগত উৎকর্ষ ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার ব্যাপারে সাহায্য করা।

যে কোন দেশেরই শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিতে রপ্তানি বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। আজকের দিনে আমাদের এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে, রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধি ছাড়া বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়, এবং বৈদেশিক সাহায্যের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হলেও রপ্তানি বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাছাড়া রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি মানেই হল দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক পরিব্যাপ্তি এবং ক্রমশঃ বেকারী দূর করবার পথে এক আকাঙ্খাজনক পদক্ষেপ।

৪ পৃষ্ঠার পর

## উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা

৪০৭০ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করা যায় কিনা। শতকরা ৩০ ভাগ লোকের আয়, গড় জাতীয় মানের দ্বিগুণ। গড় আয়ের ওপরে, এর পরিমাণ হবে ৩৩০০ কোটি টাকা। এই সমুদয় অর্থ, দারিদ্র্য স্তরের নীচে রয়েছে, এমন শ্রেণীর জনগণের জন্য যদি ধরা হয় তবুও ঘাটতি রয়ে যাবে। পুনর্বন্টনের ফলে মাত্র ৫০ শতাংশ এর আওতাভুক্ত হবে। কাজেই এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সমস্যার কেবলমাত্র আংশিক সমাধান করা যাবে।

পঞ্চম পরিকল্পনার চিন্তা পঞ্চম পরিকল্পনাকে নিম্নলিখিত পটভূমিকায় বিচার করতে হবে। (১) সঞ্চয়ের আনুপাতিক হার হ্রাস পাওয়া। (২) নীট প্রকৃত সাহায্য না পাওয়া। (৩) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়া। (৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগত পরিবর্তন এবং সঞ্চয়ের ওপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। (৫) মূলধনী বাজারে নতুন বিনিয়োগের গতি মন্থর হওয়া। (৬) সরকার রিজার্ভ, ব্যাঙ্ক এবং সরকারী ব্যাঙ্কের সাহায্যপুষ্ট আর্থিক সংস্থাগুলির ওপর অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অত্যাধিক নির্ভরশীলতা। (৭) ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও দ্রব্য সামগ্রী মজুদ রাখার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা। (৮) মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্চয়ের অনুপাত না বাড়া। (৯) জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্ধগতি প্রভৃতি।

অনুকূল বিষয়গুলি হোল :—(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার বেশী হওয়া। (২) অধিকাংশ দেশে সমজাতীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এর জন্য আশু করণীয় হোল সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। প্রাপ্ত সহায় সম্পদের ওপর ভিত্তি না করে পরিকল্পনা রচনা—বিপদজ্জনক।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যসূচীর সঙ্গে উন্নয়নের একটা সামঞ্জস্য রাখা দরকার। মাথাপিছু প্রকৃত আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রারম্ভিক নথিপত্রে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা এবং সম্পদ হ্রাস পাওয়ার প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া আর একটি ত্রুটি হোল, অনুৎপাদনশীল প্রকল্পের ওপর সম্পদ অধিকতর কেন্দ্রীভূত হওয়া। এমন কি কল্যাণমূলক কাজেরও একটা অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং তা উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের একটা অংশ দখল করে। কাজেই উৎপাদনী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে নীট উৎপাদন এবং আবশ্যিক বেসরকারী এবং সামাজিক ভোগের ব্যবধানের ওপর।

সুতরাং সঞ্চয় বাড়ানো এবং ব্যয় বরাদ্দের গঠন প্রকৃতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির বিষয়ে গুরুতর ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মূল গলদ হোল, সঞ্চয় ও মূল বিনিয়োগের মধ্যে ফাঁক থেকে যাওয়া। এই ত্রুটি যদি সংশোধন না করা যায়, তাহলে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য যত মহৎই হোক না কেন, দারিদ্র্য জনগণের কাছে তা অকিঞ্চিৎকরই থেকে যাবে। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে এসেছে।

৬ পৃষ্ঠার পর

## পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার পথে

মূল জনগণের ওপর আরও করের বোঝা এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, যা যোজনাকালে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির মূল্যমান স্থিতিশীল রাখবার উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে। তাই দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে। ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাৎ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শূণ্য অবস্থায় নিয়ে আসবার যে লক্ষ্য আছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের বর্তমান ধরন দেখে মনে হয় যে আমরা ঐ লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হব।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, খসড়া প্রস্তাবনাটি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কিন্তু সাফল্য কি পরিমাণে লাভ করা যাবে তা বেশীর ভাগই নির্ভর করছে পঞ্চম যোজনার জন্য বিস্তারিতভাবে পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের ওপর। রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে এবং স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ সম্পদ বিনিয়োগের ব্যাপারে খসড়া প্রস্তাবনায় এমন নমনীয়তা দেখানো হয়েছে যে মোটামুটিভাবে সেগুলি বৃহত্তর পরিকল্পনার কাঠামোর অন্তর্গতই থাকবে। এই দিক দিয়ে এই প্রস্তাবনায় এক নতুন ধরনের পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপক বেকার সমস্যার ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটাবে।

# এক উপজাতি গ্রামের কৃষি ব্যবস্থা

পরেশ চন্দ্র দত্ত

অরুণাচল প্রদেশের সীয়াং সীমান্ত জেলার সদর আলং শহরের কাছে পাকাম হোল একটি ছোট্ট উপজাতি গ্রাম। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই গ্রামটির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন গ্রামে দেখা যায় না। এই গ্রামটি সমুদ্রপিষ্ঠ থেকে খুব বেশী উঁচু নয়। সেই কারণে এর জমি বেশ উর্বর, ঢালুও কম এবং অন্যান্য গ্রামের মত শিলাময় নয়। সম্প্রতি কয়েক বছর এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থায় বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং তাঁরা উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার কোরছেন।

উত্তর পূর্ব ভারতের সারা পার্বত্য এলাকায় যে সব উপজাতি বসবাস করেন তাঁরা সাধারণতঃ চাষের জায়গা পরিবর্ত্তণ করেন। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় ঝুম। উত্তর পূর্ব ভারতের সারা পার্বত্য জাতি এ প্রথায় চাষ কোরতে অভ্যস্ত। ঝুম অর্থনীতির ভিত্তি হোল—আংশিকভাবে অপরিণত কৃষি ব্যবস্থা এবং আংশিকভাবে পশু হাঁস, মুরগী পালন এবং বয়ন। পাকামের অধিবাসীগন কিন্তু একই সঙ্গে স্থায়ী এবং পরিবর্ত্তণশীল কৃষি কার্য্য চালাচ্ছেন।

সাধারণতঃ ঝুম জমির ওপর উপজাতীদের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব নেই। সেই কারণে তাঁরা এক ঝুম জমি থেকে অপর এক ঝুম জমিতে উঠে যান। সমষ্টির মালিকানা স্বত্বে ঝুম জমিতে ভাল চাষ হয়; সেই কারণে পরিবারের ক্ষমতা অনুসারে যে কোন পরিমাপ জমিতে তাঁরা চাষবাস কোরতে পারেন। উপস্থিত ঝুম ব্যবস্থাকে ভাল চোখে দেখা হয় না। কারণ এর ফলে ভূমি ক্ষয় হয় এবং বনজ সম্পদও নষ্ট হয়। অরুণাচল প্রদেশের উপজাতি গ্রামগুলির মত পাকামের অধিবাসীগণ কিন্তু তাঁদের খামারের সঙ্গে সঙ্গে বসত ভিটা সরিয়ে নিয়ে যান না। এর কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত এবং আংশিকভাবে তাঁরা স্থায়ীভাবে চাষ বাসের পদ্ধতি মেনে নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব নেই বলেই তাঁরা এক জায়গা থেকে সরে গিয়ে অন্য এক জায়গায় চাষবাস শুরু কোরতেন। এটা এখন স্বীকৃত যে কেবল উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থা অথবা উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করলেই ভাল ফসল হয় না—ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও একান্ত প্রয়োজন। এতে ব্যক্তিগত কর্মোৎসাহ বৃদ্ধি পায়; ফলে কাজ অনেক ভাল হয় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কমলা লেবু, আনারস, লেবু, আপেল, কলা ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সময়কালে এই সব ফল উৎপাদনই উপজাতীয়দের স্থায়ী আয়ের পথ হবে এবং আস্তে আস্তে ঝুম ব্যবস্থা লোপ পাবে। কারণ ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব স্বীকৃত হওয়ায় পাকামে কিছু কিছু কৃষক এই সব ফল উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছে।

পাকামের অধিকাংশ পরিবার এখন অল্পবিস্তর স্থায়ী চাষবাস শুরু করেছেন। ১৯৬৯ সালে ৮টি পরিবার উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন ৬ একর জমিতে। আর তাতে উৎপাদন হয় একর প্রতি ৩০ মণ। পাহাড়ের মধ্যে একটি উপজাতীয় গ্রামের পক্ষে এই উৎপাদন খুবই ভাল বলতে হবে। অবিশ্যি প্রশাসন ব্যবস্থা তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেন, প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সরবরাহ করেন।

এই সব এলাকায় একই জায়গায় স্থায়ীভাবে ধান চাষ করা নেহাৎ সোজা কাজ নয়। এরজন্যে পাহাড়ের ঢালু এলাকাগুলিকে চত্বরে পরিণত কোরতে হয়। আবার চত্বরে চাষ কোরতে হলে চাষের ধরণও পাল্টাতে হয় এবং তারজন্যে খরচও কিছু বেশী হয়। পাকামের চত্বর ভূমি ছাড়াও, কিছু কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যেকার নিম্ন এলাকাগুলিও কাজে লাগাচ্ছেন। এই সব ধান ক্ষেতে সেচের জন্যে ব্যবহার করা হয় স্রোতস্বতীর জল।

স্থায়ীভাবে চাষবাস করার দরুণ গ্রামের অধিকাংশ পরিবার খাদ্যের বিষয়ে স্বাবলম্বী এবং কেউ কেউ উদ্বৃত্ত খাদ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয় কোরতে সক্ষম। মনে হয় গ্রামবাসীদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি ঋণ এবং সময় মত বীজ সার, কীটনাশক দ্রব্য ইত্যাদি সরবরাহ কোরতে পারলে, গ্রামে এবং গ্রামের চারপাশে স্থায়ীভাবে চাষবাস বৃদ্ধি পাবে। কৃষি বিভাগের উদ্যোগে কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী কমলা লেবু, আপেল, আনারস, লেবু ইত্যাদি ফল উৎপাদনে অগ্রণী হয়েছেন। কিন্তু যে পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয় সে হিসেবে স্থানীয় চাহিদা নেই বল্লেই হয়। বিক্রির একমাত্র বাজার হোল—সদর আলং। একমাত্র আলং এই-তাঁরা তাঁদের কৃষি উৎপাদন বিক্রি কোরতে

## উপজাতি

( ১৬ পৃষ্ঠার পর )

পারেন। উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এই সব ফল মূল তাঁরা বাইরের বাজারে পাঠাতে পারেন না। ১৯৬৯ সালে অনেক প্রগতিশীল কৃষক একটি ফলের বাগান করে প্রায় ২ হাজার আনারস উৎপন্ন করেন। কিন্তু চাহিদা না থাকায় তাঁর উৎপাদন খরচও ওঠেনি। ফলে কৃষকটি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। এই সব ফলের জন্যে হয় একটি ভাল বাজার সৃষ্টি অথবা প্রোসেসিং-এর জন্যে ব্যবস্থা কোরতে পারলে, উপজাতীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই সাহায্য হবে সন্দেহ নেই। বহু উপজাতি কৃষক এখন ফলমূল উৎপাদনে অগ্রণী হয়েছেন সুতরাং এই এলাকায় ফল প্রোসেস্ করার জন্যে একটি ইউনিট স্থাপন কোরতে পারলে তা লাভজনকই হবে।

এই সব পার্বত্য এলাকায় উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা এবং সুগঠিত বাজারের বন্দোবস্ত না থাকায় কৃষিকার্য্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। বর্ষকালে জমিগুলি এবং বন্ধুর জমির জন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। উপজাতীয় জনগণের চাহিদা খুবই কম—খাদ্য ও পোষক পরিচ্ছদ। এ দুটিই তাঁরা নিজেরাই তৈরী করে নেন। এ ক্ষেত্রে কোন ভাল স্থানীয় বাজার সৃষ্টি সম্ভব নয়; তবে সরকার এর একটা বিহিত কোরতে পারেন। তাঁরা এই সব ফল এবং অন্যান্য কৃষি উদ্বৃত্ত ন্যায্যমূল্যে উপজাতীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে, সমতল ভূমিতে অবস্থিত বাজারে চালান দিলে ভাল দাম পাবেন। এরদ্বারা কৃষক ও সরকার উভয়েই উপকৃত হবেন এবং উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ঝুম জমিতে স্থায়ীভাবে ফলের বাগান কোরতে উৎসাহ দিলে উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থায় অনেকটা স্থিতিশীলতা দেখা দেবে। এটা কোরতে হলে, সরকারকে প্রথমে উপজাতীয়দের সস্তা দরে প্রধান প্রধান দানা শস্য যেমন চাল, ভুট্টা ইত্যাদি সরবরাহ কোরতে হবে।

অরুণাচল প্রদেশের অধিকাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন সিক্কার চলন হয়েছে। জিনিষ পত্র দিয়ে বিনিময় ব্যবস্থা এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে। এঁদের চাহিদা কম এবং টাকার চলন হওয়ায় জনগণ সঞ্চয় কোরতে উৎসাহিত হবেন—বিশেষ করে একসঙ্গে যখন অনেক টাকা পাবেন। তাঁরা যদি দেখেন যে ফলের বাগান থেকে বেশী টাকা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আরও বেশী টাকা বিনিয়োগ কোরে উৎপাদন বৃদ্ধি কোরতে তাঁরা নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনে সামান্য অর্থই তাঁরা ব্যয় কোরবেন। উপজাতীদের মধ্যে যদি সঞ্চয়ের অভ্যাস আনা যায় তাহলে তাঁদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কাজ অনেক সহজ সরল হয়ে উঠবে।

পাকামে একজন গ্রামবাসী বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস চাষ কোরছেন। ১৯৬৯ সালে তিনি তিনটি পুকুর নিয়ে এই কাজ শুরু করেন। পার্বত্য অঞ্চলে মৎস চাষ অবশ্য এক কঠিন কাজ। পাকামে কিন্তু এ অসুবিধা নেই। সরকার যদি এক্ষেত্রে জনগণকে সাহায্য করেন তাহলে মৎস চাষও একটি ভাল ব্যবসায় পরিণত হবে। এবং এ থেকে ভাল আয়ও হবে। অধিকাংশ উপজাতি শুকর, মুরগী ইত্যাদি পালন করেন নিজেদের ব্যবহারের জন্যে। তাঁদের যদি বাণিজ্যিক পর্য্যায় পশু ও মুরগী ইত্যাদি পালনে উৎসাহ দেওয়া যায় তাহলে সেটাও কম লাভজনক বিষয় হবে না। আর এই সব জিনিষের চাহিদাও খুব বেশী।

মহিলাদের মধ্যে তাঁতের অথবা হাতে বোনার কাজ বেশ প্রচলিত। তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছদ নিজেরাই বুনে নেন। ঝুমের চাষের শ্রমিকের প্রয়োজন খুব বেশী। সেই কারণে মহিলাদেরও সেখানে কাজ কোরতে হয় এবং তাঁরা পুরুষদের চেয়ে বেশী কষ্ট করেন। সেই কারণে মহিলাদের হাতে বিশেষ কোন সময় বাঁচে না যা তাঁরা বোনার কাজে লাগাতে পারেন। ঝুম প্রথা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাঁরা অবিশ্যি অনেক সময় হাতে পাবেন এবং বোনার কাজে লেগে অনেক পয়সা রোজগার কোরতে পারবেন।

## পরিবার পরিকল্পনা

কেরল, তামিল নাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে জন্মহার, চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা হাজার প্রতি ৩২—এরও নীচে নেমে গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রকের ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে একথা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে মহীশূর, পাঞ্জাব, অন্ধ্র প্রদেশ এবং ওড়িশায়ও জন্মহার আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং বর্তমান হার যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী বছরে চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছন সম্ভব হবে।

৯ কোটি ৩০ লক্ষ দম্পতির মধ্যে এক কোটি ২৪ লক্ষেরও বেশী দম্পতিকে অবাঞ্ছিত শিশু লাভের হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। ৮৬ লক্ষ ব্যক্তি নির্বীজ করণের পক্ষপাতি, ১৫ লক্ষ আই ইউ সি ডি ব্যবহার পছন্দ করেন এবং ২২ লক্ষ ব্যক্তি প্রচলিত নিরোধ ব্যবহারের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সূচী যদি চালু করা না হোত তাহলে আরও ৯৪ লক্ষ ব্যক্তির খাদ্য সংস্থান কোরতে হোত।
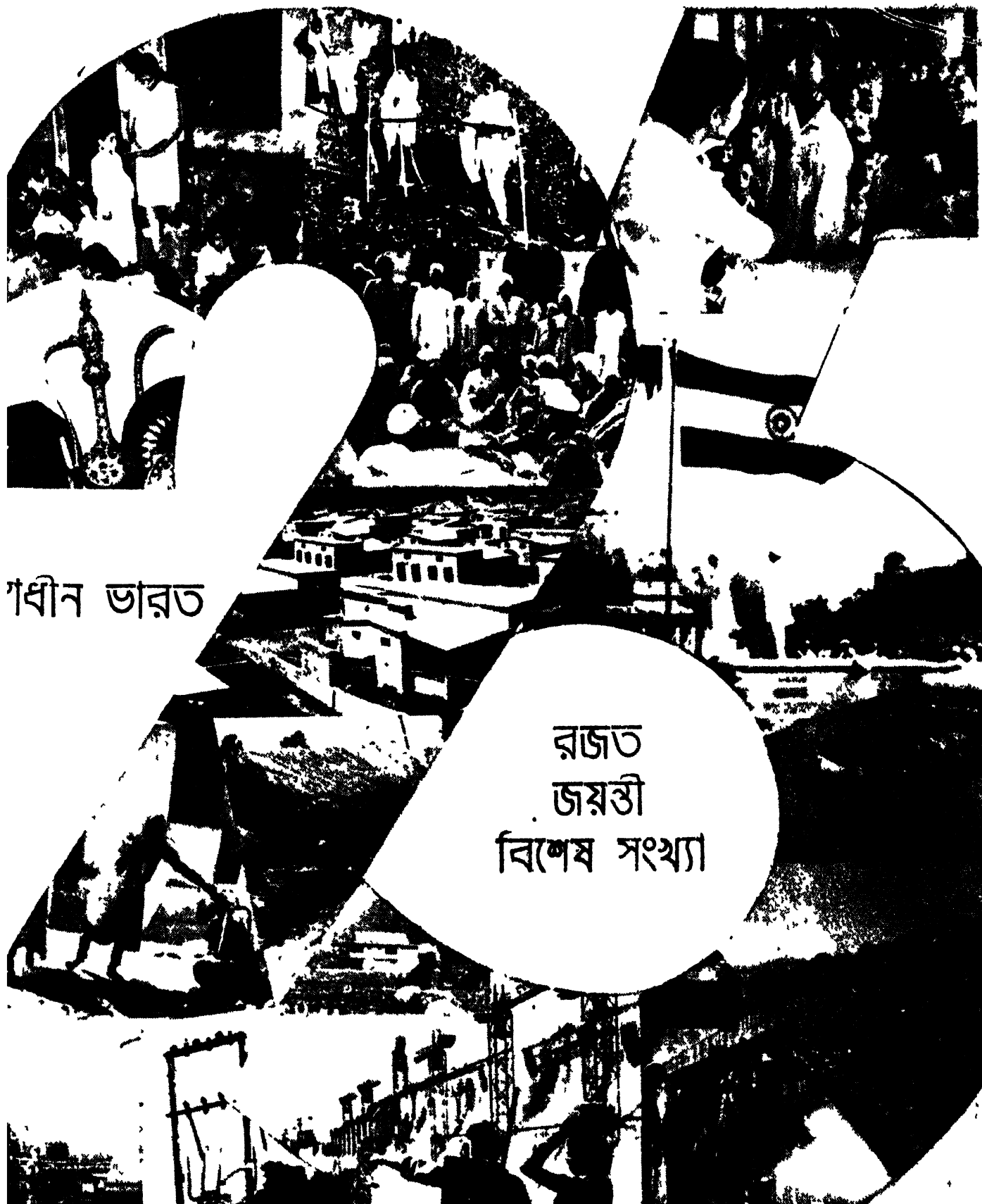
ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভীরেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কতৃক মুদ্রিত।

চতুর্থ বর্ষ ঃ ৫ ও ৬
১৫ই আগস্ট
২৫ পয়সা

# ধনধান্যে

পচিশ বছর পরে ১৪।১৫ আগষ্ট ১৯৭২ মধ্যরাত্রি অধিবেশন

পঁচিশ বছর আগে
১৪।১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ মধ্যরাত্রি অধিবেশন

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শপথ গ্রহণ কোরছেন। শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

স্বাধীন ভারতের সংবিধান স্বাক্ষর। চিত্রে সর্দার প্যাটেল, ডঃ জন মাথাই, রাজ কুমারী অমৃত কর প্রমুখ নেতৃবর্গকে দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীকে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেখা যাচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের অধিবেশন চলেছে শ্রী নেহেরুর সভাপতিত্বে।

# ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ : ২৪শে শ্রাবণ ১৮৯৪
Vol IV : No 5 6 : August 15 1972

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।



সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১
টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০
৩৮৫৪৮১/৪০২
টেলিগ্রামের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

## যুগবাণী

স্বাধীন ভারতবর্ষে নয়াদিল্লির সুরম্য প্রাসাদ ও দরিদ্র শ্রমিকের জীর্ণ কুটীর—এই দুই বিসদৃশ জিনিস এক দিনও থাকিতে পারিবে না।

—গান্ধীজী

# স্বাধীনতার ২৫ বছর

**সম্পাদকীয়**

আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে, এই দিনটিতে আমরা স্বাধীন হয়েছি। তাই, আজকের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী দিবসটি আমাদের কাছে বিশেষভাবে মধুর হয়ে উঠেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশীর অত্যাচারী শাসন আমাদের জাতীয় জীবনে এবং চরিত্রে বার বার মারণ আঘাত হেনেছে। সে দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। এই দিনটির স্মৃতি অবিমিশ্র আনন্দের নয়—তা সুখ ও দুঃখের। কেননা, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে দেশ বিভাগ এবং এই স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ লাঞ্ছনা, লুন্ঠন আর মৃত্যুকে এড়াতে পূর্বপুরুষের ভিটেবাটি ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ঠিকরে পড়েছে। এরফলে এসেছে আমাদের অর্থনীতিতে দারুণ বিপর্যয়। আনন্দের কথা, সে বিপর্যয় আমরা কাটিয়ে উঠেছি, আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি এক নতুন ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে—এক শোষণ এবং অভাব থেকে মুক্ত ভারতবর্ষ।

২৫ বছর একটা জাতির জীবনে এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। তবুও এ পঁচিশ বছরে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। কিন্তু এতে তৃপ্তির অবকাশ নেই। এখনও লক্ষ লক্ষ বহুবিধ সমস্যা আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে। আমাদের যাবতীয় সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে এবং সমস্যাগুলির গুরুত্ব বিচার করে সুপরিকল্পিতভাবে এগোনই হ'ল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

একটির পর একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়নের কাজে আমরা হাত দিয়েছি; প্রথম যোজনায় অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলাই ছিল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই এতে আমরা বেশী করে জোর দিয়েছি কৃষি, পরিবহন এবং সেচ ও বিদ্যুতের ওপর। দ্বিতীয় যোজনা ছিল মূলতঃ একটি শিল্প যোজনা। তার পর রূপায়িত হয়েছে তৃতীয় যোজনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা, আসন্ন ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সম্বলিত চতুর্থ যোজনার কাজ এখন রূপায়নের অবস্থায়।

কিন্তু এই যোজনা রূপায়নের কাজ একেবারে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। বিপদ দেখা দিয়েছে একাধিক বার। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণ, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫-৬৭ সালে একটানা খরা—এ সবের ফলে আমাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়নে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। নতুন করে নীতি নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে খাদ্যে স্বয়ংভরতা লাভের উদ্দেশে। নতুন নীতির রূপায়নে আমরা সফল হয়েছি। জাতির জীবনে এসেছে সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসের ভাব, ১৯৭১ সালের শেষের দিনগুলি তার প্রমাণ। আজ আবার খরা এবং খাদ্য উৎপাদনে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এবারও আমাদের নিজ শক্তিতেই এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে হবে।

বিগত দু'দশকে দেশীয় শিল্পে এক বিপ্লব ঘটেছে। কৃষিতেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সবুজ বিপ্লব। কিন্তু এর চেয়ে বড় বিপ্লব ঘটেছে আমাদের চিন্তা ধারায়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে। বাইরের জগতে ভারতীয় বলতে নিষ্ক্রিয় মরণশীল জীব বলে যে ধারনা প্রচলিত ছিল, সে ভুল ধারনা আমরা ইতিমধ্যেই ঘুচিয়ে দিতে পেরেছি। সত্যিই ভাবতে আজ অবাক লাগে, কত দ্রুত এবং কত ব্যাপকভাবে আমরা শিল্প, বিজ্ঞান কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আধুনিক কলাকৌশল, রীতিনীতির প্রয়োগ করতে পেরেছি।

বিগত ২৫ বছরে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক অনেক কিছু উল্লেখযোগ্য কাজকর্মই সমাধা করেছি। "ধনধান্যে" দেশের এই উন্নয়নের বাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু আজকের মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ আমাদের অতীতের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই আমরা চাই, আমরা কতটুকু পেয়েছি এবং আরও কতখানি আমাদের অবশ্যই পেতে হবে তা খুঁটিয়ে দেখতে এবং এ সম্বন্ধে সাধারণের মনে সঠিক ধারনা সৃষ্টি করতে।

এখানের এই স্বল্প পরিসরে ভারতীয় অর্থনীতির একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয় বা আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার সমালোচনামূলক এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই দেশের অর্থনৈতিক চিন্তার উদ্ভাবনে যাঁরা সাহায্য করেছেন বা দেশ যে বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সেই পরিবর্তন আনতে যাঁরা কোন না কোন দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন, এমন কিছু দায়িত্বশীল কৃতি ব্যক্তির রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। সব সময় এই লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে যদিও আমরা একমত

হতে পারিনি, তবুও তাদের লেখা যথাসম্ভব অক্ষত অবস্থায়ই আমরা প্রকাশ করছি এই আশায় যে, এর দ্বারা লেখক ও পাঠকের মধ্যে এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খ্যাতিমান বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আমাদের সংবাদদাতাদের সাক্ষাৎকারগুলি আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করছি। তাঁদের সঙ্গে আমরা অনেক ক্ষেত্রে একমত নই, তবুও এগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে এই আশায় যে, এর দ্বারা আমাদের নীতি ও কর্মসূচী সম্বন্ধে দেশে গঠনমূলক চিন্তা ও বিতর্কের সূচনা হতে পারে।

পঞ্চম যোজনার ভাবনা চিন্তা ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশের প্রায় ২২ কোটি মানুষ এখনও জীবন ধারনের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনগুলি পান না। 'পঞ্চম যোজনার ভাবনাচিন্তা' শীর্ষক লেখাটিতে (১৫ই জুলাই পৃষ্ঠা ৪)এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই লেখাতে আরও আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই ২২ কোটি মানুষের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনগুলির ব্যবস্থা করতে আরও ৫০ বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরে দেশের এই বিরাট জনসংখ্যার দারুণ দারিদ্র্যের কোন সমাধান হবে না, এ কথা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না।

নূন্যতম প্রয়োজনের প্রাথমিক জিনিষগুলি হ'ল—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এ ছাড়াও শিক্ষা, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, ভূমিহীন ও বস্তিবাসীদের জন্য গৃহ নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও এই নূন্যতম প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এ যাবৎ রূপায়িত সমস্ত পরিকল্পনা ও বিশেষ কর্মসূচী ইত্যাদির দ্বারা আমাদের মুখ্য সমস্যা ব্যাপক দারিদ্র্যের, আর কোন উল্লেখযোগ্য সুরাহা হয় নি। তাই আজ আমরা এক নতুন নীতি ও কৌশলের সন্ধানে ব্যস্ত। আশা করা যাচ্ছে, পঞ্চম যোজনার খসড়া আমাদের এ ব্যাপারে নতুন পথের সন্ধান দেবে।

শান্তি নিকেতনে গুরুদেব ও গান্ধীজী

# গ্রাম বাংলার পঁচিশ বছর

অশোক মিত্র
(সচিব, পরিকল্পনা কমিশন)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তিরোধানের সঙ্গে বাঙালী জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের অবসান হল বলা যায়। তারাশঙ্করের মহৎ ও কালব্যাপী কীর্তিই বোধ হয় বাঙালীর মনে গ্রাম বাংলার মানস বা ধ্যানমূর্তি বিশেষভাবে সুদৃঢ় করে। মনে মনে অনেকের তত্ত্বগত বা রুচিগত আপত্তি থাকলেও গ্রামবাংলা শব্দটি তারাশঙ্করের সৃষ্টির পথ বেয়ে সঙ্গোপনে বাঙালীর মন অধিকার করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গীতাঞ্জলীর ভূমিকায় ইয়েটস্ সতৃষ্ণ খেদ করে বলেন, বাংলাদেশের মাঠেঘাটে নদীর বুকে বাঙালী চাষী, তাঁতি, মাঝি যেমন রবীন্দ্রনাথের গান গায়, তাঁর আয়র্লাণ্ডে তেমনটি সম্ভব নয়। শিক্ষিত মহাশিক্ষিত কবির চিন্তায় কল্পনায় জীবন-দর্শনে সকলেরই এমনকি ইতরজনেরও, অনায়াসে অংশ গ্রহণ সম্ভব; কোনও ব্যাঘাত হয় না, বাংলা সংস্কৃতির এই একত্বকার ইয়েটস্ খুবই বিস্মিত হন।

অনুমান ১৮২৫ সাল থেকে বাংলাদেশে, গ্রামে এবং শহরে সর্বত্র, যে নিম্ন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির জোয়ার সারা বাঙালী সমাজে দ্রুত ব্যাপ্ত হয়, তার মূলে বাংলার নবপ্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা ছিল যতখানি দায়ী, ততখানি দায়ী ছিল বাংলার গ্রামের উপর শহুরে সমাজের মূল্যারোপ। সাহিত্য, কাব্য, নৃত্য কলা, রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে শহুরে শিক্ষিত বাঙালীর রুচি, শিক্ষা, মূল্যমান, রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার মাত্র একশ বছরে যে দ্রুতগতিতে, অবাধ স্বচ্ছন্দে বাংলার গ্রাম সংস্কৃতির মানসিক ও অর্থনৈতিক পরিধি অধিকার করে, তা জগতে বোধহয় বিশেষ বিস্ময়ের বস্তু। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সুদূরতম দুর্গম গ্রামেও মধ্যবিত্ত চিন্তা, আশা, আকাঙ্খা, মূল্যবোধ, উৎপাদন ব্যবস্থার যে সর্বব্যাপী প্রভাব দেখা যায় তা পৃথিবীতে দুর্লভ। তারাশঙ্করের লেখার সঙ্গে যিনি মোটামুটি পরিচিত এবং তার যদি বীরভূম মোটামুটি খোয়া এবং জানা থাকে, তিনি বিনা দ্বিধায় বলবেন তারাশঙ্করের উপন্যাস গল্পে যে উপভাষা আমরা পাই তা আসলে বীরভূমের বাউরি, বাগদী, বেদে, সাঁওতাল, নমঃশুদ্র পটুয়ার নিজস্ব উপভাষা নয়, তা মূলত বীরভূমের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মনগড়া কল্পিত ভাষা। অর্থাৎ ছোট জাতের লোকেরা কিভাবে কথা বলতে পারে, তাদের উচ্চারণে কি রকম টান বা বিকৃতি থাক। উচিত তাদের [illegible] কী শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ কি রকম হওয়া উচিত উঁচু জাতের শিক্ষিত লোক তা কল্পনা করে নিয়েছেন বলে প্রতীত হয়। ১৯২০ সালের পরে অনেক বাঙালী সাহিত্যিক অনুরূপভাবে মিল শ্রমিকের কথোপকথনও তাঁদের নিজেদের মনের মত বসিয়ে তাঁদের ভাষা, টান, উচ্চারণাদি প্রায় পুরো কল্পনা করে মিল মজুর সমাজের মনের আভাস দেবার প্রয়াস করেছেন। মজুরেরা আসলে কি ভাষা প্রয়োগ করে, অধিকাংশ লেখকই তার যথার্থ গবেষণা করেন নি (এমন কি সুবোধ ঘোষ বা উৎপল দত্তও) পরন্তু তাদের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্তরে কি ভাষা তাদের ব্যবহার করা সমীচীন—এই কল্পনা করে, মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা এবং ভাবের উপরে উদ্ভট ছাঁচ শিল্পের সৃষ্টি করেছেন। একটি সামান্য উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। বীরভূমের বাউরিরা সাধারণত যে সব অশ্লীল গালি গালাজ নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করেন, তারাশঙ্কর তা কখনও ব্যবহার করেন নি। হয়ত তিনি সেগুলি জানতেন, কিন্তু তাদের ব্যবহার তাঁর কাছে শালীনতায় বোধহয় বাধতো। ফলে তাদের মুখে তিনি যে সব অশ্লীল শব্দ বা কথা জুগিয়েছেন তা আসলে বাউরিরা ব্যবহার করেন না। কারণ অতি সাধারণ। তাদের মনে সেগুলি শারীর বা জৈব কোন চিত্রই জাগায় না, সেগুলি নিতান্ত নিরাকার সম্বন্ধগত গালাগালি। মিল মজুরের কথোপকথন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। কলকব্জা নিয়ে কাজ করে তাদের গালাগালিও যত বিশিষ্ট চিত্রাবলম্বী হয়ে গেছে, সাহিত্যিকরা সে সম্বন্ধে গবেষণা না করে ভদ্রলোকের মুখে ইতরভাষা কল্পনা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করেছেন। সেই ইতর ভাষাও তাঁর সবত্র ভদ্রশিক্ষার শহুরে চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ।

ফল হয়েছে বেশ মজার। আজ যদি কেউ শহর থেকে অনেক দূরে দুর্গম গাঁয়েও যান, যেমন [illegible] বা নলহাটি থানার কোনও [illegible] গ্রামে তিনি বিস্মিত হবেন। স্থানীয় গ্রাম্য [illegible] গত বিশ বছরে অনেক বদলে গেছে, উপরন্তু লোকে কথাবার্তায় হঠাৎ এমন বিশেষণ বা শব্দসমষ্টি ও শব্দবিন্যাস ব্যবহার করে যা হয়ত তারাশঙ্কর বা সতীনাথ ভাদুড়ীর বই থেকে তোলা, শরৎচন্দ্র থেকে তো বটেই। পরনে এখনও আছে [illegible] কাচা কোঁচাটে মত্তে, [illegible], মুখ সম্মানহীন

ক্ষৌরকর্মের সুস্পষ্ট চিহ্ন, কিন্তু ভাষা প্রায় সাহিত্যিক, গ্রাম্য বাক্য রচনাবিন্যাসের বদলে সাহিত্যিক সিনটাক্স অনেক শব্দই পোষাকী, প্রায় কাব্যিক। সে কাব্যিক, পোষাকী ভাষা কৃত্তিবাসী বা কাশী রামদাসী বা চৈতন্য চরিতামৃত ঘেঁষা ততটা নয় যতটা আধুনিক কথ্য সাহিত্যের। এক কথায়, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রভাব হয়েছে সুদূর প্রসারী, ভাষার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত চিন্তাধারা, মূল্য, জীবনদর্শন অপ্রতিহত গতিতে গোটা বাংলা-গ্রাম সমাজকে আজ দখল করতে আওয়ান। নিম্ন শ্রেণীর গতরেখেটে খাওয়া বাঙালী আজ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা, চিন্তা, হাবভাব, মূল্যমান গ্রহণে আগ্রহশীল। বাঙালী সমাজ আজ এক সর্বব্যাপী নিম্ন মধ্যবিত্ত একাত্মতার অন্বেষণে উন্মুখ বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনের এই গ্রামাভিমুখী—অন্তত কল্পনায় অভিযান আজকের নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে সব সাহিত্যিকই এই অভিযান বিশেষভাবে দৃঢ় করেছেন। বাংলা উপন্যাস লেখকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই প্রায় আগাগোড়া শহরকে আশ্রয় করে উপন্যাস লিখে গেছেন। উপন্যাসের তার প্রতিটি পটভূমিকাই শহর; মোটামুটি ভাবে কলকাতা। বাংলাভাষার সবচেয়ে মহৎ উপন্যাস গোরা, কলকাতার উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসে আরেকটি প্রতীতি দৃঢ় হয়: কলকাতাই আসল শহর, বাংলা দেশের বা আশেপাশের অন্যান্য শহর কলকাতার উপগ্রহমাত্র। বাংলা দেশের এই একান্ত সত্যটি রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসে জানাতে দ্বিধা করেন নি। এ বিষয়ে তিনি উপন্যাসকে ছোট বা বড় গল্প থেকে স্পষ্টত ভিন্ন জাতের করে দিয়েছেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলার গ্রাম সমাজকে নিয়ে ছোট গল্প লেখা চলে; কিন্তু উপন্যাসের প্রকৃত উপজীব্য হচ্ছে শহর। এ ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাস রচনার আরও একটি সত্য সুদৃঢ় করেন। তাঁর উপন্যাসের কাল বর্তমান, বাস্তবানুগামী; অতীত বা অতীত চারণ নয়, অতীত নিয়ে রঙীন বিলাস আক্ষেপ তার উপজীব্য নয়, এক্ষেত্রেও তিনি কালিপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতিষ্ঠিত রাজপথে গেছেন।

অপর পক্ষে তাঁর কাব্য প্রায় পুরোপুরি নিসর্গানুরী এবং যেহেতু প্রকৃতির লীলা এবং অপার বৈচিত্র্য শহরে ব্যাহত,' সেহেতু তাঁর কাব্যে সর্বত্রই দেখি বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ গ্রাম, বাংলার মাটির বিচিত্র ফুল, ফল, উদ্ভিদ, গাছ, বনানী, অসীম বিচিত্ররূপী আকাশ, উত্তর সীমান্তের নগাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণের অশেষ সমুদ্র। তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সার্থক উভচর। কলকাতার বুকে তার জন্ম জীবন। শহরেই তার যাবতীয় প্রস্তি অথচ বরাবর তার প্রকাণ্ড দ্বিতীয় কর্মস্থল ছিল শান্তিনিকেতন। সুতরাং এই দুই প্রান্ত জীবনে তার গদ্য ও কাব্য পেয়েছে অতি আশ্চর্য রকমের দুই জাতীয় পাথেয় যা অন্য বাঙালী সাহিত্য স্রষ্টার আয়াস বহির্ভূত।

গ্রামছাড়া রাঙা মাটির পথের মায়া অনেক শিল্পীকেই অমোঘ আকর্ষণে আবদ্ধ করেছে। বিষ্ণু দে তার কবি জীবন আরম্ভ করেন একান্তভাবে শহরকে অবলম্বন করে। বিষ্ণু দে এবং সমর সেনই কেবল তাদের কাব্যে শহরকে সত্য বলে জেনে এবং মেনে প্রথম জীবনে কাব্য লেখেন। কিন্তু কালক্রমে বিষ্ণু দের কাব্য ধারা (বোধহয় শান্তিনিকেতন ও রিখিয়া ভ্রমণের পরে) প্রকৃতির পথ বেয়ে মাঠ, ঘাট, চাষের দিকে আকৃষ্ট হয়। সমর সেন যে সময়ে মোটামুটি কাব্য রচনা বন্ধ করে দেন, সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৭ সাল থেকে বিষ্ণু দে শহর থেকে অনেকখানি মুখ ফিরিয়ে গ্রামের প্রকৃতির দিকে তাকান, স্বহস্তে শহরের বন্ধন শিথিল করে দেন। কলকাতার শহরবাসী এই সব কারণে আজ দু'শ বছর ধরে শহরে থেকেও আধা গ্রামবাসী, যদিও প্রায় সবটাই মানস। গ্রামের জন্যে তার মন সদাই উচাটন, যদিও আধবেলার জন্যে গ্রামে ঘুরে গ্রামের অবস্থা দেখে আসার ব্যাপারে তার সদাই পরম অনুৎসাহ, গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তার সম্বিৎসা আছে কিনা সন্দেহ। গ্রাম সম্বন্ধে তার ধারণা অতীতের সোনার স্বপ্নে ঘেরা। অতীত গ্রাম জীবনকে কল্পনার জালে যতখানি মহিমান্বিত করা যায়, জীবনের মাপের চেয়ে বড় করে দেখা যায়, বর্তমানের চেয়ে মহৎ করে অতীত রোমন্থন করে যতখানি আনন্দ পাওয়া যায় সে চেষ্টার ত্রুটি নেই।

অন্য পক্ষে গ্রাম সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা ভারতের অন্যত্র বিরল। স্বেচ্ছায় গ্রামের অবস্থা অনুধ্যান করতে গেছেন—কাজক্ষেত্রের তাগিদে নয়, বিদেশী বন্ধুর উপরোধে নয়, ছুটি কাটানো পিকনিকের প্রলোভনে নয়, নিছক জ্ঞানার্জনের তাগিদে এরকম মস্তিষ্কজীবী সমাজ বিজ্ঞানীর খোঁজ পাওয়া শক্ত। অথচ বড় মারাঠা, মালয়ালী, তেলেগু, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশী অর্থ বিজ্ঞানীর নাম অনায়াসে মুখে আসে যাঁরা মোটামুটি তাদের প্রদেশের গ্রামীণ অর্থ, সমাজ ও

উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, গ্রামের প্রভু-ভৃত্য সংস্থানের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে সজ্ঞান বিরোধ বা সংঘাত কোথায় এবং কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, সে সম্বন্ধে সচেতন। অর্থাৎ যাঁদের মন অলীক স্বর্ণ যুগের গ্রামের মোহে একদিকে যেমন আচ্ছন্ন নয়, তেমনি অন্যদিকে কলেরা, ম্যালেরিয়া, জোঁক হাজামজার অলীক আশঙ্কায় অবসন্ন নয়।

অথচ দ্রুত বিলীয়মান অতীতময় গ্রামের নানা ভূষণবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের অসীম উৎসাহ, যেমন পূজা, পার্বন, মেলা, প্রবাদ, কিম্বদন্তী, লৌকিক ঐতিহ্য ইত্যাদি। হয়ত বাংলার গ্রামে কিভাবে পরিবর্তনের হাওয়াকে প্রতিহত, রোধ করা যায়—নিজের অগোচরে সে বিষয়ে উৎসাহই এই অতীত রোমন্থনকারী রোমান্টিক গ্রাম বিষয়ক সাহিত্যিক উচ্ছ্বাসের মূলে বিরাজমান ; কিন্তু এর ভয়াবহ কুফল যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে, তার নিদর্শন আমরা গত চার বছরে প্রায় প্রতিদিনই দেখেছি।

এই চার বছরে দেখা গেছে, গ্রাম বাংলা থেকে শহরে বাঙ্গালীর উৎসাহ মোটামুটি প্রেমাচরিত গ্রাম ও গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার পরোক্ষ সমর্থনে। হয়ত তার একটি কারণ, কয়দিন আগে পর্যন্তও শহরে বাঙালী পরিবার খুব কমই ছিলেন, যাঁদের অন্তত দু এক একর নিদেনপক্ষে কয়েক শতাংশ চাষে জমিও আদি বসত গ্রামে ভাগে বিলি করা ছিল না এবং যার থেকে বৎসরান্তে অন্তত দুটি টাকা বা দুপালি ফসল অথবা ফলমূল টানা আসতো।

অশীতিপর বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্মদিন উপলক্ষে আক্ষেপের আবেগে বলেছিলেন—'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'। নিজের সুরের অপূর্ণতা মেনে নিয়ে বলেন,

> বহুদূর প্রসারিত
> এদের বিচিত্র কর্মভার ;
> তারি পরে ভর দিয়ে
> চলিতেছে সমস্ত সংসার।
> অতি ক্ষুদ্র অংশে তার
> সম্মানের চিরনির্বাসনে ;
> সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি
> সঙ্কীর্ণ বাতায়নে।
> মাঝে মাঝে গেছি আমি
> ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
> ভিতরে প্রবেশ করি
> সে শক্তি ছিল না একেবারে।

বাংলার গ্রাম সম্বন্ধে একদিকে চূড়ান্ত রোমান্টিক আকৃতি (যাকে বোঝার জন্য, পাবার জন্য, বদলাবার জন্য সম্প্রতি অনেক প্রাণ অকাতরে বলি হয়েছে, সেই বলির স্বীকৃতিও ধ্বনিত হয়েছে বহু পরগণায় পরগণায় অন্ত্যজদের মধ্যে) অন্যদিকে শহরে শিক্ষিত সমাজের সেই গ্রাম সম্বন্ধে মজ্জাগত ঔদাসীন্য ও অবহেলা, যথা ক্ষেত্রে বাংলার গ্রামে গ্রামে শহরে নিম্ন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি, রুচি, দৃষ্টিকোণের দ্রুত বিস্তার। এই তিন স্রোতের মুখে বাংলার গ্রাম আজ এমন অবস্থার সম্মুখীন যা ভারতবর্ষের পূবপ্রান্ত ছাড়া প্রায় দেখা যায় না।

সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্য একটি কারণে বাংলার গ্রাম বহুদিন ধরে কালের পরিবর্তন স্রোতের অন্তরাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। যদিও বাংলাদেশে অন্য প্রদেশের তুলনায় কারখানা, খনি অনেক বেশি, শিল্প মজুরও বেশী, তবু এই মজুর শ্রেণী মুখ্যত অবাঙালী, অথবা বাঙালী হলেও ছোট অন্ত্যজ-যাদের স্পর্শ বাংলা গ্রাম সমাজ সযত্নে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। আগে এই মজুর শ্রেণীর সঙ্গে বাঙালী মধ্যবিত্ত দপ্তর কর্মীর যথেষ্ট স্বার্থের সংযোগ ছিল। দুজনে হাত মিলিয়ে অনেক শ্রমিক ইউনিয়নের লড়াই একসঙ্গে লড়েছেন অনেকদিন, ফলে স্বার্থের একাত্মতা ছিল প্রচুর। কিন্তু ১৯৫০ এর পর থেকে মেহনতী কর্মী আর দপ্তর কর্মীর মজুরী সংক্রান্ত মামলা ফয়সলা ভিন্ন ভিন্ন পথগামী হওয়ায় একের পথ ক্রমশ অন্যের পথ থেকে গেছে অনেক দূরে সরে। সংযোগ হয়েছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। ফলে অন্যান্য প্রদেশে শিল্প শ্রমিক, দপ্তর শ্রমিক ও গ্রাম শ্রমিকের মধ্যে যে শ্রেণীগত ও গোষ্ঠীগত অনন্যতা দেখা যায় এখানে তার বদলে দেখি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ, এমন কি শিল্প জগৎ সম্বন্ধে বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস। ফলে শিল্পের পথে বাংলার গ্রামের পরিবর্তন-ধারা বিশেষ সাহায্য পায়নি, যা পেয়েছে গুজরাটে বা মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে বা তামিলনাড়ুতে। এদের জন্যে শিল্প-পতিরা যতো না দায়ী ততোধিক দায়ী বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যমান ও মনোভাব।

পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি অনুকম্পাশয়ী সাহিত্যিক বা চলচ্চিত্র [illegible] শিল্প সার্থকতার উত্তুঙ্গে [illegible] ও হাঁটুন, বঙ্কিমের উপকথা উপন্যাস বা জলসা ঘর ছবি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বাংলার গ্রাম সমাজে আজ যে পরিবর্তন দেখা যায় তা অতীতের [illegible] প্রায় সবই মঙ্গলময়। খেদের কারণ খুব কমই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যাঁরা বাংলার গ্রামে ঘুরেছেন, এমন কি ১৯৫০ সালেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের রূপ যাঁরা চোখ মেলে দেখেছেন, তাঁরা বিনা দ্বিধায়ই বলতে পারবেন বাংলা দেশের গ্রামে কি শুভ পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪০ সালে এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে দশটি শিশুর

মধ্যে অন্ততঃ ন'টির ছিল না পীতচক্ষু, পীতচর্ম, অস্থিচর্মসার, পেট পিলে লিভারে স্ফীত, ম্যালেরিয়ায় (উত্তরে কালাজ্বরে) জর্জরিত। গ্রাম ছিল স্যাঁতসেঁতে, ম্যালেরিয়ার আশ্রয়, গুল্মলতা, কচুরিপানা, ডোবায় ভর্তি। এমন গ্রাম কমই ছিল যেখানে পানীয় জল নিঃসঙ্কোচে খাওয়া চলে বা যেখানে ডাক্তারের সন্ধান মেলে। দোকানপাট ছিল মলিন, শহরের সামান্যতম প্রসাধন বা বিলাস সামগ্রী যেখানে নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য, গর্হিত মূল্যের। রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা, বিপদ-সঙ্কুল। দেশের এক-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ত দূরের কথা, যে কোন জেলার এক মহকুমা থেকে অন্য মহকুমায় যেতে গেলেও লাগতো একাধিক দিন। গ্রামের স্বাক্ষর লোক ছিল দুটি একটি এবং তাদের নাগাল পাওয়া যেত একমাত্র যে গ্রামে পাঠশালা ছিল, সেখানকার পণ্ডিত মশায় ছাড়া সাধারণ নিরক্ষর গ্রামবাসীর পক্ষে বিশেষ দুঃসাধ্য। যাঁরা ১৯৪৮-৫০ এমন কি ৫২ ৫৩ সালেও বাংলার জেলায় ঘুরেছেন তারা সাক্ষ্য দেবেন কি ভাবে, এক জেলা থেকে অন্য জেলা যাবার রাজপথে বড় উঁচু লরি জাতীয় গাড়িও ক্ষণে ক্ষণে ধূলোর সমুদ্রে অদ্ধেক ডুবে যেতো। রাসায়নিক সার সেচের জল, বীজ, কীটাণুনাশী পাউডার বা ওই জাতীয় সামগ্রীর কথা কেউ সহজে চিন্তা করতে পারতেন না। এমন কি সমবায় ব্যাঙ্কও নয়। সাধারণ ব্যাঙ্ক তো দূরের কথা। নলের পরিস্রুত জল গরীব পাড়ার নাগালের বাইরে, বিদ্যুৎ ছিল না প্রায় কোন গ্রামেই। রাজকর্মচারীদের মধ্যে কচিৎ কখনও দেখা মিলতো থানার হেড কনষ্টেবলের, অথবা বড়জোর থানার ছোট বা মেজবাবুর। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সম্বন্ধীয় কর্মচারীরা সারা বছর প্রায় অদৃশ্যই থাকতেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে গ্রামের প্রায় একমাত্র ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল জমিদারবাবুর বাড়ীর মাধ্যমে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত গ্রামের উপর নজর বিশেষ পড়েনি। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে সকলের টনক নড়ে; সরকারের গা ঘামতে আরম্ভ করে। ১৯৪৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে গ্রামোন্নয়ন খাতে বছরে হাজার দশেক টাকার বেশী বরাদ্দ থাকতো না। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ এই তিন মাসে বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় ২২ লক্ষ টাকার গ্রামোন্নয়ন মূলক কাজ সরকারের নির্দেশে সম্পূর্ণ করেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৫ লক্ষ টাকা এবং এই টাকার প্রায় সবটাই ব্যয় হয় গ্রাম থেকে রাজপথের সংযোজক রাস্তায়, খাবার জলের কুয়োয়, বদ্ধ জলাশয় নিষ্কাশনের নালা বানানোয়, ছোট ছোট সেচ, বাঁধ, পুষ্করিণী খননে, দূর নগণ্য গ্রামের স্কুলবাড়ী মেরামতে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মালদহের ইতিহাসে প্রথম একটি পদানো জীপে ইংরেজ বাজার শহর থেকে দুদিন দু রাত্রি অনেক ক্লেশ সহ্য করে কাঁচা পথে, কোন কোন স্থানে চাষ জমির আল কেটে রাস্তা তৈরী করে কলকাতায় পৌঁছান। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে যে কোন লোক যে কোন সাধারণ মোটর কারে সকাল সাতটায় ইংরেজ বাজার শহর থেকে রওনা হয়ে ওই দিনই বেলা চারটায় স্বচ্ছন্দে কলকাতা শহরে পৌঁছতে পারতেন।

শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রোগক্লিষ্ট পীতচক্ষু পীতবর্ণ অস্থিচর্মসার শিশু অনেক কম দেখা যায়। রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দ্রুত ও অভাবনীয় উন্নতি হয়। সেই সঙ্গে উন্নতি হয় সেচ ব্যবস্থার, কৃষির জন্য সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধের, যন্ত্রপাতির, ফসল সংরক্ষণোপযোগী গুদাম এবং হিমঘরের। সমাজ উন্নয়ন ও পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ফলে গ্রামের লোক প্রথম দেখলেন পাইকারী হিসেবে গ্রামে রাজকর্মচারীর আমদানি, যাঁরা অন্ততঃ এসে আপনি বলে কথা বলেন, এবং কিসের অভাব বা আশু প্রয়োজন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এমন কি গ্রামের জমিদার বাড়ীর বৈঠকখানা বা দোরদালানে বসেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হলো মনে করেন না; নিতান্ত দরিদ্র অস্বচ্ছল পল্লীতেও মাঝে মধ্যে যান এবং খোঁজ খবর নেন।

কিন্তু গ্রাম সম্বন্ধে সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, গ্রামের কৃষি এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে বোধ এই ২৫ বছরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যদি একশ পা এগিয়ে থাকে বাংলা দেশে এগিয়েছে মাত্র বিশ কি পঁচিশ। পূর্ব ভারত (বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম) ব্যতীত যে কোন জায়গায় ঘুরলে আজ গ্রামবাসীকে নিজস্ব প্রাপ্য দাবী করার সময়ে যে ভাবে জোর গলায় রাজকর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে শোনা যায়, বিপ্লবের ভূমি বাংলাদেশে আজও সেই সমান সমান সুরে কথা বলতে শোনা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের রাজকর্মচারীর কাছে আজও গ্রামবাসী প্রায় সর্বত্র তুমি এবং গরীব বা নীচকুলের পাড়ায় "তুই" কিন্তু পশ্চিম ভারতে (এমন কি মধ্যযুগীয় রাজস্থানেও) বা তামিলনাডুর মিরাশদার অধ্যুষিত জেলা ছাড়া দক্ষিণের অন্যত্র প্রায় সকলের কাছেই রাজকর্মচারীর কাছে

গ্রামবাসী আপনি।

শুধু রাজকর্মচারী নয়, শহরবাসী প্রায় প্রত্যেকের কাছে (বা শহরে সমশ্রেণীর যাঁরা বাধ্য হয়ে গ্রামে আছেন সম্পত্তি রক্ষার জন্যে অথবা ব্যবসা পেশা বা চাকরী উপলক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে 'ভদ্রলোক' নয় এমন প্রত্যেক গ্রাম বাসীই এখনও তুই খুব বেশী হলে তুমি—প্রাণ গেলেও আপনি না। এর ব্যতিরেক কখনও হয় না। সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ মার্জিতরুচি নায়ক যখন গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলেন এখনও তার হুকুমের সুরে তুমি বা তুই সম্বোধন করে কথা বলার কখনও ব্যতিক্রম হয় না এবং তাঁর ফিল্মে গ্রামবাসী কখনও কল্পিত স্থানীয় নিরক্ষর টান বা উপভাষা প্রয়োগ বর্জন করেন না। ডেবরা, নয়াগ্রামে, বোলপুরে বা মাটিগড়ায়, যখন শহরের যুবক বিপ্লব সৃষ্টি করতে যান তখনও তাদের চাষ-বাস বা যাবতীয় উৎপাদন পদ্ধতি, চাষীর সাধারণ আশা আকাঙ্খা সম্বন্ধে দেখা যায় ঔদাসীন্য, তখনও তাঁদের এই তুমি বা তুই ছাড়তে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। কিন্তু উদ্ধার করার মনোভাব শেষ পর্যন্ত বোধহয় যায় না।

শহর এবং গ্রাম, উঁচু জাত নীচু জাত, শহরে উপজীবিকা এবং গ্রাম্য কৃষিকর্ম বা সেই জাতীয় মেহনতী কাজ, মস্তিকের কাজ বা ভদ্র পেশা নির্ভর মেহনতী মজুরী, একদিকে সম্পদলিপ্সা, অন্যদিকে সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে অগাধ নিস্পৃহভাব, অন্যের কাছে কঠোর কর্তব্যবোধ, আজ্ঞানুবর্তিতা, নিয়মানুগত্যের প্রত্যাশা এবং নিজের বিষয়ে প্রতিটি শৃঙ্খলার অবাধ উলঙ্ঘন, এই দুয়ের সতত বিরোধ এবং সবের পিছনে শহরে মস্তিষ্কজীবির স্বতঃসিদ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ববোধ, আজ আমাদের গ্রাম সম্বন্ধে যতকিছু রোমান্টিক অ্যাগনি বা যন্ত্রনার মূলে।

বাংলাদেশে আজ শহর আর গ্রামের মধ্যে সমানে সমানে বোঝা পড়ার দিন যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। দুঃখের বিষয়, গত তিন চার বছরে গ্রাম নিয়ে গল্প লেখাও দ্রুত কমে গিয়েছে। গত দেড়শ বছর ধরে বাংলার গ্রামাঞ্চল শোষণ করে বাংলার শহরের বেড়েছে চাকচিক্য, হয়েছে মেদস্ফীত। ঋণ শোধ হিসাবে শহরবাসী গ্রামের উপর আরোপ করেছেন তাঁর রোমান্টিক যন্ত্রনা, নৈরাশ্য বৃত্তি আত্মহনন স্পৃহা।

শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে যে গ্রাম লালায়িত, সেখানে ভাঙ্গা হয়েছে স্কুল, শহরের মাষ্টার দিয়েছেন ফাঁকি, কর্তব্য হেলার অভীপ্সায় আশ্রয় নিয়েছেন ফাঁকা বুলির, ডাক্তার, নার্স সাত দিনে থাকেন ছয় দিন অনুপস্থিত। নেতৃত্ব আরোপ করতে গিয়ে, গ্রামের সম্পদ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি, কৃষি প্রসার, গ্রামবাসীর প্রাণশক্তি, তেজোদীপ্তি, কৃষির উৎপাদন শক্তি বাড়ে এসব দিকের প্রতি তাদের নজর পড়ে নিতান্ত অল্প। শহরে আদর্শানুযায়ী কাজ হাঁসিল না করতে পারলেই গ্রামবাসীর প্রতি শহরে নেতার হয় অগাধ অভিমান। একবারও মনে করেন না, গ্রামবাসী তাকে সন্ধিক্ষণে পলাতক বলে সন্দেহ করতে পারেন। এ পর্যন্ত যত কিছু কর-শুল্কের সুযোগ-সুবিধা হয়েছে তার অধিকাংশ লভ্যাংশই গেছে গ্রামে তাঁদের কোলে, যাঁদের এক পা গ্রামে এবং যাঁরা শহরের মুনাফাস্রোতে তাদের বেশীর ভাগ পুঁজি ঢালেন। তাই আজ বাংলাদেশে সেচ কর ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে কম, অথচ সেচের উপকার তারাই পান, যাঁদের জমির পরিমাণ বেশী এবং যাঁদের অধিকাংশ সম্পদ শহরে খাটছে অর্থাৎ নগণ্য গ্রামবাসীর করের টাকাই শহরাশ্রিত চাষীর সেচ কর হ্রাসের জন্য নিযুক্ত হয়। এদিকে শহরবাসী নজর দিতে নারাজ, কারণ তাহলে দুধে হাত পড়ে। তেমনই যাবতীয় উন্নত কৃষির উপকরণ, যেমন পাম্পসেট, বিজলি, সার বীজ, রাস্তাঘাট, যানবাহন এখনও পুষ্ট করছে তাদের যারা মুখ্যত শহরের পরিপোষক। গত তিন বছরে বাংলার গ্রামে গ্রামে সরকারের আয়ত্তাগত যত জমি বিলি হয়েছে তার পরিমাণ মাত্র তিন লক্ষ একরের বেশী না হলেও তার জন্যে বাংলার গ্রাম আজ কৃতজ্ঞ এবং সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজ গ্রামাঞ্চল যত শৃঙ্খলাবদ্ধ শহরাঞ্চল তত আক্রোশ বিক্ষুব্ধ। শহরের অনেকে বিরক্ত হন গ্রামবাসীর মৃত্যু-ইচ্ছা কেন আরও প্রবল হচ্ছে না? আরও কেন নৈরাশ্যে আত্মহুতি হচ্ছে না। কিন্তু সহজ সত্য হচ্ছে হীনতম, দরিদ্রতম মানুষও মরতে চায় না, বাঁচতে চায় বাঁচতে চায়, পথ চেয়ে থাকে তারই জন্য যে আত্মবলি দিতে বললেও সেই সঙ্গে দেখায় সঙ্গঠন ও জাগতিক এবং মানসিক সম্পদ বৃদ্ধির পথ। দুঃখের বিষয়, এখনও আমরা মনে মনে গ্রাম্য শহরের শোষণ ক্ষেত্র বলে আঁকড়ে আছি এবং সেই প্রতারণা চাপার আশায় গ্রাম বাংলা প্রভাত নানাবিধ ভূষণ অলঙ্কারের অবতারণা করছি। গত পরিবর্তন ও উন্নতি না চেয়ে পুরোনো ব্যবস্থা বজায় রাখার যাবতীয় সাহিত্যিক ও গবেষণা সম্প্রদায়ের আয়োজন করছি।

প্রায় ৬৬ বছর আগে এই শতকের গোড়ায় আমার মায়ের বিবাহ হয়। তখন তাঁর পিতামহ বেঁচে, বয়স প্রায় আশি। বাড়ীর ছেলেদের সন্ধ্যাবেলা গল্প ফাটিয়ে

২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

# দারিদ্র্যের অবসান

## ভবতোষ দত্ত

স্বাধীনতা লাভের প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনা করা হয়। তার পর থেকে গত কুড়ি বছরের ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের পথে বাইরের কোন বাধা আসে নি—যে অসুবিধা গুলি দেখা দিয়েছিল সেগুলি পরিকল্পিত অর্থনীতিতে খুব সহজেই আসতে পারে—যেমন মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি বা বিদেশী লেনদেনে ঘাটতি। তৃতীয়—পরিকল্পনাতে অন্য রকম বাধা পড়লো-চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ, পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদিতে পরিকল্পনার গতি-বেগ অনেকটা কমিয়ে আনতে হয়েছিল। তার পর থেকে নানা সমস্যা চলেছে. চতুর্থ পরিকল্পনাকে বার বার পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং যে সমস্যাগুলি দ্বিতীয় পরি-কল্পনার শেষের দিকে দেখা দিয়েছিল, সেগুলি প্রকৃতি ও পরিমাণে আগের চেয়ে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুড়ি বছরের পরিকল্পিত আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টার পরে এমন একটা সময় এসেছে যে, জিনিষটা নূতন করে বিশ্লেষণ করে দেখার—কোথায় আমরা ভুল করছি। আমাদের লক্ষ্য গরীব দেশের পক্ষে উপযুক্ত ছিল কিনা। আমরা উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিলাম কিনা, এবং সর্বোপরি, ভবিষ্যতে আমাদের কোন পথে চলতে হবে।

প্রথমেই অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভুলভ্রান্তি যতই হয়ে থাকুক না কেন, গত কুড়ি বছরে আমাদের আর্থিক অবস্থার সর্বাঙ্গীন যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে ততটা অতীত কালের আর কোন দুই দশক সময়ের মধ্যে হয় নি। খাদ্য শস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন, শিল্পজাত যন্ত্র-পাতি ও ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, যানবাহন ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি সবদিকেই প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ১৯৫১ সালের ৩৬ কোটি জনসংখ্যা যদি ১৯৭১ এ প্রায় ৫৫ কোটিতে এসে না দাঁড়াতো, তাহলে সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার মানে অনেকখানি উন্নতি করা সম্ভব হোত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশংকা অবশ্য সব সময়েই ছিল—অল্প প্রচেষ্টায়ই মৃত্যুর হার কমানো যায়, জন্মের হার কমাতে অনেক সময় লাগে। জন্ম হার কমাবার জন্য চেষ্টা অবশ্য চালিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কবে কমবে তার জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকা চলে না। এখনো পনেরো বা কুড়ি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুতহারে চলতে থাকবে এটা ধরে নিয়েই পরিকল্পনা রচনা করতে হবে—এমন পরিকল্পনা, যাতে আর্থিক উন্নতির ধাপে যারা নীচের স্তরে আছে তাদের জীবন যাত্রার মান তাড়াতাড়ি উঁচু করে আনা যায়।

প্রথম কুড়ি বছরের চারটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরে সোভিয়েট রাশিয়াতে সর্ব-নিম্ন স্তরেও জীবন যাত্রার মান অনেকখানি উঁচু হয়েছিল। বেকার ছিল না। দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদ বন্টনে অনেকখানি সমতা এসেছিল। আমাদের দেশে এখনো প্রায় ২২ কোটি লোক (অর্থাৎ মোট জন-সংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ) জীবন যাত্রার সাধারণভাবে স্বীকৃত নূন্যতম মানের নীচে আছে, বেকারের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান, আয় ও সম্পদ বন্টনে অসাম্য কমেছে এ-রকম কোন প্রমাণ নেই। কেন এ রকম হোল, তার কারণ বুঝতে গিয়ে রাশিয়ার ও আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যের দিকে নজর দিলেই চলবে না। একথা ঠিক যে, রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে পারে সহজে—যেটা সংসদীয় গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটা রাজনৈতিক মূল্য-বোধ আছে—যে ব্যবস্থা আমরা নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তার জন্য যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে সেগুলি মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

পরিকল্পনার প্রকৃতি ও রূপদানে যে সব ভুল হয়েছে সেগুলি, এখন আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মোট উৎপাদনের দিকে নজর দিয়েছি বেশী—কী কী জিনিষ উৎপন্ন হোল সেটা খুব ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখিনি। সার্থক পরিকল্পনার জন্য যে দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া দরকার সেটা আমরা নিয়ে উঠতে পারিনি ; এমন কি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় প্রত্যেক বছরের জন্য নূতন করে করা সাময়িক কার্যনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যখন জীবন যাত্রার মানের কথা উঠেছে, তখন আমরা দেশের মোট আয়কে জন-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে গড় পড়তা আয় পাওয়া যায়, শুধু তারই দিকে নজর দিয়েছি। গড় পড়তা আয়ের হিসাবটা অবশ্য আশাপ্রদ নয়। কিন্তু আসল কথা হোল যে, এই জাতীয় হিসাব থেকে কোন স্তরে কী হচ্ছে সেটা জানবার কোন উপায় নেই। কোন গড় সংখ্যার পরিবর্তন বা স্থিতিশীলতা থেকে পশ্চাৎপটে কি ঘটে যাচ্ছে, তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

দেশের গড় পড়তা আয় বাড়লেও, অসাম্য বাড়তে পারে। দরিদ্র লোকের সংখ্যা বাড়তে পারে। দারিদ্র্যের পরিমাণ ও অসাম্যের বিস্তৃতি কতটা সেটা জানতে হলে আলাদা করে হিসাব করা প্রয়োজন।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জানা প্রয়োজন দেশের মোট আয় ও সম্পদ বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কীভাবে বিভক্ত এবং টাকার অঙ্কে কত টাকা পর্যন্ত আয়কে দারিদ্র্যের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। আয় ও সম্পদ বণ্টনের হিসাব কোন কোন উন্নত দেশে বিশদ ভাবে করা হয়েছে। আমাদের মত দেশে সেটা এখনো সম্ভব হয় নি। সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যারা নিযুক্ত তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের স্তরভেদের কিছু তথ্য আমাদের আছে। আয়-কর বিভাগের হিসাব থেকেও আমরা অনেকটা খবর জানতে পারি। কিন্তু যাদের সম্বন্ধে এই সব ক্ষেত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়, দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা এত কম যে দেশের সামগ্রিক ছবি এভাবে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া এসব তথ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর যোগ্যও নয়। আয়কর বিভাগের পরি-সংখ্যান থেকে জানা যায়, কোন ক্ষেত্রে কতটা আয়ের উপরে আয়কর নির্ণীত হয়েছে—যে বিরাট পরিমাণ আয় হিসাবের বাইরে থেকে যায়—সে আয় অসাম্য বৃদ্ধি করে। মূল্য বৃদ্ধির গতিবেগ বাড়ায়, কিন্তু তার সম্বন্ধে তথ্য মেলে না।

অসাম্য ও দারিদ্র্যের পরিমাণ জানতে হলে তাই অন্য রকম হিসাব নিতে হয়। ১৯৬৪ সালের মহলানবিশ কমিটির রিপোর্ট থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের অধ্যাপক দাণ্ডেকর ও নীলকণ্ঠ রথের প্রবন্ধা-বলী পর্যন্ত অনেক লেখাতে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। জমির বন্টন ব্যবস্থা জাতীয় 'নমুনা সমীক্ষা'' কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্য ইত্যাদি নানা উপকরণ থেকে, একেবারে নির্ভুল না হলেও, অনেকখানি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা যায়। দেশের মোট আয়ের কতটা বিভিন্ন আয়-স্তরের মধ্যে কীভাবে বিভক্ত সে সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা আমরা করতে পারি, আগামী একটি বা দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশদ ব্যবস্থা তার উপরে নির্ভর করেই করা যেতে পারে।

দারিদ্র্যের সীমারেখা কোথায় সেটা হিসাব করা উচিত জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের দিক থেকে। হিসাবটা প্রথম ধাপে হবে প্রয়োজনের জিনিষগুলির পরি-মাপে এবং পরের ধাপে হবে টাকার অঙ্কে। কিন্তু, জীবন ধারণের জন্য নূনাতম প্রয়োজন কী এবং কতটা তা নিয়ে মত ভেদ থাকতে পারে। আর তা'ছাড়া জীবন ধারণ বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। জীবন ধারণ কি শুধুই মৃত্যু নিবারণ, না তার চেয়ে বেশি কিছু—এবং যদি বেশি হয় তাহলে কতটা বেশি? এই ন্যূনতম মান বলতে আমরা কী বুঝবো সেটা অনেকটা জৈব প্রয়োজন এবং খানি-কটা আমাদের বিচার বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ নিয়ে একটি হিসাব করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। তাতে দেখা যায় যে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যসূচী অনু-সারে মাথাপিছু মাসিক কুড়ি টাকা—অর্থাৎ বার্ষিক ২৪০ টাকা হলে জীবন ধারণের স্বল্পতম প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। গত দশ বছরে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ—অর্থাৎ বর্তমান মূল্যসূচী অনুসারে দারিদ্র্যের সীমারেখা টানা যেতে পারে মাথাপিছু মাসিক প্রায় সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকায় বা বার্ষিক ৪৫০ টাকায়। স্বামী স্ত্রী ও দু'টি সন্তানের পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটবে যদি তাদের মাসিক আয় অন্ততঃ ১৫০ টাকা হয়।

আয় বন্টনের যে হিসাব আমরা পাই তা থেকে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রায় ২২ কোটি লোক এই সীমারেখার নীচে আছে। গত কুড়ি বছরে এই সংখ্যাটা কমে নি, তবে মোট জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে আনুপাতিক হারটা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনো এই হিসাব অনুসারে আমাদের দেশের জনসংখ্যার দুই পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা চল্লিশ ভাগ দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে। এই হিসাবটাতে অনেকখানি ভুল

[illegible]সাবতী প্রকল্পের একাংশ

থাকতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্যের অবলুপ্তির সমস্যাটা যে কত বড় সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

টাকা বা সরকারি খরচের তারতম্য করে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, আমাদের বিভিন্ন আয়-স্তরের সর্ব্বোচ্চ এক দশমাংশের আয় থেকে যদি বছরে ৮০০ থেকে হাজার কোটি টাকার মত আয় কোন উপায়ে নীচে স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সর্বনিম্ন স্তরগুলিকে একটা গ্রহণ-যোগ্য আয় স্তরে আনা যাবে। ঠিক কী-ভাবে এটা করা যায় সেটা কেউ বলতে পারেন নি। উপরের স্তরের লোকদের প্রথমে বেশি আয় উপার্জন করতে দিয়ে তারপরে ট্যাক্স-ইত্যাদির মাধ্যমে সেই আয়কে হস্তান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ—বিশেষত যখন আয় স্তরের সর্বোচ্চ এক দশমাংশের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের বর্তমান আয়ে সন্তুষ্ট নয়। আমাদের দেশের নিম্নতম আয়ের তুলনায় যাদের আয় খুবই উঁচু, তাদের মধ্যে শুধু শিল্পপতি, ব্যবসায়ী বা বড় চাকু-রিয়ারাই নেই—তাদের মধ্যে আছে অফি-সের কেরানী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুর।

একথাও বলা হয়েছে যে, আর্থিক উন্নতি যেভাবে চলেছে তাই যদি চলে, তা-হলেও ধীরে ধীরে নীচের স্তরে আয়ের উন্নতি হবে। এর উত্তরে সহজেই বলা যায় যে, আমাদের আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে এই কর্মপন্থায় প্রায় অর্ধশতাব্দী লেগে যাবে। পরিকল্পিত অর্থনীতির যৌক্তিকতার মূল কথাই হোল যে কাম্য উন্নতি দ্রুতহারে আসতে হবে। দুই পুরুষ পরে দুঃখ ঘুচবে এই সম্ভাবনাতে বর্তমান দরিদ্র জনগণ সন্তুষ্ট থাকবে না। এই অসন্তোষের অর্থনৈতিক পরিণাম আশংকাজনক, রাজনৈতিক পরিণাম ভয়া-বহ।

এই জন্যই দারিদ্র্য সমস্যার সমা-ধানের জন্য সুপরিকল্পিত সরাসরি কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের মোট উৎ-পাদনের কতটা হবে বর্তমানে ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্যের এবং কতটা হবে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য 'উৎপাদক' দ্রব্যের সে, সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত প্রথমেই নেওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়; কারণ আমাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতার কতটা আমরা বর্তমানের ভোগে কাজে লাগাবো আর কতটা লাগাবো ভবিষ্যতের ভোগ্য-দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এটা মূলত: সামাজিক বিচার বুদ্ধির সমস্যা—এবং সেদিক থেকেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নেবার পরের সমস্যা হোল, যে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন আমরা বর্ত-মানে ও ভবিষ্যতে বাড়াতে চাই সেগুলি কী। দুই কোটি টাকার মোটা সুতীবস্ত্র উৎপন্ন করলে জাতীয় আয় (এবং ভোগ্য-দ্রব্য উৎপাদন) বাড়ে, দুই কোটি টাকার নাইলনের শাড়ী তৈরী করলেও টাকার অঙ্কে একই ফল হবে,-আমরা কোনটা বেছে নেব? বহুসংখ্যক সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত করে, প্রশাসন ব্যবস্থা জটিলতর করে যদি দুই কোটি টাকা বেশি খরচ করা হয় তাহলেও টাকার হিসাবে জাতীয় আয় বাড়ে, কিন্তু দরিদ্র জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি তাতে নাও হতে পারে।

দারিদ্র্যের অবসান যে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য তাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন

দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের পাওয়ার সুইচ-ইয়ার্ড
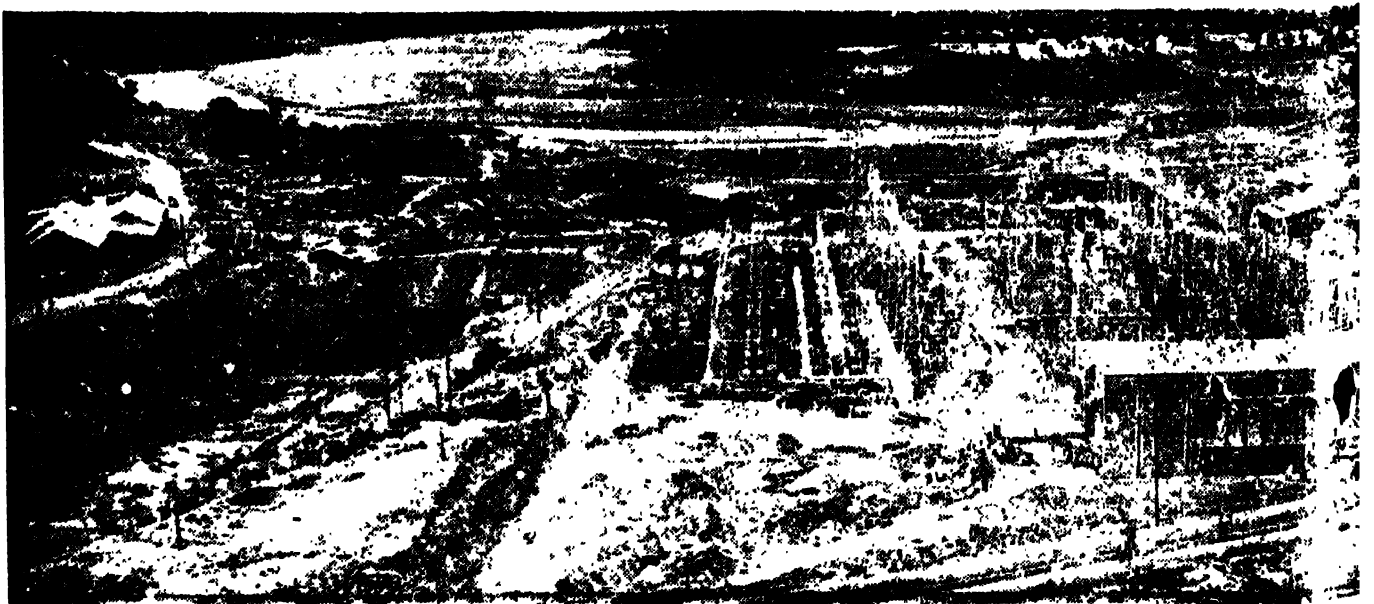
পরিকল্পনা ( এবং সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের পরিকল্পনা ) এমন ভাবে করতে হবে যাতে দরিদ্র শ্রেণীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়ে। এটা দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, যে জিনিষের সংস্থান দরিদ্র শ্রেণী নিজেদের আয় থেকে করতে পারবে না সেগুলি সরকারি ব্যয়ে সর্বসাধারণের কাছে সহজ প্রাপ্য করে দেওয়া—যথাসম্ভব, বিনামূল্যে। শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। যে ক্ষেত্রে একেবারে বিনামূল্যে দেওয়াতে অসুবিধা হতে পারে, সেখানে এমন ভাবে মূল্য স্থির করা উচিত যাতে দরিদ্র শ্রেণী সহজেই জিনিষগুলি পেতে পারে—যেমন চাষের জল, বিদ্যুৎ, সার, পরিবহণ ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন পরিকল্পনায় জোর দিতে হবে সেই সব জিনিষের উপরে যেগুলি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য। খাদ্য ও বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত হবে না। সস্তা গৃহনির্মাণের মালমশলা, জীবনকে সহজতর করবার জন্য যেমন জিনিষের প্রয়োজন সেগুলি ( যেমন জুতা ও ছাতা, সস্তা থালা বাসন ) উৎপন্ন করতে হবে অনেক বেশি করে। এসব করতে গেলে অনেক বিলাস-দ্রব্যের কারখানার প্রসার বন্ধ করতে হবে। আমদানি করা বিলাসদ্রব্যের বদলে দেশী বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে দেশের বড় সমস্যার সমাধান হয় না ; এটা আমরা অনেকদিন বুঝতে চাইনি।

এই ধরণের উৎপাদন নীতি গ্রহণ করলে অবশ্য অন্য সমস্যা উঠবে। সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি যদি বেসরকারি উৎপাদন সংস্থার মাধ্যমে করতে হয়, তাহলে লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন উঠবে। এখনই আমরা দেখতে পাই যে, দেশের বহু লোক যথেষ্ট কাপড় পায় না ; কিন্তু এদিকে কাপড়ের কারখানাতে অবিক্রীত বস্ত্রের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই আপাত-বিরোধী সমস্যার সমাধান করতে হলে, যাদের জন্য জিনিষ তৈরী হবে তাদেরই আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে উৎপন্ন জিনিষের জন্য চাহিদা বাড়তে পারে। এই শ্রেণীর আয় বাড়াতে হলে এমন ভাবে পরিকল্পনা নিতে হবে, যাতে তাদের নিয়োগের সুযোগ অনেকখানি প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ একটা ত্রিমুখী পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে দরিদ্র শ্রেণীর নিয়োগ বৃদ্ধি হয়, তাদের আয় বৃদ্ধি হয় এবং তাদের আয় দিয়ে যে সব জিনিষ তারা প্রথমই কিনতে চাইবে, সে সব জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

নিয়োগ বৃদ্ধি নানা ভাবে করা যায় ; কিন্তু এর সুফল পুরোপুরি পেতে হলে এমন কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন যাতে সর্বস্তরে এবং বিশেষতঃ নিম্ন-আয়ের স্তরে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উৎপাদনেই নিয়োগ বৃদ্ধি হয়। এতে নূতন আয় সৃজন, তার থেকে ব্যয় এবং সেই ব্যয়ের লক্ষ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন একই সঙ্গে বাড়বে। এর একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা করতে গেলেই বিপদ আসবার সম্ভাবনা। যদি এমন কাজে নূতন নিয়োগ বেশী করে করা হয়, যাতে সাধারণ লোকের ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়বে না—তাহলে নূতন আয় থেকে যে ব্যয় হবে তার ফলে ভোগ্য সামগ্রীর দাম বাড়বে, অবস্থার উন্নতি হবে না, অসাম্য বাড়বে। আবার যদি এমন ভাবে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো হয় যাতে দরিদ্র শ্রেণীর নিয়োগ বাড়ে না, তাহলে যে বাড়তি জিনিষ তৈরী হবে তার জন্য নূতন চাহিদা তৈরী হবে না, এর ফলে বাজারে মন্দা আসবে, অর্থাৎ সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবার উপক্রম হবে।

দরিদ্র শ্রেণীর নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি, তাদের ব্যয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি এর মধ্যে সমতা রাখতে পারলে পরিকল্পনার অন্যদিকেও সাফল্য আনা সহজ হবে। দরিদ্র শ্রেণীর জন্য সরকারি ব্যয়ে শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদির যে ব্যবস্থা হবে, ভবিষ্যতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে মূলধন দরকার হবে, রপ্তানির জন্য যে সব কাঁচামাল ও শিল্পজাত জিনিষের প্রয়োজন হবে, তার জন্য দরকার হবে নানা ভাবে সঞ্চয়। এর কিছুটা সরকারের হাতে আসবে ট্যাক্স ও ঋণপত্রের মাধ্যমে আর কিছুটা নানা শ্রেণীর উৎপাদকের হাতে আসবে সরাসরি অর্থ বিনিয়োগে, ঋণপত্র ক্রয়ে এবং ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সহায়তায়। পরিকল্পনার একদিক হোল সাধারণ জনগণের ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা ; এর অন্যদিক হোল ভবিষ্যতে আরো উন্নতির পথ প্রশস্ততর করা। বর্তমানের মূলধনী বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে আরো বৃদ্ধি। রপ্তানি বাড়াবার উদ্দেশ্য হোল রপ্তানি অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়ে বর্তমানের ব্যবহার্য জিনিষ আনা কিম্বা ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়াতে পারে এমন জিনিষ আনা। প্রাথমিক নিয়োগ হবে সব দিকেই—ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে, রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ কারখানা ইত্যাদি তৈরীতে, রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনে, নানা রকমের সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে, প্রশাসনের উন্নতিতে। এই নিয়োগ যাতে সবস্তরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনের জিনিষপত্র যাতে সকলের কাছে সহজ প্রাপ্য হয় এমন পরিকল্পনাই আমাদের ভবিষ্যতের অপরিহার্য কর্মপন্থা হবে।

উপরে যা বলা হোল তার মধ্যে

বিশেষ ভাবে নূতন কিছুই নেই, শুধু আছে গত কয়েক বছরে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিকল্পনা তৈরী এবং তার রূপদান করা হয়েছে তার পরিবর্তনের কথা। "নূতন অর্থনীতি" নিয়ে যে একটা কলরব উঠেছে, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আর্থিক উন্নয়ন নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁরা অনেক দিন আগে বলেন নি। মোট উৎপাদন, উৎপন্ন জিনিষের প্রকৃতি, শ্রম নিয়োগ, আয় বন্টন, বিভিন্ন জিনিষের উৎপাদনের পরিকল্পিত গতিবেগ—এই সব নিয়েই আর্থিক পরিকল্পনা—একটাকে বাদ দিয়ে অন্যগুলির দিকে নজর দিলে বা অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কোন একটির দিকে নজর দিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। গত দশ বছরে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার উপরে আঘাত পড়েছে নানা দিকে। একদিকের ব্যর্থতা ঢাকা দিতে গিয়ে অনেক সময় একটা আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন না বেড়ে যদি অপ্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন বেড়ে থাকে সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের দিকেই নজর টেনে আনা হয়েছে। তাছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষের দিক থেকেই সত্যিকারের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার স্থান নেয় নানা ভাবে বিকেন্দ্রীভূত এবং সমন্বয়-হীন সাময়িক প্রকল্প। এতদিন পরে পরিকল্পনার মূলনীতির এবং মূল লক্ষ্যগুলির দিকে আমাদের নজর আবার ফিরে এসেছে। এখন আশা করার সঙ্গত কারণ আছে যে, আমাদের পঞ্চম পরিকল্পনা অর্থনীতির মূলসূত্রগুলি সঠিক ভাবে অনুসরণ করেই রচিত হবে এবং সে পরিকল্পনার রূপদানে প্রশাসনিক বা অন্য কোন প্রতিবন্ধক ভবিষ্যতে আর কার্যকরী হবে না।

হিন্দুস্থান সিপ ইয়ার্ড লিমিটেডের তৈরী ১২,৪০০ ডি. ডবল্যু টির 'বিশ্বমমতা' নামে মালবাহী জাহাজটি বিশাখাপত্তনম বন্দর থেকে ছাড়া হয়েছে। জাহাজটি তৈরী হয়েছে সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের জন্য। * * *

পরিকল্পনা কমিশন ব্যাণ্ডেল পাওয়ার হাউসের একটি সম্প্রসারণ প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩২.২৪ কোটি টাকা। এতে ২০০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি যন্ত্র বসান হবে এবং এই যন্ত্রটি চালু হবে ১৯৭৬-৭৭ সালে। প্রকল্পটি চালু হবার পরের বছরেই এর থেকে শতকরা ভাগ লভ্যাংশ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। * * *

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 'টেনশন মিটার' তৈরীর এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই 'টেনশন মিটার' দিয়ে [illegible] কে. জি. পর্য্যন্ত টেনশনে আছে এমন তারের টেনশন মাপা যাবে। প্রতিটি টেনশন মিটারের দাম হবে ৫০০ টাকা।

* * *

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে ডি. সি. ইলেকট্রিক্যাল ডায়নামোমিটার উৎপাদনের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই ডায়নামোমিটারগুলি এখন বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। [illegible] কোন স্যাফট্ এর যান্ত্রিক ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ইলেকট্রিক্যাল ডায়নামোমিটার ব্যবহার হয়ে থাকে।

হলদিয়া বন্দরের একটি তৈল জেটি
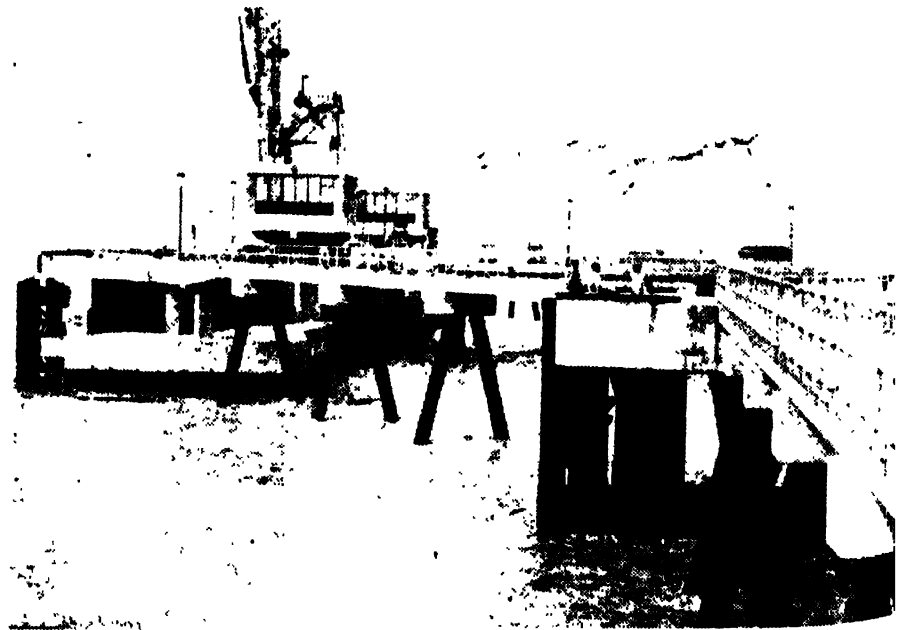
# শ্রী অরবিন্দ বলেছেনঃ

আমরা যতই গভীরভাবে চিন্তা করি, ততই একটি জিনিষের অভাব আমাদের কাছে আরো বেশী করে মনে হয়, সব কিছুর আগে যা লাভ করবার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি, তা হ'ল শক্তি -দৈহিক মানসিক ও নৈতিক। কিন্তু এ সবের ওপরে আছে আধ্যাত্মিক শক্তি —অফুরন্ত, অবিনশ্বর-যা হ'ল অন্য সমস্ত শক্তিরই উৎস। আমরা যদি শক্তিমান হই, তা হ'লে সব কিছুই আমাদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আসবে। শক্তির অভাবে আমরা স্বপ্নে অচেতন মানুষের মত—যার হাত আছে, কিন্তু কোন কিছু ধরতে পারে না বা তা দিয়ে কোন কিছুকে আঘাত করতে পারে না—যার পা আছে, কিন্তু দৌড়তে পারে না।

আমাদের আহ্বান তরুণ [illegible]রতের কাছে—এই তরুণের [illegible]ই এক নতুন জগৎ গড়ে [illegible]বে-তারা অন্তরে ও হৃদয়ে [illegible] হয়ে এক পূর্ণ সত্তাকে [illegible]কার করে নিতে এবং এক [illegible]ত্তর আদর্শের জন্য কাজ [illegible]রে যেতে পারবে। তারা [illegible]বে এমন মানুষ, যারা বর্তমান ও অতীতের কাছে নয়, শুধু ভবিষ্যতের কাছেই আত্মোৎসর্গ করবে।

তিনি এই বিশ্বনিখিলেরও সীমার বাইরে—(Supra-cosmic)-তিনি পরম ব্রহ্ম-যিনি তাঁর অনন্ত অসীম স্বত্তা নিয়ে যুগ ও কালের মধ্যে সসীম তাঁর মূর্ত প্রকাশ এই নিখিল সংসারকে ধারন করে রেখেছে।

যা আমি বলতে চেয়েছি, তা হ'ল এই প্রোলেটারিয়েটের দ্বারাই কেবল ঠিকভাবে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব। এরা জড়, এরা অবশ, অসাড়—স্পষ্টতঃ এদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই--কিন্তু এরাই হ'ল বিরাট সুপ্ত শক্তির উৎস, যে এদের শক্তি উপলব্ধি করতে পারে, এদের শক্তিকে প্রকট করে তুলতে পারে, সেই ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। সুতরাং শ্রী মদ্‌ভাগবত গীতার শিক্ষক শুধু নররূপী ভগবানই নন—যিনি নিজে সপ্রকাশ জ্ঞান, পরন্তু তিনি সমগ্র কর্ম জগতকে পরিচালিত করছেন-যাঁর জন্যে সমস্ত মানব সংসার বেঁচে আছে, সংগ্রাম করে চলেছে, কাজ করে চলেছে-যাঁর দিকে সমগ্র মানব সংসার স্থিরলক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তিনিই হলেন সমস্ত কর্ম ও ত্যাগের গোপন নিয়ন্ত্রক এবং সর্ব মানবের পরম সখা।

# সংবিধান ও ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক ন্যায়বিচার


টি. পি. টোপে

উপাচার্য, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়


সংবিধানের প্রস্তাবনাতে দেশের টি নাগরিকের জন্য সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার কার কথা বলা হয়েছে। এই সামাজিক নৈতিক ন্যায়বিচার সম্বন্ধেই বিস্তারিত ব আলোচনা করা হয়েছে সংবিধানের নি প্রধান অনুচ্ছেদগুলিতে।

## সামাজিক ন্যায়বিচার

আইনের চক্ষে দেশের প্রতিটি রিকের সমতার কথা সংবিধা- র ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা ছে। এই ব্যাপারটিকেই আরও রিষণ করে বলা হয়েছে ১৫ নং চ্ছেদে। এখানে বলা হয়েছে, জাতি, , গোষ্ঠি, জন্মস্থান এবং স্ত্রী পুরুষ বিশেষে সকল নাগরিকই আইনের চক্ষে ন। কিন্তু এদেশে যুগ যুগ ধরে জের একটি অংশ ( অনুন্নত শ্রেণী ) কিয়ে পড়ে আছেন। এঁদের এই চাপের জন্য এঁরা কোন ভাবেই দায়ী । সামাজিক ন্যায়বিচারের তাগিদেই দেরকে দেশের উন্নত অংশের সঙ্গে একই র আনা প্রয়োজন। এই তপশীলিভুক্ত তি, উপজাতি অথবা শিক্ষা ও সামাজিক ক থেকে অনুন্নত জনসমষ্টির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেই সংবিধানে এঁদের জন্য বিশেষনীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ১৯৫১ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ( ১ম সংশোধন )। মাদ্রাজ সরকারের এক নির্দেশনামায় স্কুল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে এবং সরকারী চাকরিতে প্রবেশের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। স্পষ্টতই এই নির্দেশ সংবিধান বিরোধী। তাই সুপ্রিম কোর্ট চম্পাকন মামলা ( ১৯৫১, এস. সি. আর ৯২৫ ) এবং শ্রীনিবাসন মামলার ( ১৯৫১, এস. সি. আর ৩১১ ) রায়দান কালে এই নির্দেশনামাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। তখন সংসদ সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। সং- শোধিত ব্যবস্থায় আরও বলা হল যে, যদি কোন চাকরিতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির যথোপযুক্তভাবে প্রতিনিধিত্ব হয়নি বলে রাষ্ট্র মনে করেন, তা হলে ঐ শ্রেণীগুলির জন্য চাকরিতে কিছু সংখ্যক পদ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকবে।

সংবিধান সভার সভাপতি ভারতের সংবিধানে স্বাক্ষর করছেন।

## অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাতে দেশ থেকে সমূলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। আইন সভা ১৯৫৫ সালে 'আনটাচেবিলিটি অফেন্সেস্ অ্যাক্ট' প্রণয়ন করলেন। এই আইনে অস্পৃশ্যতা তা সে যে কোন রকমেরই হোক দণ্ডনীয় অপরাধ বলে স্বীকৃত হল।

অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, এদের কি পরিমাণে উন্নতি ঘটছে তা দেখাও দরকার। তাই সংবিধানের ৩৩৮ নং অনুচ্ছেদে তফশীলিভুক্ত জাতি এবং উপজাতিগুলির জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ আধিকারিকের কাজ হল রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী সময়ে সময়ে তপশীলিভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য নিরাপত্তা- মূলক ব্যবস্থাগুলি কতখানি কার্যাকরী

হচ্ছে, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে জানানো। তপশীলিভুক্ত জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির শাসনতান্ত্রিক কার্যকর্ম এবং তাদের উন্নয়ন কি পরিমাণে হচ্ছে তা সমীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি কমিশন গঠন করার ক্ষমতাও সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছেন। এই সমীক্ষার রিপোর্টে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হবে সেগুলি যাতে ঠিক ভাবে কার্যকরী হয়, সে উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সংবিধানের ৩৩৯ নং অনুচ্ছেদে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় সরকার তপশীলিভুক্ত উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনা এবং সেগুলি কার্যকরী করার বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেবেন।

এই ভাবে সংবিধান রচয়িতাগণ প্রতিটি নাগরিকের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের কাছে সকল নাগরিককে সমান করে দেখার জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা রেখেছেন। ভারতের সমাজে যদি সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার না প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে সে দোষ সংবিধানের নয়, সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলিকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব যাঁদের—সে দোষ তাঁদের।

## অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

জীবন ধারণের জন্য আবশ্যিক জিনিষপত্র যে স্বাধীন দেশে নাগরিকের কাছে সুলভ নয়, সে দেশে স্বাধীনতা অর্থহীন। সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে রাষ্ট্রনীতির নির্দেশমূলক অনুজ্ঞাগুলিতে (Directive principles of state policy) তাই নাগরিকের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩৯ নং অনুচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলি পূরণ করার উদ্দেশ্যে তার নীতি প্রয়োগ করবে।

(১) জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত পেশা গ্রহণের অধিকার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের থাকবে।

(২) সামাজিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা এমন ভাবে বন্টন হওয়া প্রয়োজন, যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণে সবজনের কল্যাণ সাধিত হয়।

(৩) দেশের অর্থ ব্যবস্থা এমন ভাবে চালিত হওয়া উচিত নয়, যার দ্বারা সম্পদ এক এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হতে পারে এবং উৎপাদন সাধনের ক্ষেত্র এমন হওয়া উচিত নয়, যার ফল জনস্বার্থ বিরোধী হয়।

(৪) রাষ্ট্রে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান পরিমাণ পরিশ্রমের জন্য সম পরিমাণ পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৫) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রমিক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তি যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং বালক-বালিকাগণ অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তাদের বয়স ও দৈহিক শক্তির পক্ষে ক্ষতিকারক এমন পেশা গ্রহণে যাতে বাধ্য না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৬) শিশু ও তরুণ উভয়কেই নৈতিক ও বাস্তব দিক থেকে অধঃপতন ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৪৩ নং অনুচ্ছেদে সমস্ত শ্রমজীবির জন্য সুস্থ ও সুন্দর ভাবে জীবনযাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মের অবস্থা সৃষ্টি করতে, উপযুক্ত পরিমাণ বেতনের ব্যবস্থা করতে, তাদের জন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত ক[...] রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪৬ নং অনুচ্ছেদে সমাজের দু[...] অংশের কাছে অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ব[...] সুযোগ সুবিধা আরও সুলভ করে [...] জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে র[...] নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে [...] আইন রচনা কালে এই নীতিগুলির [...] করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, কেন না, এগুলি [...] দেশ শাসন করার মূল ও প্রাথমিক [...] সংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা [...] নীতি অনুসরণে অনেক আইন [...] করেছেন, কিন্তু সেগুলির অনেক[...] সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত নাগ[...] মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য [...] করে না। তাই সুপ্রিম কোর্ট এই [...] গুলিকে অবৈধ ঘোষণা করে[...] আইনগুলি যে যে মৌলিক অধিকারের সঙ্গতি রক্ষা করে না, সেগুলি হল :

অনুচ্ছেদ ৩১ (১)

বিনা আইনে কোন লোককেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

অনুচ্ছেদ ৩১ (২)

কোন আইন বলেই রাষ্ট্র জন[...] কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দখল করতে পারবেন না, যদি না সেই অ[...] দখলীকৃত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপ[...] ব্যবস্থা থাকে অথবা ক্ষতিপূরণের প[...] বা সেই পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ নীতির কথা বলা থাকে।

## জমিদারী প্রথা বিলোপ

কৃষকদের জন্য সামাজিক ও অর্থ[...] ন্যায়বিচার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং [...] আর্থিক উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র এবং ভূমি[...] মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপ করার [...] গ্রহণ করা হয় এবং জমিদারী প্রথা [...]

ইন প্রণয়ন করা হয়। এ ব্যাপারে থিকৃত হল ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ ী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইন। সুপ্রিম র্ট (পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম বেলা নার্জী (১৯৫৪ এস. সি. আর ১৮) মামলার রায়ে মন্তব্য করেন, উক্ত ইনে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে, তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। সবের ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে নিম্নোন্নয়নের নান পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এবং রাষ্ট্র তির নির্দেশমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে কার্য্যে রিণত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং ভবিষ্যতে সুপ্রিম কোর্টের ক থেকে যাতে এ ব্যাপারে আর কোন ধা না আসে সে জন্য সংবিধান সংশোধন রা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সংশোধনের দ্দেশ্য হল :

রাষ্ট্র ও ভূমিকর্ষকের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয়েছে। এখন মাদের পরবর্তী লক্ষ্য হল, চাষযোগ্য মির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া। ই পরিমাণের অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের ধ্যে বন্টন করা হবে এবং জমির মালিক বং ভাগচাষীদের ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত ধিকার সংশোধন করতে হবে।

গ্রাম ও শহরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত রিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বস্তি অপসরণ এবং পতিত জমি উদ্ধার করা য়োজন।

(৩) জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই ষ্ট্রকে দেশের যাবতীয় খনিজ এবং তৈল ম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করতে বে। এ জন্য বিভিন্ন লাইসেন্স, ইজারা ease) ইত্যাদি সংক্রান্ত চুক্তিগুলি বাতিল করে দেওয়া বা সেগুলিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকবে। সব জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণকে আলো, বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের থাকবে।

(৪) কোন সম্পত্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ করে তোলার জন্য বা অনেক সময় জনস্বার্থের খাতিরে কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সম্পত্তির পরিচালন-ভার কিছুকালের জন্য সরকারের নিজহাতে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অস্থায়ী ভাবে এই ধরণের পরিচালনভার হস্তান্তরকে আইন সিদ্ধ করার জন্য সংবিধানে উপযুক্ত আইনের ব্যবস্থা থাকবে।

(৫) কোম্পানি আইনে কিছু কিছু সংশোধনের কথা এখন ভেবে দেখা হচ্ছে। সংশোধনগুলি যেমন : ম্যানেজিং এজেন্সি সিস্টেম তুলে দেওয়া, জাতীয় স্বার্থে বাধ্যতামূলকভাবে দুই বা ততোধিক কোম্পানির একত্রীকরণ করা, এক কোম্পানির হাত থেকে অপর কোম্পানির হাতে কোন একটি উদ্যোগ হস্তান্তর করা ইত্যাদি ব্যাপারে যাতে কোন রকম আইনগত বাধা না দেখা দেয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই সব সংশোধন সম্বলিত বিলটি পাশ হয় সংবিধান (চতুর্থ) সংশোধন বিল আইন (১৯৫৫) হিসাবে। এর দ্বারা সংবিধানের ৩১ (২) এবং ৩১ (৪) অনুচ্ছেদ দুটি সংশোধন করা হয়েছে।

এই সংশোধনের ফলাফল কি ?

(১) জনস্বার্থে রাষ্ট্র যদি কোন সম্পত্তি অধিকার করেন, সেক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে না ; আইন সভাই ঠিক করবেন ক্ষতিপূরনের পরিমাণ।

(২) জমিদারি, ইজারা নেওয়া খনি, ম্যানেজিং এজেন্সি সংক্রান্ত অধিকার ইত্যাদি কয়েক ধরণের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরনে রাষ্ট্রায়ত্ত করা আইন সঙ্গত হবে।

এই বৈপ্লবিক ধরণের চতুর্থ সংশোধন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রনীতির নির্দেশমূলক অনুজ্ঞাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা। এই সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের ১৪,১৯ এবং ৩১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলি বাতিল হয়ে যাবে।

## বিচার বিভাগীয় ভাষ্য:-

রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণের ক্ষমতা আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাবার পরও দেখা গেছে যে, সুপ্রিম কোর্ট কোন না কোন বিষয়ে এই প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করেছেন। এই বিরোধ চরমে ওঠে ১৯৬৭ সালে গোলক নাথ মামলাকে কেন্দ্র করে। এই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন, নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের অধিকার আইন সভার নেই। এই মামলার রায় অনুসারে সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের অধিকার থেকেও আইন সভা বঞ্চিত হ'ল।

এখন আইন সভার সামনে দুটি প্রশ্ন : ভবিষ্যতে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে গোলক নাথ মামলার রায়কে নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হবে, অথবা সংবিধান সংশোধন করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি আইন সভার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ২৪তম সংশোধনের জন্য আইন সভায় বিল আনা হল। বিলের সারমর্ম হ'ল, সংবিধানের যে কোন অংশ, এমনকি মৌলিক অধিকার সম্বলিত অংশটির সংশোধন করার অধিকারও আইন সভার থাকবে। এই ধরণের সংশোধনী বিলে সম্মতি দেওয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষেও বাধ্যতামূলক হবে। কোন রাষ্ট্রপতি যদি এ ধরণের বিলে সম্মতি দিতে

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের বায়ু সেনা এখন জেট যুগে প্রবেশ করছে। জেট যুগে প্রবেশে এশিয়ার মধ্যে ভারতই প্রথম দেশ। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে এখন রয়েছে—ভ্যাম্পায়ার জঙ্গী বিমান, তুফানী (ওরেগণ), মিষ্টিয়রস, হান্টারস্, ও ন্যাট। আরও আছে মারুত (এইচ. এফ-২৪), মিগ্—২১, বোমাবর্ষক ক্যানবরা। এছাড়া আছে এক শক্তিশালী হেলীকপটর বাহিনী।

পাকিস্তানি স্যাবার জেট বিমানের যম ভারতে তৈরী ন্যাট বিমান
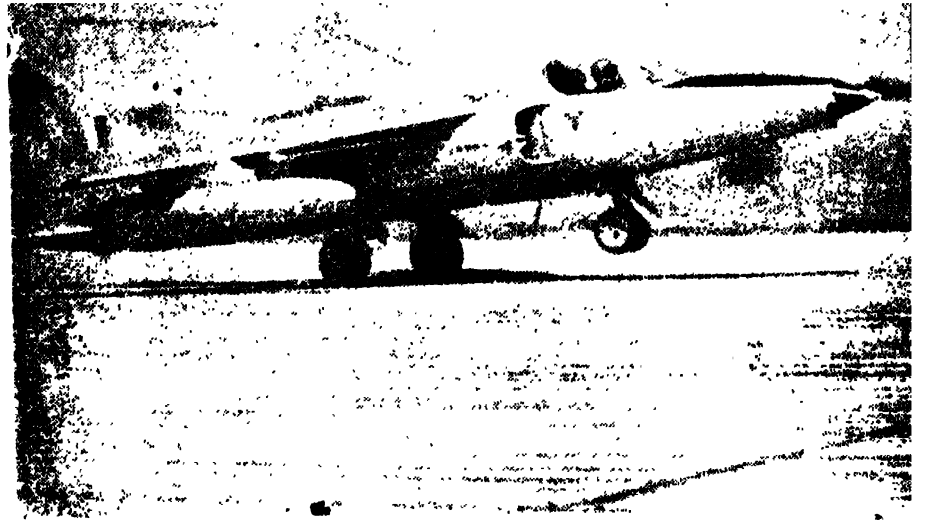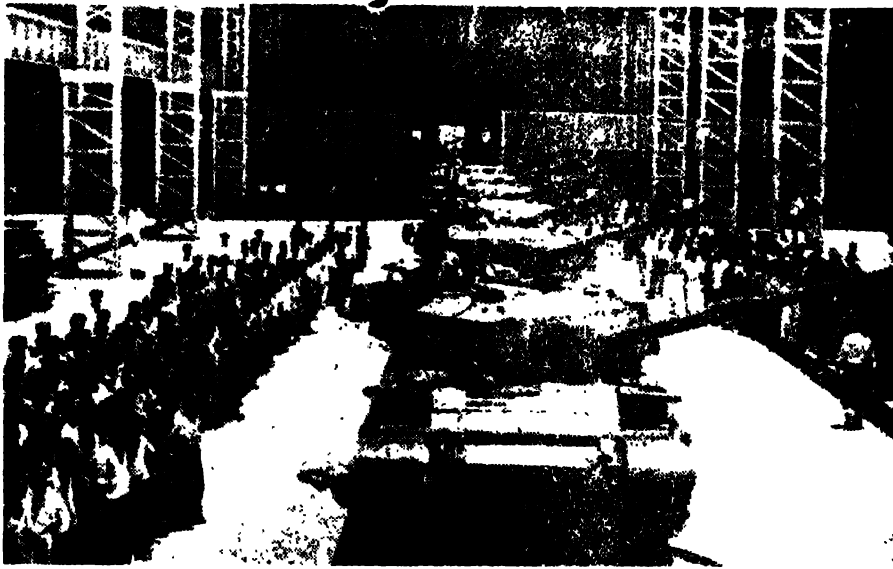
দেশরক্ষায় আমাদের সেনাবাহিনী

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিখণ্ডিত হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী—জল, স্থল ও বায়ু সেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁদের হাতে তখন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জংধরা মান্ধাতার আমলের হাতিয়ার। ঐ সালেই পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ এবং ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে হামলার পর ভারতীয় বাহিনীর পুণর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কাজ জোর কদমে এগিয়ে যায়। নতুন নতুন ডিজাইনের নানা রকম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেশের মধ্যেই তৈরী শুরু হয়। বিদেশ থেকেও কিছু কিছু আধুনিক হাতিয়ার কিছুদিন আমদানী কোরতে হয়। এখন আমরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি দেশরক্ষার ব্যাপারে ভারত স্বাবলম্বী।

আবাদী কারখানায় প্রস্তুত বৈজয়ন্ত ট্যাংক যা পাকিস্তানি ট্যাঙ্ককে কায়েল করে

আমাদের নৌ-সেনা যে কত শক্তিশালী ১৯৭১ সালের যুদ্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানী নৌবহরকে পর্যদস্ত কোরতে ভারতীয় নৌ সেনার বেশী সময় লাগেনি। দু'দিনের মধ্যে পাকিস্তানের বৃহত্তম নৌঘাটি করাচী বন্দর পঙ্গু হয়ে পড়ে।
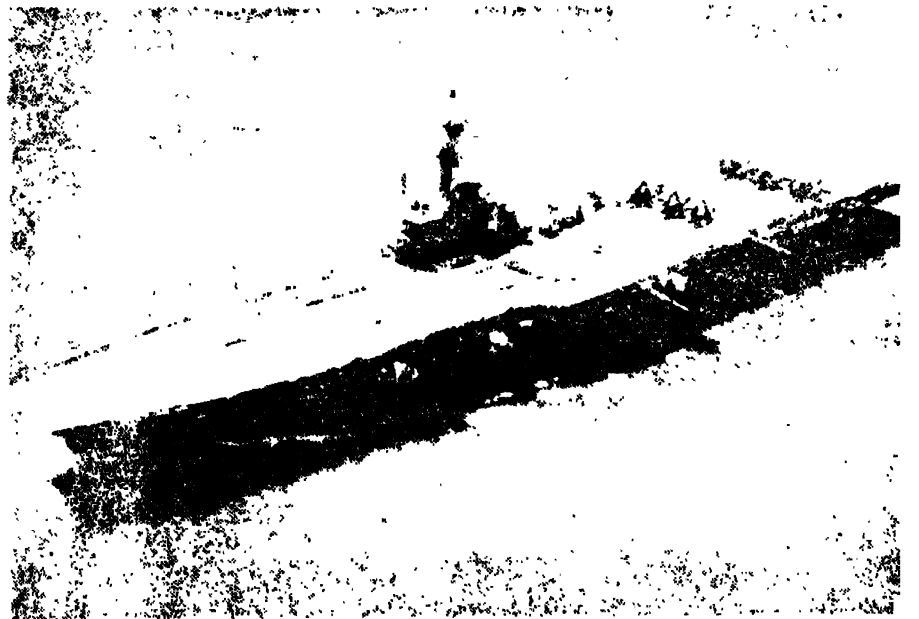
ভারতের প্রস্তুত প্রথম জঙ্গী জাহাজ নীলগিরি। গত ৩রা মে বোম্বাইয়ে প্রধানমন্ত্রী এই জাহাজটিকে জলে নামান।

## সংবিধান ও ক্রমবর্দ্ধমান ন্যায়বিচার

১৯ পৃষ্ঠার পর

অস্বীকার করেন, তার অর্থ হ'ল সংবিধানের অবমাননা করা ; এজন্য রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত করা চলবে। এইভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন প্রগতিশীল আইন প্রণয়নের পথে সব আইনগত বাধা এই সংশোধনের মাধ্যমে দূরীভূত হ'ল।

### ২৫ তম সংশোধন

১৯৬৫ সালের বাজরাভেলু মামলা (এ. আই. আর' ১৯৬৫, এস. সি. আর. ১০২৪) থেকে আরম্ভ করে ১৯৭০ সালের ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ মামলা (আর. সি. কুপার বনাম ভারতীয় য়ুনিয়ন—এ. আই. আর. ১৯৭০, এস. সি. আর. ৫৬৪) পর্য্যন্ত বিভিন্ন মামলার রায় থেকে সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্ভূত বাধাবিপত্তি দূর করাই হ'ল ২৫ তম সংশোধনের উদ্দেশ্য। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য হ'ল : বাধ্যতামূলকভাবে অধিকৃত সম্পত্তির ব্যাপারে, সম্পত্তি অধিকারের সময় সম্পত্তির যা মূল্য ছিল, তার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয় নীতিগুলির যদি কোন সম্বন্ধ না থাকে বা ক্ষতিপূরণ যদি নেহাৎই অলীক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আইন সভা তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে এবং সে কারণে আইনটি অসিদ্ধ। দ্বিতীয়োক্ত মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারণের ব্যাপারে আইনে যে নীতির কথা উল্লেখ আছে, তা শুধু প্রাসঙ্গিক হবেই হবে না, তা স্বীকৃতও হতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে অধিকৃত সম্পত্তি বা যে সম্পত্তি অধিকার করতে চাওয়া হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারণের নীতি প্রযোজ্য হতে হবে এবং যে বিশেষ ধরণের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করা হবে তা যেন তার পক্ষে উপযুক্ত হয়।

বাধ্যতামূলকভাবে অধিকৃত সম্পত্তির ব্যাপারে চতুর্থ সংশোধনী আইনে যদিও ক্ষতিপূরণের পর্য্যাপ্ততার প্রশ্নটি বিবেচনা করার ক্ষমতা আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে, তবুও আদালত এ থেকে বিরত হন নি এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথেষ্ট নয় বলে এ সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক একটি আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। এই কারণেই ২৫ তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই আইনের বয়ানে 'ক্ষতিপূরণ' কথাটির স্থলাভিষিক্ত হ'ল 'পরিমাণ' কথাটি। এর ফলে ক্ষতিপূরণের অপর্য্যাপ্ততার কারণ দর্শিয়ে এই বিষয়ক আইনটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার সম্ভাবনা লোপ পেল। ২৫ তম সংশোধন আইনে আরও বলা হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণের পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ নগদ টাকা ছাড়াও অন্যভাবে দেওয়া চলবে।

এই সংশোধন আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হ'ল এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ (Section-3)। এই পরিচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের ৩৯নং ধারার (খ) বিভাগে বর্ণিত নির্দেশমূলক অনুজ্ঞাগুলিকে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ৩৯নং ধারার (খ) ও (গ) বিভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রনীতিগুলিকে অকার্য্যকরী বলে ধরে নেওয়া যাবে না, এই কারণে যে এগুলি সংবিধানের ১৪,১৯ এবং ৩১নং ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। এই পরিচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে, এই রাষ্ট্রনীতিগুলিকে কার্য্যকরী করতে চায় এমন কোন আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা যাবে না কারণ সেগুলি ১৪,১৯ এবং ৩১নং ধারাকে কার্য্যে পরিণত করে না। এই ভাবে রাষ্ট্রনীতির নির্দেশমূলক অনুজ্ঞাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার পথে যাবতীয় বাধা বিপত্তিগুলি এই সংশোধনগুলির দ্বারা দূরীভূত হ'ল।

### রাষ্ট্রের দায়িত্বঃ-

রাষ্ট্রনীতির নির্দেশমূলক অনুজ্ঞাগুলি কার্য্যে পরিণত না হওয়া অবধি অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে জার্নাল অব কনস্টিটিউসনাল এণ্ড পার্লামেন্টারী ষ্টাডিসে (এপ্রিল-জুলাই, ১৯৭১-পৃষ্ঠা-১৫৯) প্রকাশিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রী হেগড়ের মন্তব্য হ'ল:

"সংবিধানের তৃতীয় খণ্ড (মৌলিক অধিকার বিষয়ক) রাষ্ট্রের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেগুলি মূলত নেতিবাচক দায়িত্ব। এতে কতকগুলি কাজ থেকে বিরত থাকতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশগুলির লঙ্ঘণ আইনসঙ্গত, কেন না, এই নির্দেশগুলির প্রকৃতিই এমন, যার ফলে এগুলিকে আদালতের সাহায্যে সহজেই কার্য্যকরী করা সম্ভব। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত ধারাগুলি (রাষ্ট্রনীতির নির্দেশমূলক অনুজ্ঞাগুলি) হ'ল স্পষ্ট ও বিমূর্ত। এখানে সামাজিক প্রগতি লাভের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা স্বভাবতই প্রাথমিক কাজ। এই নির্দেশগুলির প্রকৃতি এমন যে, এগুলিকে আদালতের সাহায্যে কার্য্যকরী করা চলে না। সুতরাং সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত নির্দেশগুলির চেয়ে চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত নির্দেশগুলি গুরুত্বের দিক দিয়ে কোন অংশেই হীন নয়।"

ভারতীয় হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা শুধু তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জনসাধারণ কঠোর ও পরিশ্রমী জীবন

২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

# আমাদের শিল্প ব্যবস্থায় ফাঁক ও সরকারী নীতি

সুব্রত গুপ্ত

গত দশকের শিল্পোন্নয়নের ধারা বিচার করলে দেখা যায় আমাদের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি খুবই মন্থর গতিতে হয়েছে। শিল্পোৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়েছিল ১৯৬৩ সালে : যে বছর শিল্পোৎপাদন ১৯৬২ সালের তুলনায় ৯'৪ শতাংশ বেড়ে ছিল। তারপর থেকে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমের দিকে গেছে। ১৯৬৭ সালে সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছিল ১'৪ শতাংশ; কিন্তু ভোগ-সামগ্রী শিল্পের উৎপাদন [illegible] ৩'৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল। তবে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে [illegible] সামান্য উন্নতি হয়। ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল যথাক্রমে ৬'৪ শতাংশ, ৭'১ শতাংশ এবং ৪'৩ শতাংশ, ১৯৭০-৭১ সালে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১'৬ শতাংশ, যদিও লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৯ থেকে ১০ শতাংশ।

কেন শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হয়নি তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে আমাদের শিল্প কাঠামোয় অনেক ফাঁক রয়ে গেছে, অর্থাৎ যা করা উচিত অথবা যতটা করা উচিত, সেই অনুপাতে অনেক কিছুই করা হয়নি অথবা সম্ভব হয়নি। উন্নতিকামী দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অনেক বাধা থাকে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সমান ভাবে হয়না,—এবং আন্তঃক্ষেত্র ভারসাম্যহীনতা শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির গতিকে ব্যাহত করে। শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে যে বাধা আমরা দেখতে পাই তার কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের শিল্প কাঠামো ও শিল্পনীতির মধ্যে।

আমাদের শিল্প ব্যবস্থার প্রধান ফাঁক হল কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ২০০টি ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পে একটি সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৭০টিরও বেশি শিল্পে উৎপাদন সামর্থ্যের ৫০ শতাংশও ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয়নি। কাঁচামালের অভাব ও উৎপাদনের সরবরাহ সম্পর্কে অসুবিধা (input constraints) এই শিল্পগুলির পক্ষে তাদের উৎপাদনী শক্তি বা সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করতে না পারার কারণ। ইস্পাত শিল্প, ভারী রসায়ন শিল্প, তৈলবীজ, প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদনী শক্তির সদ্ব্যবহার হয়নি তার প্রধান কারণ হল কাঁচামালের অভাব। লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে এই শিল্প মন্দার ভাব খানিকটা কাটিয়ে উঠলেও ১৯৭০ সালে তার উন্নতিতে ভাঁটা পড়ে। ১৯৬০ সালের উৎপাদন সূচী ১০০ ধরলে ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে যেখানে উৎপাদন হার যথাক্রমে ৪.১১ শতাংশ এবং [illegible] ৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল, ১৯৭০ সালে তা ৬[illegible] শতাংশ কমে গিয়েছিল। পাঁচটি সুপ্রতিষ্ঠিত ইস্পাত কারখানার মধ্যে তিনটি ইউনিটে (তার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে দুটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ১টি) উৎপাদন কমে গিয়েছিল। তৃতীয় সরকারী ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন বেড়ে ছিল মাত্র ২ শতাংশ এবং অপর একটি বেসরকারী কারখানার উৎপাদন স্থির পর্যায়ে ছিল। তার ফলে এই কারখানাগুলির উৎপাদনী শক্তির পুরোপুরি ব্যবহার হয়নি। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে উৎপাদনী শক্তির ব্যবহার বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় যেভাবে কমে যায়, তা হল,—দুর্গাপুরে ৫১ শতাংশ থেকে ৪[illegible] শতাংশ, রাউর কেল্লায় ৬[illegible] শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশ, এবং ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীতে ৭[illegible] শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশ। কাঁচামালের অভাব ছাড়াও অশান্ত শিল্প সম্পর্ক, জীর্ণ ও বিকল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতির পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণে ব্যর্থতা উৎপাদনী ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহার হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানির ভার দুই বছরের জন্য নিজের হাতে নিয়েছেন। ১৯৭২ সালের ১২ই মে তারিখে এই কারখানার উৎপাদন সামর্থ্য ছিল ১০ লক্ষ টন, অথচ ১৯৬৫-৬৬ সালের পর থেকে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছিল। [illegible] সালে এই কারখানায় [illegible] উৎপাদন হয়েছিল ৯,৭০,০০০ টন। ১৯৭১-৭২ সালে এই [illegible] কমে দাঁড়িয়েছে ৬,[illegible] টন। কারখানা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ হল, শ্রমিক অশান্তিই এই উৎপাদন হ্রাস পাবার কারণ। কিন্তু সরকারের যুক্তি হল, কারখানা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবার, জীর্ণ যন্ত্রপাতির পুনর্বাসন করার এবং কোম্পানীর সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ [illegible] করার বিশেষ কোন চেষ্টা

নি।

কয়লা শিল্পের অবস্থাও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৬৯ সালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৭৮.৯১ মিলিয়ন টন, ১৯৭০ সালে তা হয়েছে ৭৫.৭২ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ, এই এক বছরে কয়লার উৎপাদন ৩.১ শতাংশ কমে গিয়েছিল। যে হারে এই শিল্পের উৎপাদন চলছে তা থেকে মনে হয় চতুর্থ পাঁচশালা যোজনার শেষে কয়লা শিল্প উৎপাদন লক্ষ্যের অনেক পেছনে পড়ে থাকবে। ১৯৭১ সালেও উৎপাদনের ধারা একই আছে। কয়লার উৎপাদন কম হওয়ার একটি কারণ হল ইস্পাত কারখানাগুলি এবং রেলওয়ের দিক থেকে চাহিদার ঘাটতি। এক্ষেত্রে চাহিদার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা (demand constraint) থাকায় যোগানের ঘাটতি হয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে কয়লা পাঠানোর ক্ষেত্রেও রেলওয়ে ওয়াগণের স্বল্পতার দরুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির গতি শ্লথ হওয়ার কারণ ছিল প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইস্পাতের অভাব। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত জনপ্রতি ইস্পাত সরবরাহের পরিমাণ ১৬ কিলোগ্রাম থেকে প্রায় ১১ কিলোগ্রাম পর্যন্ত কমে গিয়েছে। যদিও ইস্পাতের দাম ইস্পাত নির্মাণের পর্যায়ে নির্দিষ্ট করা আছে—সাধারণ ক্রেতারা সেই দামে ইস্পাত পান না। অনেক ক্ষেত্রে চোরাকারবারের ফলে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের চেয়েও বেশি দামে ক্রেতাদের ইস্পাত কিনতে হয়। এজন্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলিকে খুবই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে এবং এই প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে তাদের উৎপাদনের পরিমাণও কমে গেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দার সৃষ্টি হওয়ার আরও একটি কারণ হল, শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতি। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট অথবা মালিক পক্ষের দিক থেকে কারখানায় লক-আউট করা উৎপাদনের মাত্রা কমে যাবার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নতুন বিনিয়োগ না হবার অন্যতম কারণ ছিল শান্তি শৃঙ্খলার অভাব। সমগ্র দেশের পক্ষে গত কয়েক বছর ধরে এই কারণটি খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন কম হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে আরও কয়েকটি শিল্পে, যেমন কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাস্, তৈলবীজ এবং কিছু পরিমাণ তুলার ক্ষেত্রে। এই জিনিষগুলির জন্য চাহিদা কতটা বাড়তে পারে সরকারের তা আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল ও সেভাবে যোগান বাড়াবার পরিকল্পনা করা উচিত ছিল; কিন্তু সময়মত তা করা হয়নি।

বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি (power bottle neck) শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পথে আরও একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে সরকারের দিক থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার শেষে বিদ্যুৎ সরবরাহ লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট কম হবে।

শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতিও দেশে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির গতিকে মন্থর করেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও বহু কলকারখানা গত তিন বছর যাবৎ বন্ধ আছে। সরকারী প্রচেষ্টায় কয়েকটি কারখানা অবশ্য খুলেছে। যদিও গত এক বছর যাবৎ দেশে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে কিছু উন্নতি হয়েছে, তবুও বহু কলকারখানায় এখনও শ্রমিকরা ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করে চলেছেন এবং মালিকরাও শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণগুলি দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঘেরাও, সময়মত কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা এখনও চলছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের যে কতটা ক্ষতি হয় এবং উৎপাদন হ্রাস পেলে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই অসুবিধা-এটা তাঁরা বুঝতে চান না।

ভোগ-সামগ্রী শিল্পগুলির উন্নয়নেও যথেষ্ট ফাঁক রয়ে গেছে। বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সামগ্রিক ভাবে বস্ত্র উৎপাদন কিছু বাড়লেও ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে মিল কাপড়ের উৎপাদন কিছু কমেছে। কাঁচামালের অভাব এই অবস্থার অন্যতম কারণ। পশম বস্ত্রের উৎপাদনও এজন্য আশানুরূপ বাড়েনি। কাঁচাপাটের যোগান কম থাকায় চটকলগুলির উৎপাদন সামর্থ্য পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি। কাঁচাপাটের উৎপাদন বাড়াবার জন্য একদিকে যেমন জমিতে রাসায়নিক সারের উপযুক্ত প্রয়োগ করা দরকার, অপর দিকে তেমনি কাঁচা পাটের দাম কিছু বাড়িয়ে পাট চাষীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা দরকার। ভারত সরকার গম ও তুলার ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিচ্ছেন; পাটের ক্ষেত্রেও তা দেওয়া দরকার। পাটের তৈরী জিনিষপত্রকে সিনথেটিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উৎপাদনী ক্ষমতা এবং বর্ধিত চাহিদার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকা পাট শিল্পের অন্যতম সমস্যা। সরকার অবশ্য

কয়েকটি নতুন পাটকল স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবুও একদিকে কাঁচাপাটের সরবরাহে ঘাটতি এবং অপর দিকে বর্দ্ধিত শ্রম-খরচ এই শিল্পের সম্প্রসারণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজ ও কাগজ-বোর্ড শিল্পের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। প্রকৃত উৎপাদন এবং উৎপাদনী শক্তির অনুপাত (output —capacity ratio) ১৯৬৯ সালে ছিল ৮৮ শতাংশ; ১৯৭০ সালে তা হয়েছে ৯৮ শতাংশ। ১৯৭১ সালে এই শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কাগজের উৎপাদন ৪২০০০ টন বাড়বে। কাগজের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে কাগজ উৎপাদনের ক্ষমতা যতটা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল, ততটা বাড়ানো হয়নি। নিউজ প্রিন্টের চাহিদা ও যোগানের মধ্যেও ফাঁকি রয়ে গেছে—এই ফাঁক দূর করার জন্য বিভিন্ন দেশ (বাংলাদেশ সহ) থেকে নিউজপ্রিন্ট আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার প্রথম দুই বছরে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হয়েছিল। সেজন্য ১৯৭১-৭২ সালে সরকারী ক্ষেত্রে যোজনা ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩০২৪ কোটি টাকা—১৯৭০-৭১ সালের যোজনা ব্যয়ের চেয়ে যা প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বেশী। ১৯৭১-৭২ সালের আমদানি নীতি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদার করা হয়েছিল। বন্ধ সংস্থাগুলির শিল্প ইউনিটগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য কাঁচামাল আমদানির যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকারের ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য ঘোষিত আমদানি নীতি যথেষ্ট বাস্তব ও উন্নয়নমুখী হয়েছে বলা যায়। আমদানির ব্যয় রপ্তানি থেকে অর্জিত আয়ের সাহায্যে যাতে মেটানো যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী আমাদের রপ্তানির পরিমাণ হয়েছে ১৬২০ কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ হয়েছে তার চেয়ে ২৬০ কোটি টাকা বেশী। এই ব্যবধান শূন্যে সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। ১৯৭২-৭৩ সালের আমদানী নীতি অনুযায়ী আমদানি ব্যয় কমানো এবং দেশে আমদানির বিকল্প সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার জন্য ১৬০টি জিনিষের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় আছে—কয়েক ধরনের বল বিয়ারিং, টেপার রোলার বিয়ারিং, রং সংক্রান্ত রাসায়নিক জিনিষপত্র, নানা ধরণের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি; তাছাড়া ৮৭ রকমের জিনিষপত্রের আমদানি বহুলাংশে সঙ্কুচিত করা হয়েছে,—তার মধ্যে আছে ঔষধপত্র, রাসায়নিক সামগ্রী, কয়েকটি রং এর কাঁচামাল, কয়েক রকমের বিয়ারিং প্রভৃতি। ২৯টি বিশেষ জিনিষের ক্ষেত্রে আমদানি 'কোটা' কমানো হয়েছে,—তার মধ্যে আছে কতিপয় যন্ত্রাংশ, ঔষধপত্র, মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ প্রভৃতি। সরকারী সংস্থাগুলিকে ১৬টি জিনিষ আমদানি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সালে যে শিল্প লাইসেন্স নীতি প্রবর্তিত হয়, তার ভিত্তিতেই দেশের বর্তমান শিল্পোন্নয়নের বুনিয়াদ তৈরী করা হয়েছে। অনগ্রসর এলাকায় শিল্প স্থাপন এবং নব নায়ক কারিগরদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত শিল্প ইউনিটগুলিকে সরকার বর্তমানে বিশেষ দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছেন। শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি কর্তৃক আমদানিকৃত মেশিনের উপর আমদানি

ভারতের খনি শিল্পের অগ্রগতি

শুল্ক কমানো হয়েছে। উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রেও তারতম্যমূলক আবগারী শুল্ক (differential excise duties) ধার্য করা হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণকল্পে ১৯৭২-৭৩ সালের আমদানি নীতিতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ভারতীয় কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারগণ যদি নিজেদের উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানি করতে চান, তবে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে এদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বিদেশ থেকে যে সব ভারতীয় দেশে ফিরে স্বোপার্জিত বিদেশী মুদ্রায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে চাইবেন, তাঁদের পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের যন্ত্রপাতি এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের কাঁচামাল আমদানি করতে দেওয়া হবে। অনগ্রসর এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবার জন্য সরকারের উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৭২-৭৩ সালের আমদানি নীতিতে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ভাবে চিন্তা করছেন। বন্ধ শিল্প কারখানা খোলার ও তাদের কাঁচামাল সরবরাহের কথাও বিশেষ ভাবে ভাবা হয়েছে। হিন্দুস্থান ষ্টীলের অধীনে সরকার একটি ইস্পাত ব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লাইসেন্স সাপেক্ষে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রকল্পগুলি এখান থেকে প্রয়োজনীয় ইস্পাত পাবে।

১৯৭০-৭১ সালে ভারতীয় শিল্প কাঠামোর যৌথ ক্ষেত্রে (joint sector) সম্প্রসারণের জন্য দত্ত কমিটি বা শিল্প লাইসেন্স অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই যৌথ ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ উভয়ই থাকবে, সেই সঙ্গে থাকবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির সক্রিয় ভূমিকা। এজন্য উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলির ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকার কয়েকটি নির্দেশ প্রদান করেন। লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষিত ইউনিটের সংখ্যাও ১২৮ করা হয়।

অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সরকারের নীতি শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল নয়। শিল্প লাইসেন্স নীতি অনুযায়ী বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ শুধু মূল ভার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের জন্য লাইসেন্স প্রদানে অযথা বিলম্ব হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। বড় বড় শিল্পপতিগণের যুক্তি হল, ১৯৬৩ সালে যে শিল্পোৎপাদন বেড়ে চলে এবং তারও আগেকার দশকের মাঝামাঝি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির যে অনুকূল আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার পেছনে ছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ স্পৃহা এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা। ১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতিতে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি বলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়েছে। বর্তমানে কোন বড় শিল্প ইউনিট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে প্রথমে শিল্প ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তা পরীক্ষা করে দেখেন,—এবং যদি ঐ শিল্প ইউনিটের সম্পদের পরিমাণ চার কোটি টাকার বেশী হয় তবে তা Monopolies and restrictive practices commission-কে দিয়ে অনুমোদিত করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে এটুকু বলা যায়, যদি প্রকৃতই কোন শিল্প ইউনিট একচেটিয়া কারবারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে অথবা একচেটিয়া মূলধন কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ দিয়ে থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে আইন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বিনিয়োগের স্বার্থেই এজন্য লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়।

ভারত সরকার আগামী ডিসেম্বর মাসে ইস্পাত এবং আরও কয়েকটি গুরুভার শিল্পে উন্নয়নের জন্য একটি হোল্ডিং কোম্পানি গঠনের কথা চিন্তা করেছেন। এই কোম্পানির অধীনে থাকবে সরকারী ক্ষেত্রে ইস্পাত ও সহযোগী উপাদান

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতের ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কতদূর এগিয়েছে

# গ্রাম বাংলার পঁচিশ বছর

৯ পৃষ্ঠার পর

অন্তত দু ঘন্টা পড়ার উপর তিনি জোর দিতেন। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় প্রতিবেশী নাকি অনুনয় করে পাঠান, পড়াটা যদি দু একদিন বন্ধ থাকে। আমার পিতৃদেবের কাছে শুনেছি মায়ের পিতামহী বলেছিলেন, আমার বাড়ীতে আমি সাবারাত নটী নাচাবো তোর কিরে ড্যাকরার বেটা। গ্রাম সম্বন্ধে শহরের এই ধরণের যৌবশী মনোভাব আজ সত্তর বছর পরে অন্তত অচল। কিছুদিন আগে যখন মাত্র তিন লক্ষ একর জমি বিলি হয়, তখন অনেকেই বাংলার কৃষি ধ্বংস হলো এই শোকে আকুল হন। কিন্তু বাংলার কৃষি ধ্বংস তো হয়নি বরং গত দু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে সবচেয়ে বেশী ধান (৬২ লক্ষ টনের উপর) হু হু করে বেড়েছে গমের চাষ, তার সঙ্গে বাড়ছে অন্যান্য ফসল, তুলো এবং কৃষি মজুরের দৈনিক মাহিনা গেছে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে। সামান্য তিন লক্ষ একরের ভাঙ্গা-গড়াতে এই শুধু প্রমাণ হয় যে, গ্রামবাসী এখন এক হাতে ভাঙতে নিশ্চয় প্রস্তুত যদি সে অন্য হাতে গড়ার আশা পায়। মরতে রাজী বাঁচবার জন্য। স্থানু থাকতে মোটেই রাজী নয়, কিন্তু যিনি শুধু ধ্বংসের বাণী প্রচার করবেন, বিশেষ করে তিনি যদি শহরের নেতা হন, সাধারণ গ্রামবাসীর মুহূর্তে সন্দেহ হয় তার নিশ্চয় আছে ব্যাঙ্কে অটুট রেস্ত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা। বাংলার গ্রাম আজ যুগপৎ ভাঙ্গা এবং গড়ার জন্য প্রস্তুত। তাতে আজ শহরের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে যথার্থ প্রস্তুতি কোথায় ?

*আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

# শিল্পে ব্যবস্থায় ফাঁক

২৬ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তুতকারী শিল্পগুলির (যেমন, জ্বালানি কয়লা, লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানীজ) সব শেয়ার এবং যৌথ ক্ষেত্রের সব সরকারী শেয়ার। সরকারী ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহকারী সংস্থা ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যেগুলি বেসরকারী ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাত কারখানার এবং সহযোগী উপাদান প্রস্তুতকারী শিল্পগুলির শেয়ারের মালিক, সেগুলির মনোনীত সংস্থা হিসাবেও এই কোম্পানি কাজ করবে। নিয়োক্ত সংস্থাগুলি এই হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে আসবে ; হীন্দ লিমিটেড, কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ডিজাইন ব্যুরো, নতুন প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানাগুলির জন্য যে কোম্পানিগুলি গঠিত হবে সেগুলি ভারত কোকিং কোল লিমিটেড, ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ম্যাঙ্গানীজ ওরস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড এবং বোলানি ওরস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।

আমাদের শিল্প কাঠামোর যে ফাঁক রয়ে গেছে তার দূর করার প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা খুব সাফল্যের দাবি করতে পারে না। শিল্প ক্ষেত্রে পরিকল্পনা সামগ্রিক ভাবে তৈরী হয়নি ; কেন না যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে তাতে আন্তঃক্ষেত্র ভারসাম্যহীনতা (inter sectoral imbalances) দূর করার সার্থক প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হয়নি। পারস্পরিক নির্ভরশীল শিল্পগুলিকে সর্বক্ষেত্রে এমন ভাবে উন্নত করা হয়নি যে একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে কাজ করতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ লব্ধ মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ না হলে ও প্রতি বছর অন্ততঃ ১২ শতাংশ উৎপাদন না বাড়াতে পারলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। আমাদের শিল্প ব্যবস্থা—কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ আশানুরূপ করতে পারেনি। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভোগ-সামগ্রী শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। তাছাড়া রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য বাড়াবার চেষ্টা আরও জোরদার করা দরকার যাতে, নতুন রপ্তানি বাজার গড়ে উঠতে পারে। যেসব শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের অনুপাত বেশী সেগুলির ক্ষেত্রে আমদানির বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনের উপর বেশী নজর দেওয়া উচিত।

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পথে মূলধনের অভাব এখন দুরূহ বাধা হওয়া উচিত নয়। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এবং উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির এখন শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহের অভাব নেই। গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হল ঋণের প্রয়োজন ও ঋণ প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ফাঁক দূর করা।

# সংবিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচার

২৫ পৃষ্ঠার পর

শাসনের নীতিকে স্বীকার করে নেবেন। শুধু এ সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ সমন করে আমরা কোনদিনই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না, যদি না যে সব লোকের ওপর এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করার ভার ন্যস্ত আছে তাদের মধ্যে উপযুক্ত জনগণের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা না আসে।

# ভারতীয় কৃষি যোজনার মূল্যায়ন

সান্ত্বনা কুমার দাস

দুই দশকের চেয়েও দীর্ঘকাল দুর্গম ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হতে চলেছে বলা চলে। এই বছর জুন মাসে আমেরিকা থেকে ধারে গম আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। পাবলিক ল, ৪৮০-র ফাঁস আমাদের গলা থেকে সরে গেছে। অথচ, এ সত্য অস্বীকার করা অন্যায় হবে যে আমেরিকার সাথে ১৯৫১ সালের ১৫ই জুনের জরুরী খাদ্য সাহায্য চুক্তি এবং পর পর দুই বা তিনটি গম ইত্যাদি সরবরা চুক্তির দ্বারা আমরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। এই সাহায্যের উপর ভরসা করেই কৃষি যোজনায় বিভিন্ন প্রকার উন্নতির পথে আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পেরেছি। আজকের "সবুজ বিপ্লবের" সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমেরিকা ও অন্যান্য দু' একটি বৈদেশিক শক্তির সহায়তা। আমাদের দৈন্য ও দুর্ভিক্ষের দিনগুলি অপেক্ষাকৃত সহজে পার করে দিতে এরা যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম যোজনা মন্ত্রী থাকা কালে প্রায় ঠিকই বলেছিলেন যে, প্রায় শতবর্ষকাল দুর্ভিক্ষ ও ভারতবর্ষ এই দুটি কথা অনেকের মনেই একাকার হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ( ১৯৪২-৪৩ সালে ) অবিভক্ত বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ২০ লক্ষের চেয়ে বেশী লোকের অনাহারে মৃত্যু ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

যুদ্ধাবসানের দু'বছর পরে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল; দেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘটল—অভাবনীয় রাজনৈতিক দুর্যোগে আকাশ কালো হয়ে উঠল। অভাব, অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার বোঝা কাঁধে বয়ে আরও তিনবছর কেটে গেল—এর ভেতর চলল শক্ত করে ঘর বাঁধবার প্রস্তুতি পর্ব্ব। ১৯৫০ সালে ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল—যোজনা সংস্থার প্রতিষ্ঠা হল। কৃষি উন্নয়ন, খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা লাভের উদ্যোগ লক্ষ্য স্থির করে স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন যোজনার কাজ সুরু হল। ভুল, ত্রুটি, সাবধানতার অভাব, পদস্খলন হয়ত আমাদের কৃষি যোজনার উন্নতির গতি কখনও কখনও শ্লথ করেছে কিন্তু তাই বলে উদ্যম ও উৎসাহের কখনও অভাব ঘটেনি। নতুন, নতুন অভিজ্ঞতা, কৃষি বৈজ্ঞানিকদের অতুলনীয় অবদান ক্রমে উন্নতির গতিকে দ্রুততর করে তুলেছে; আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুবার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শিল্প, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবদিক দিয়ে দেশের সামগ্রিক যোজনা উন্নত হয়েছে, পরিসর বাড়িয়ে নিয়েছে—দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়েছে—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এখন স্পষ্ট করেই আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে এসে গেছে।

যোজনার প্রথম বছরে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৮ লক্ষ টন : ঠিক দুই দশক পরে, ১৯৭০-৭১ সালে, এই উৎপাদন সীমা ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। সর্ব্বশেষ হিসাব অনুযায়ী খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের কৃষি যোজনার উন্নতির একমাত্র লক্ষ্য বা প্রামান্য দৃষ্টান্ত মনে করা ভুল হবে। আমাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পরিকল্পনায় ধাপে ধাপে নতুন ও ফলপ্রসু অভিজ্ঞতার সংমিশ্রন এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, কীটনাশক ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে কৃষক সমাজকে সজাগ করে তোলা, সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বহু উপায় ও কারণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির ফলে অধিক ফলন বীজ ব্যবহার সাফল্যের পদক্ষেপ দ্রুততর করেছে, অগ্রগতির বেগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।

এখনও অনেক কিছু করবার বাকী রয়েছে; কৃষি যোজনার আংশিক সাফল্য জাতিকে যেন বিভ্রান্ত না করে, সে বিষয়ে নেতৃবর্গ সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। প্রধান খাদ্যশস্য সমূহের বাইরে পাট, তুলা, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশ আজও বিশেষ ভাবে অনগ্রসর রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী, শ্রীযশোবন্তরাও চ্যবন স্বীকার করেছেন যে, কৃষি গবেষণার উন্নতিমূলক উপায় সমষ্টির প্রয়োগ উল্লিখিত কৃষিক্ষেত্রে এখনও প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে স্বল্প উৎপাদন বাজার দর বাড়িয়ে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। যোজনা সংস্থাও কৃষি পরিকল্পনার এই দুর্ব্বল অংশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছেন।

কৃষি যোজনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বকৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন

প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রপতি, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃষিযোগ্য আবাদী জমির সম্প্রসারণের সুযোগের অভাব, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য জলাভাব, উৎপাদনের নিম্নমান ও জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির তালিকা উল্লেখ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের দেশের সীমিত সম্ভাবনার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি আইসেন হাও-য়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশ্বকৃষি প্রদর্শনী আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের সামনে, অন্যান্য অগ্রসর দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় যে নানা প্রকার আধুনিক পন্থা অবলম্বিত হচ্ছে তার পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট উপায়গুলি দেখবার সুযোগ এনে দিয়েছে বলে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী পাতিল, একবার সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেছিলেন যে খরা, বন্যা, বারিপাতের সময় ও পরিমাণের উপর অনেকাংশে খাদ্যশস্য উৎপাদন নির্ভর করে। প্রকৃতির প্রভাব, তাঁর মতে, চক্রাকারে পরিবর্তিত হয় এবং এর ফলে আমরা প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে মাত্র এক বছর খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাফল্য লাভ আশা করতে পারি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার কৃষি পরিকল্পনার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৯ কোটি ৬০ লক্ষ একরের বেশী নয়। একই জমিতে শস্য উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেচ সম্প্রসারণ মাত্র নতুন দশ শতক জমি দখলে আনতে পেরেছে।

অন্যদিকে, গত চার দশকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩৯ ভাগ; খাদ্যশস্য উৎপাদন এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমতালে উন্নতি দেখাতে পারেনি। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ থেকে (১৯৩৬ সালে) পৃথক হয়ে যাবার ফলে খাদ্যশস্য সরবরাহে ১৩ লক্ষ টন ঘাটতি দেখা দেয়, দেশ বিভক্ত হবার ফলে আরও ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যায়। এর ফলে ১৯৪৮ সালে বাইরে থেকে ২৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়, পরের বছর আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭ লক্ষ টনে। ১৯৫০ সালে আমদানীর পরিমাণ কিছু কমে ২১ লক্ষ টনে পৌঁছয়; কিন্তু আবার ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ ৪৭ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত হিসাব সামনে রেখে আমাদের প্রথম কৃষি যোজনার গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। একদিকে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহে ঘাটতি এবং অন্যদিকে ধার করে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী এবং নতুন উৎপাদনে স্থিতাবস্থা নেতৃবর্গকে অবশ্যই বিশেষ ভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। প্রধান কয়েকটি খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালে ছিল ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টন, ১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদন পরিমাণ কমে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টনে ও প্রথম যোজনার প্রথম বছর ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টনে পৌঁছয়। এই সময়ের মধ্যে খাদ্যবস্তুর দাম ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলন (Grow more food) তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি। উৎপাদন বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ জেনে আয়োগ সংস্থা প্রাপ্তিযোগ্য খাদ্যশস্য সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কৃষি যোজনার বিনিয়োগ প্রথম বছরের ৪৫০ কোটি টাকা থেকে শেষ বছরে (১৯৫৫-৫৬ সালে) ৬৭৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে এরূপ স্থির হয়। সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে অধিক উৎপাদন অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এবং খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে স্বভাব (food habit) পরিবর্তনের অনুকূলে জনমত গঠন প্রথম কৃষি যোজনার অন্যতম ভিত্তি হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। উন্নত প্রথার চাষ, বহুমুখী উৎপাদন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ইত্যাদি অনেক উন্নয়নমূলক বিষয়, প্রথম কৃষি যোজনার পরিকল্পকগণের দৃষ্টিতে সামগ্রিক উন্নতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সমবায় আন্দোলনের প্রসার, প্রধান শস্য সমূহের প্রতিটির উৎপাদন সীমা নির্দ্ধারণ এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেচ, সার প্রয়োগ, উন্নত বীজ ব্যবহার ইত্যাদির ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার অন্তে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬০ লক্ষ টন বৃদ্ধি হবে অনুমান করেছিলেন পরিকল্পনাকার নেতৃবর্গ।

কৃষি যোজনার পট পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এই উপলব্ধি থেকে যে, ঋণের অর্থ দিয়ে কেনা খাদ্য দিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ক্ষুৎ নিবৃত্তি অনির্দ্দিষ্টকাল চলতে পারে না। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত করতে হলে, শিল্পে উন্নতি নিশ্চিত করতে হলে, কৃষির ভিত্তি দৃঢ় করা যে একান্ত আবশ্যক তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

সারা দেশে অধিক ফলনশীল কতকগুলি জেলা বেছে নিয়ে সেচ, সার ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় হাত দেয়া হল। রাসায়নিক সার আমদানী বৃদ্ধি ও দেশে অনুরূপ সার উৎপাদন প্রচেষ্টায় অর্থ বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেওয়া হল; রাষ্ট্রের অধীনে বৃহৎ পামার পত্তন করে শস্য উৎপাদনে পদক্ষেপ সুরু হল।

কৃষি গবেষণা বিশেষ ভাবে রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাবার যোগ্য বলে নির্ব্বাচিত হল; দেশের নানা অংশে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন

আরম্ভ হল। কৃষি স্নাতকেরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যায়তন ও গবেষণাগারের ফলশ্রুতিকে মাঠের মাটিতে ফুটিয়ে তুলতে। পরিকল্পনার ছক আঁকা, সে জন্য অর্থ বিনিয়োগ আর উৎপাদন ক্ষেত্রে তার ফল পাবার মাঝখানে অনেক সময় কেটে যায়; দেরিতে সুরু করার ফলে ভোগ্যপণ্য জনগণের হাতে পৌঁছুতে সাধারণ ভাবেই বিলম্ব হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-এর ব্যাপারের সাথে খাদ্যশস্য বন্টনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, আমাদের যোজনায় এদিক দিকে তেমন উচ্চস্থান পায়নি। জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়া সত্ত্বেও চাষীর হাতে জমির মালিকানা বর্তে নাই—উৎপাদন এর ফলে ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে, চালের দর বিশেষ বাড়ে নি এই যুক্তি দেখিয়ে খাদ্য স্বভাব পরিবর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের শস্য উৎপাদনকারীদের বিক্রয় দরের ব্যাপারে ভর্তুকি দেবে শুধুমাত্র গত ছ বছরে ১৩২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করা হয়েছে। গমের উৎপাদন সমগ্র দেশের চাহিদা বা প্রয়োজন থেকে অনেক বেশী—অথচ ভর্তুকির ফলে নির্দিষ্ট দর অনেক উঁচুতে বেঁধে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে খাদ্যশস্য অধিক দরে কিনতে হচ্ছে। সরকারের ভাণ্ডারে আজ ৭৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য জমা হয়ে আছে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে গম পাঠাও, গম পাঠাও বলে মুখ্য মন্ত্রীরা আজ আর তারস্বরে চীৎকার করছেন না, সরকারী নিয়ন্ত্রিত দোকান থেকে প্রায় অখাদ্য শস্য কেনার ব্যাপারে জনগণের আগ্রহ অনেক কমে গেছে: খোলা বাজারে ভাল জিনিস প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে।

চাষের জমির সীমা নির্দ্ধারণ নিয়ে তুলকালাম বাকবিতণ্ডা দেশকে তোলপাড় করে তুলেছে। অর্থবান লোকেরা শিল্পে মজুদ অর্থ বিনিয়োগের পরিবর্তে বিরাট সব খামার জমির-মালিক হয়ে বসেছে। তারা ট্রাক্টর এবং অন্যান্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে, বিদ্যুতের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করে কৃষি ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে এক শক্তিশালী নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে। অন্য একটি শক্তিশালী ও অর্থবান কৃষি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে যে সব অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন বিশেষ ভাবে সাফল্য লাভ করেছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন সীমার যাতে কোন প্রকার অবনতি না ঘটে সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন রয়েছে। আগামী ২ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে পারবে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এই বছর থেকে ৮ লক্ষ টন গম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে উদ্বৃত্ত হবে। গমের বাজার মন্দা হবার ফলে হরিয়াণা রাজ্য গম উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ হ্রাস করবার কথা বিবেচনা করছে বলে প্রকাশ। অন্যান্য দু' একটি রাজ্যেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বাইরে কৃষি পরিকল্পনার পরিসর বাড়াবার চেষ্টা চলছে।

যোজনা আয়োগের বিশেষ দৃষ্টি ইদানীং ডাল জাতীয় শস্যের ফলন বৃদ্ধির দিকে পড়েছে। ডাল ইত্যাদি শস্য দেশের অত্যন্ত গরীব জনগণের একটি প্রধান খাদ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডালের ফলন বৃদ্ধির গতি অত্যন্ত মন্থর। ১৯৫৭-৫৮ সালে ডাল জাতীয় শস্যের ফলন ছিল ৯২ লক্ষ টন, ১৯৬৯-৭০ সালে ফলন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১১৭ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে এবং ১৯৭০-৭১ সালে ১১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে তা আবার কমে গেছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ২২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ডাল জাতীয় শস্য বপন করা হয়েছিল, ১৯৬৮-৬৯ সালে এই জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ সামান্য কিছু কমেছে। এই স্থিতাবস্থা গভীর চিন্তার কারণ।

তৈলবীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে প্রাপ্তিযোগ্য পরিমাণের পার্থক্য বেড়ে চলেছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় প্রধান কয়েকটি তৈলবীজের উৎপাদন অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টন বাড়িয়ে ৫৪.৭১ লক্ষ টনে তুলে ধরবার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই লক্ষ্য ডিঙিয়ে তৈলবীজ উৎপাদনের পরিমাণ ৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৯৭০-৭১ সালে এই সংখ্যা ৯২ লক্ষ মেট্রিক টনের সীমা স্পর্শ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে শিল্পে উন্নতি ও প্রসারের ফলে ভোগ্যপণ্য হিসাবে তৈলবীজ থেকে উৎপন্ন বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে জনগণের হাতে পৌঁছয় নাই এবং তৈলবীজ সম্পর্কিত গ্রামীণ শিল্প বিশেষ দুরবস্থায় পড়ে ও দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কৃষি মন্ত্রনালয় ৬ লক্ষ টন চীনাবাদাম উৎপাদন [illegible] লক্ষ [illegible] অতিরিক্ত [illegible] রেড়ি (castor) বীজ উৎপাদন [illegible] দিয়েছে বলে প্রকাশ।

পাট, তুলা, আখ ইত্যাদির উৎপাদন চতুর্থ কৃষি যোজনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। [illegible] সালে সাড়ে সাতের লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৪১ লক্ষ গাঁট (প্রতি গাঁট ৪০০ পাউণ্ড) পাট উৎপাদন হয়েছিল। [illegible] ৭০ সালে পাটের উৎপাদন ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁট (প্রতি গাঁট ১৮০ কেজি প্রায়) পৌঁছেছিল। পরের বছর এই উৎপাদনের পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ৫ হাজার গাঁটে নেমে আসে। পাটের দর প্রতি কুইন্টাল ১৫৫ টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রীর এই প্রস্তাবে

আপত্তি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে এই নিম্নস্তরে দর বাঁধার ফলে কৃষকেরা পাট উৎপাদন কমিয়ে ধানের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে আগ্রহশীল হতে পারেন। পাটের নিম্নগামী দর, উৎপাদন এক বছরের মধ্যে সাড়ে সাত লক্ষ গাঁট কমে যাওয়ার ব্যাপারে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা অবশ্য এখনও ভাল করে খতিয়ে দেখা হয়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবাস্তর হবে না যে, পাটের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯-৭০ সালের ৩০ লক্ষ ১৮ হাজার দু'শত গাঁটে এসে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের একটি অন্যতম কৃষি সম্পদ, প্রায় বলতে গেলে, যথাযোগ্য সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এমন ধারণা কৃষকদের মনে বদ্ধমূল হলে সেটা হবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

মেস্তার (mesta) সর্ব্বভারতীয় উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁট (১৮০ কেজি প্রতি গাঁট) ছিল। পরের বছর উৎপাদন মাত্র এক লক্ষ গাঁট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হিসাব যে ১৯৫৭-৫৮ সালের ১২ লক্ষ গাঁট (প্রতি গাঁট ৪০০ পাউণ্ড) থেকে উৎপাদন উন্নতির লক্ষণ নয়, তা আর বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই।

তুলার উৎপাদন ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল মাত্র ৪৭ লক্ষ গাঁট (প্রতি গাঁট ৩৯২ পাউণ্ডের); ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার গাঁটে (প্রতি গাঁটে ১৮০ কেজি) দাঁড়ায়, পরের বছর উৎপাদন কমে যায় ৪৫ লক্ষ ৫৬ হাজার গাঁটে। এর ফলে বিদেশ থেকে তুলা আমদানীর প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে—এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় নিবারনের প্রচেষ্টায় যে বিশেষ মন দেয়া হয়নি, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই; আখের উৎপাদন ১৩৭ লক্ষ ৮৩ হাজার মেট্রিক টন (১৯৬৯-৭০ সালে) থেকে কমে পরের বছর ১৩১ লক্ষ ৯৪ হাজার টনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিবর্তনের ফলে বাজারে চিনির দর দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তামাকের উৎপাদন প্রথম যোজনার অন্তে ২০ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল: ১৯৫৭-৫৮ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ১০ কোটি পাউণ্ড কমে যায়। মশলা উৎপাদনে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে; কিন্তু লবঙ্গ, দারচিনির জন্য আজও আমরা পরমুখাপেক্ষী—বছরে গড়পরতা আমদানীর ব্যয় প্রায় দু'কোটি টাকা।

চাষবাসের প্রয়োজনে পশুপালন এবং দুগ্ধবতী গো-মহিষ প্রজনন বৃদ্ধি ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট উচ্চমানে তুলে নেয়ার প্রকল্প সার্বিক কৃষি যোজনার অন্যতম অংশ। চতুর্থ যোজনার পশুখাদ্য উৎপাদন বাড়াবার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। মুরা (murrah) মহিষ প্রজনন বৃদ্ধি ও বৎস মহিষ সারা দেশে বিতরণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প চতুর্থ যোজনার অন্তর্গত করা হয়েছে। চতুর্থ যোজনার প্রারম্ভে সারা দেশে ৯১টি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র কার্য্যকরী ছিল; এর ভেতর ৫৩টি সরাসরি সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। বেশীর ভাগ কেন্দ্রই যে নানা কারণে লোকসানে চলছিল, চতুর্থ যোজনার পরিকল্পনাকারীদের মন্তব্যে স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে। ঘাটতি নিরসনের প্রতিশ্রুতিও এই মন্তব্যে সংযোজিত হয়েছে। এই খাতে প্রায় ১৩৯ কোটি টাকা নতুন বরাদ্দ করার পেছনে যুক্তি এই যে, পূর্ব্বের লোকসানের কারণগুলি সংশোধিত হলে বরাদ্দ অর্থের ৯৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পুরাতন প্রকল্প থেকেই উদ্বৃত্ত হিসাবে পাওয়া যাবে।

মৎস্য চাষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন চতুর্থ যোজনায় উল্লিখিত হয় নি, এ কথা বলা চলে না। কিন্তু পূর্ব্বের ৪ কোটি টাকা থেকে মৎস্য ইত্যাদি রপ্তানীর অর্থ ১৯৬৭-৬৮ সালে যে ১৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে সে কথা উল্লেখ করে এই প্রকল্পের সম্প্রসারণের প্রয়োজনকে অবশ্যই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৮৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও বিহারে অতিরিক্ত ৫০ কোটি পোনা (মৎস্য ছানা) বিতরণ প্রকল্প এই যোজনার অন্তর্গত। এর ফলে চতুর্থ যোজনা অন্তে মাছের সরবরাহের পরিমাণ ৩৩,০০০ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৫৭৪,০০০ টনে দাঁড়াবে।

কৃষি পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতি মোটেই দ্রুত নয়। মাত্র অল্পদিন হল আমরা মেট্রিক পদ্ধতির দিকে ঝুঁকেছি। মন ও পাউণ্ডের ওজন ছেড়ে কেজি ও কুইন্টালের রাজ্যে প্রবেশ যতটা না কষ্টকর মনে হচ্ছে তার চেয়ে বেশী দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে জমির পরিমাপ উল্লেখের ব্যাপারে বিঘা ও একর থেকে হেক্টরের দরজায় প্রবেশ করা।

চাষের জমির সীমা নির্দ্ধারণের বিতর্কে ১০ একর, ১৮ একরের টানাটানি আমাদের আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি গ্রহণে বিলম্বের সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত। কৃষি যোজনার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের নির্ভরতা ও নিশ্চয়তা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চম যোজনার প্রাথমিক আলোচনায় কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য, জমিহীন কৃষকদের মধ্যে শীঘ্র জমি বন্টন ও দ্রুত বে-রোজগারী নিরসন ইত্যাদি লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

# মধ্যবিত্ত পরিবার এবং স্বাধীনতার পঁচিশ বছর

ডঃ অমৃত দত্ত

মধ্যবিত্ত পরিবার বলতে কি বোঝায়, তার সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ব্রিটেন এবং আমেরিকায় এই নিয়ে জোর আলোচনা হয়েছে দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে এবং পরে। সমাজ বিজ্ঞানীরা নানা রকমের অর্থ দিয়ে এবং নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন এবং জীবিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জি ডি এইচ কোল—এর অনুসন্ধান অতি মূল্যবান এবং প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক কোল—এর মতে পেশা বা কাজ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের নির্দ্ধারক বলে ধরা যেতে পারে। এই পর্য্যায়ে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় বেতনভুক সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী থেকে ছোটখাটো ব্যবসায়ের কর্ত্তা, স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ এবং গ্রামের মোড়ল পর্য্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। কেরানী, টাইপিস্ট ও নার্স, পোষ্ট অফিসের পিওন, দোকানের কর্মচারী, মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কিনা এই নিয়ে বহু বাদ বিসম্বাদ হয়ে গেছে। নিম্নস্তরে এঁদের উপার্জ্জন সাধারণ শ্রমিকের মজুরী থেকে কতটুকু ভিন্ন, তা নিয়ে আলোচনা এবং তর্ক হয়েছে অনেক। বেশীর ভাগে দেখা গেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অংশ শ্রমিক সমিতি গঠন করে অথবা তার সাহায্য নিয়ে নিজেদের বেতনের এবং দাম বৃদ্ধির পরিমাণ মালিকের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁদের ঠিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ধরা যায় কিনা সন্দেহজনক।

ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবার ইউরোপ বা আমেরিকার অনুরূপ পরিবার থেকে একটু অন্য ধরণের। পাশ্চাত্য দেশে আর্থিক অগ্রগতির যে কোন পর্যায়ে উচ্চ এবং নিম্ন আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণী চিরদিনই নিজেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে

সেচ ও জলবিদ্যুতের জন্য নির্মিয়মান কুমারী বাঁধ

রিচয় দিয়ে এসেছে। এই সব দেশে আর্থিক উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ভাল বা খারাপ হয়েছে। স্বভাবতই সমাজে শ্রেণীর স্থান নির্দিষ্ট হত সেই শ্রেণীর হাতে অর্থ এবং সুযোগ প্রাপ্তির উপর। একটা ছোট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রিটেন যখন পুঁজিবাদী উন্নয়নের শীর্ষদেশে তখনও ব্রিটেনের সমাজ উচ্চ নীচ এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিভক্ত ছিল।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার এবং ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরবাসী মধ্যবিত্ত পরিবারের উৎপত্তি হয়। সাধারণ ভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, মর্য্যাদাবোধ দক্ষতা, স্বভাব এবং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরা না ছিলেন "অন্ন চাই, বস্ত্র চাই"—এর দলে, না ছিলেন বিত্তবান, না ছিলেন বিত্তহীন, এঁদের হয়তো নিজস্ব ঘরবাড়ী ছিল শহরে—তাতে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য সাধ্যমত পাওয়া যেত। কাজেই মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল মোটামুটি ভাবে সংযুক্ত এবং মিলিত। বিন্দুর ভাসুর যাদব মুখুয্যে তাঁর পিসতুতো বোন এবং বোনপোকে নিজের সংসারের ভাইয়ের নতুন বাড়ীতে আনতে দ্বিধাবোধ করেন নি। একান্ন পরিবারের শ্রেষ্ঠনীর বাইরের লোকেরা যে সময় বোধে এবং প্রয়োজন বোধে স্থান পেতনা, এমন নয়। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের নীতি, ন্যায় পরায়ণতা, সততা অথবা সাধুতা সেকালের ভারতবর্ষের সামাজিক মানদণ্ডের নিম্নস্তরের ছিল বলে মনে হয় না।

ভারতের নব জাগরণে মধ্যবিত্ত পরিবারের অবদান সামান্য নয়। রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি প্রতিক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ভারতীয় একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ স্থান গ্রহণ করে নিজেকে এবং দেশকে ধন্য করেছে। সাহিত্য এবং সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও দর্শণ এই শ্রেণীর পৃষ্ঠ পোষকতা পেয়েই আজ যে উচ্চস্তরে দাঁড়িয়েছে, তা অনস্বীকার্য। আজ উনিশ'শ সত্তর দশকের ভারতবর্ষ পৃথিবীর নানান দেশ থেকে এবং নানান সম্প্রদায় থেকে সাহায্য নিয়ে আধুনিক ভারত হিসাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই কৃষি প্রধান ভারতবর্ষ, শিল্প বর্দ্ধিত ভারতবর্ষ, সাহিত্য বিশারদ ভারতবর্ষ, সঙ্গীত

চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈরীর কারখানায় প্রস্তুত রেল ইঞ্জিন
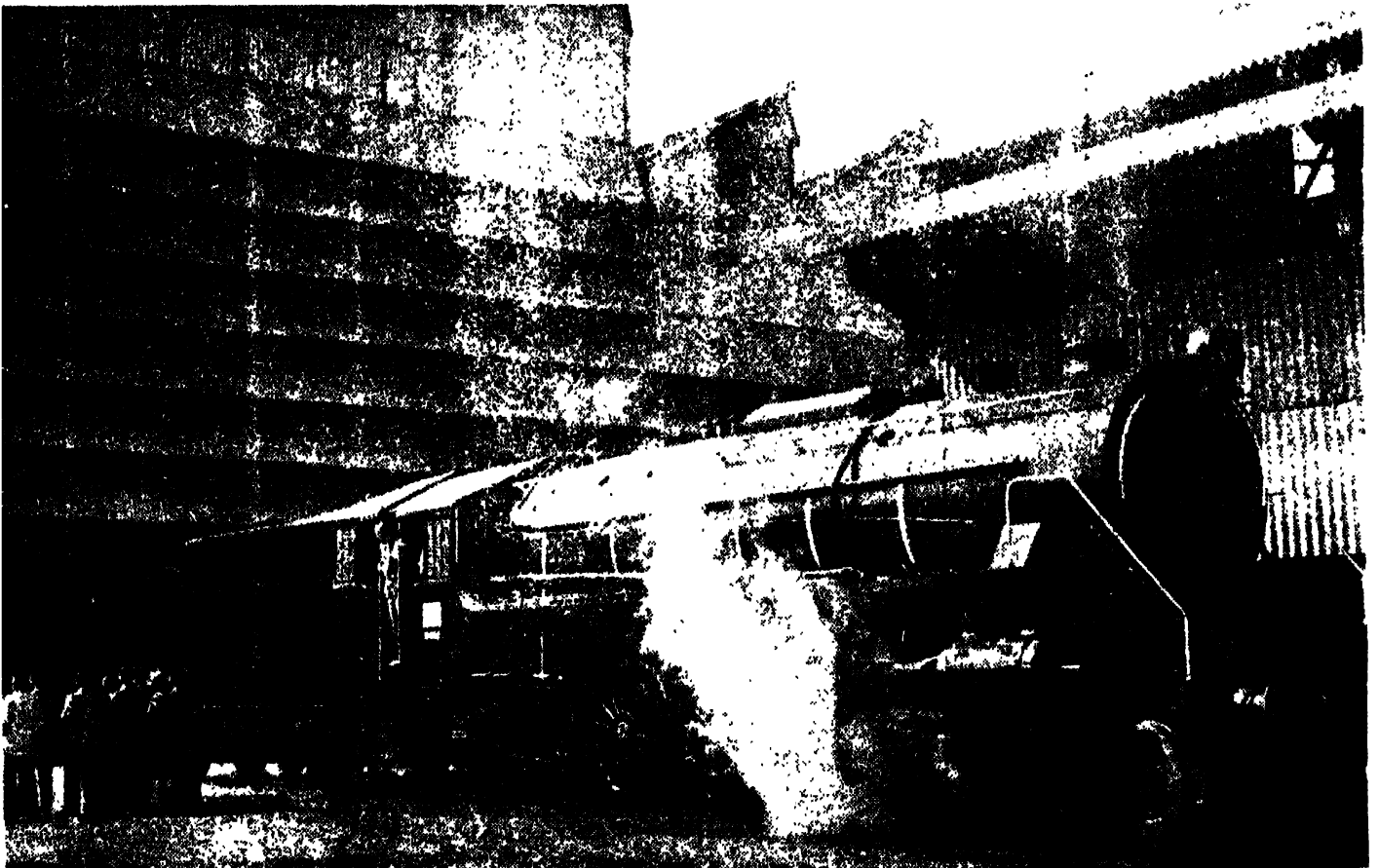
অনুশীলনরত ভারতবর্ষ, ধর্ম অনুসন্ধিৎসু ভারতবর্ষ, দার্শনিক ভারতবর্ষ দেশ মাতৃকার এক চতুর্থাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে অনুগৃহীত, একথা এখন অস্বীকার করার উপায় নেই।

২

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠির ব্যাপকভাবে বিকাশ সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় "ভদ্রলোক" সংখ্যায় ক্রমশ: বাড়তে থাকে। ভূসম্পত্তির গণ্ডী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন সরকারী বা বেসরকারী চাকরীর বাজারে হানা দিয়েছে। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে এই শ্রেণী সমাজের এবং সংসারের ভিতর তখন নিজের স্থানটুকু করে নিতে পেরেছে।

আর্থিক স্বচ্ছলতা মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন কালেরই বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে হয় না। যতদূর জানা যায় এঁদের আয় ছিল পরিমিত, আয়ের সঙ্গে ব্যয় কোন দিনই সঙ্গতি রেখে চলত না। যে সব পরিবার গ্রামে বাস করতেন, তাঁরা নিজস্ব জমিজমা থেকে অর্জিত উপার্জনের উপর একান্ত নির্ভর না করে অতিরিক্ত আয়ের সন্ধান করতেন। শহরে উপার্জনের সুযোগ অনেক, শহরবাসীরা তাঁদের রুচি এবং রীতি অনুসারে নিজেদের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করে নিয়েছিলেন।

বিশ্ব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইনস—এর কথায়, সেই সোনার উনবিংশ শতাব্দীর ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সুরুতেই অবসান ঘটলো। প্রতি মহাসমর পৃথিবীতে এনেছে পরিবর্তন। প্রাক যুদ্ধের মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবর্তন ঘটলো দেশের বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের কয়েক বছরের পর পৃথিবীতে নেমে এল বিশ্বব্যাপী মন্দা। বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের অবনতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের দেশে কৃষিজ পণ্যের মূল্য এত কমে গেল যে শুধু কৃষক নয়, অন্যান্য উৎপাদকেরা ব্যবসায়ে অত্যন্ত ঘাটতি দিতে লাগলেন। মন্দা বাজারে চাকরী খুঁজে পাওয়া অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হয়ে উঠল। যে মধ্যবিত্ত পরিবার প্রথম মহাযুদ্ধের আগে, নিজের রীতি এবং আদর্শ বোধ নিয়ে সমাজের মেরু দণ্ড হয়ে ছিলেন, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে তাঁদের আর্থিক অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর পর্য্যায় নেমে এল। দেশের এই প্রগতিশীল অংশ এখন দেখতে লাগলেন তাঁরা একূল ওকূল দুকূল হারিয়ে বসেছেন।

কিন্তু, এই সব নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই অতি শোচণীয় হয়ে উঠলো। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যুদ্ধের প্রথম এবং প্রধান দুর্ঘটনা ঘটলো মধ্যবিত্ত চরিত্রে এবং নীতি পরায়ণতায়। যুদ্ধের বাজারে নিত্য প্রযোজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদাদির অভাব এবং প্রতি জিনিষের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সংসারে নেমে এল দৈন্য এবং ভবিষ্যতের উপর অশ্রদ্ধা ও অনিশ্চিতভাব। আগুনে ঘৃতাহুতির মত সমস্যা জটিল হয়ে উঠল স্বাধীনতা লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। দেশ বিভাগের ফলে যে পঁচাত্তর লক্ষ মানুষ এদেশে গৃহহীন ও নিজের ওপর আস্থাহীন হয়ে এলেন, তাঁদের বাসস্থানের এবং পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করতে দেশ নাজেহাল হয়ে উঠলো। যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ব্যবহার কারী, উৎপাদনকারী নয়। স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর দেশের আয়ের বহুলাংশ ব্যয় হোলো আশ্রয়প্রার্থীদের উপর। এই বন্যা উদাহে দেশের পূর্বকালীন মধ্যবিত্তদের পুন: প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে সবাই ভুলে গেল।

আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে চারিদিকে অভাব, সেখানে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা করা বা সে বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করার প্রশ্ন ওঠে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরি ভাগে যে সব বুদ্ধিজীবি ছিলেন তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে স্বাধীন ভারতে মাথা তুলে দাঁড়াতে মোটামুটি সক্ষম হলেন। যাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত তৎপর এবং চতুর, তাঁরা বুদ্ধির সাহায্যে কুবুদ্ধির আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করলেন না। আদর্শবাদের অবনতির সঙ্গে এল নৈতিক সাহস এবং চরিত্র, মর্য্যাদা ও আত্মসম্মানের অপমৃত্যু।

স্বাধীনতার পর দেশ খানিকটা স্বনির্ভর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনের আভাষ এবং পরিকল্পনা রচনার সম্ভাবনা দেখা দিল। কোন জাতীয় পরিকল্পনা দেশের নিপীড়িত শ্রেণীদের অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রতি সমাজে এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তি উচ্চতর স্থান অবস্থান করেন, যাঁদের পরিকল্পনার মুখ্য এলাকা থেকে বাদ দিতে পারা যায়। স্বভাবতই পরিকল্পনাগুলি নিম্ন আয় বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেদের খাদ্য পোষাক এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং উপার্জনের প্রসারণ করছে বাধা। এই উদাহে আগেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে, আলোচনা করা যাক।

(৩)

কালের গতির সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যখন বাহ্যিক উপাদানের উপর নির্ভর করে, তখন সেই পরিবর্তনের রূপ যায় বদলে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের রূপ যাই হোকনা কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শ্রমিক শ্রেণী নিজের সংগঠনের জোরে এবং

যুদ্ধের প্রয়োজন বোধে সরকারী সাহায্য নিয়ে ক্রমশ: বলবান হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে স্থায়ী আয় বিশিষ্ট মধ্যবিত্তের দল যেমন দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্নস্তরে নেমে গেছেন, শ্রমিক শ্রেণী তেমন আস্তে আস্তে উপরে উঠে সেই শূণ্যস্থান অধিকার করবেন বলে আশা ছিল। পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তা এখনো হয়েছে বলে মনে হয় না।

সমাজের কোন একটি অংশ কখনও ওপরে থাকে কখনও নীচে নেমে আসে। সেই ভাবে যে অংশ নীচে থাকে, তারা সুযোগ এবং সুবিধার সাহায্য নিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। সমাজে এই প্রতিস্থাপন চলে আসছে বহুকাল ধরে। প্রাচীনকালে নিশ্চল এবং নিরুদ্যম সমাজের অবস্থিতির জন্য এই পরিবর্তনের গতি বিশেষ দৃষ্টি-গোচর হয়নি। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার আর এক উদ্দেশ্য হোলো সমাজ গঠন এবং সমাজ সংস্কার। ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন দ্রুতগতিতে পুরোনো কাঠামোকে নতুন রূপ দিতে পারে। আগেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিক শ্রেণী উপরে উঠেছেন, তাঁরা কিন্তু না পেয়েছেন মধ্যবিত্তের মন না তাঁদের রুচি রীতি বা নীতি। ফলে মধ্যবিত্তের নিম্নগমণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর তদনুপাতে উত্থান ঘটে নি। ভারতীয় সমাজের এক অংশ অন্য অংশের ছেড়ে যাওয়া স্থানটিকে প্রতিস্থাপন করতে পারেনি। তাঁর লক্ষণ এবং কারণ সুস্পষ্ট। পূর্বকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু উপার্জ্জনের দিক থেকে উচ্চতর এবং নিম্নস্তর শ্রেণীর মধ্যভাগে ছিল এমন নয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই নিম্নগতিতে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বাড়লো বই কমলো না, লর্ড কৃইন্স এর কথায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী আগে ছিল বুদ্ধিজীবি বুর্জ্জোয়া। এখন সে পরিণত হোলো না বুর্জ্জোয়াতে, না পাক্কা প্রোলেটারিয়েটে। শ্রমিকের রুচি আলাদা, সরকারের সমর্থন নিয়ে এবং যুগের আবেদন মেনে নিয়ে প্রতি দেশ শ্রমিককে উচ্চস্থানে বসিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে এসেছে শ্রমিকের বহুকালের অতৃপ্ত বাসনার এবং চাহিদার পরিতৃপ্তি। তারফলে আধুনিক সভ্যতার অবদান স্বরূপ সব রকমের ছোটো-খাটো বিলাস বস্তুর উপরে শ্রমিকের চাহিদা বেশী। এখনও শ্রমিক শ্রেণী আগেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ধারণের প্রণালী গ্রহণ করতে চেষ্টা করেনি এবং সক্ষমও হয়নি।

কিন্তু এই শ্রমিক শ্রেণীর অনেকে হয়তো মধ্যবিত্ত আদর্শে বিশ্বাস করেন। বেশীর ভাগ দেখা যায়, শ্রমিকের পারিবারিক জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শৃঙ্খলা ধর্মবোধ এবং আত্মসম্মানবোধ উচ্চস্থান অধিকার করেছে। ব্রিটেনের মত আমাদের দেশেও বহু শ্রমিক পরিবার নিজেকে মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচয় দেবেন, যদিও পদমর্য্যাদার দিক থেকে এঁরা নতুন উঠতির দলে। এঁরা নতুনের উপাসক, পুরানের ঐতিহ্য নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামান না। এঁরাও দেশকে ভালবাসেন

৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীন ভারতের অন্যতম তৈল শোধনাগার—নুনমাটি

আমাদের সংবাদদাতাগণের সঙ্গে
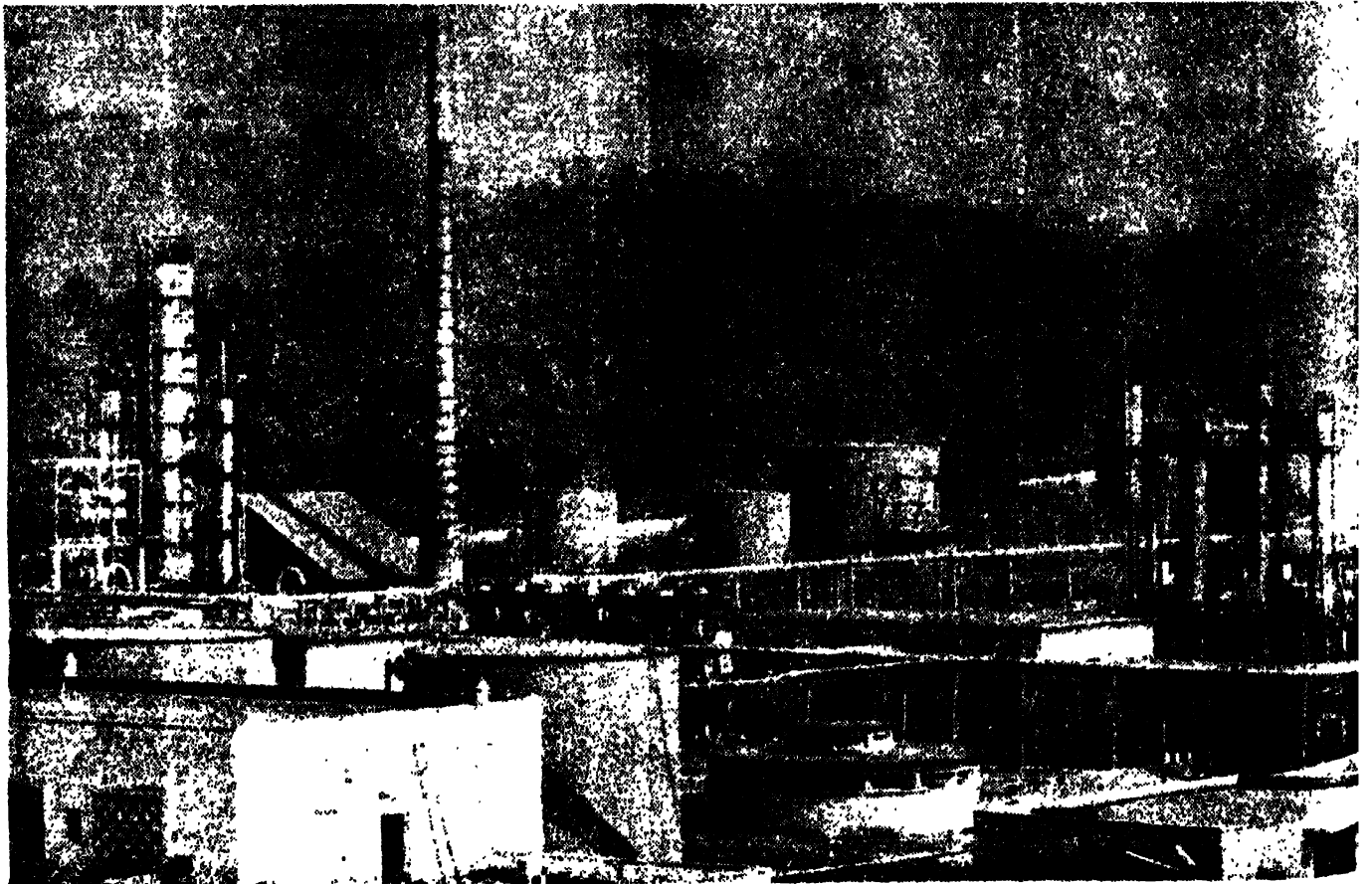
# সাক্ষাৎকারে

## প্রশাসক— শিল্পপতি—শিক্ষাবিদ— ছাত্রনেতা ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি বলেন ঃ

### শ্রী ভি শংকর

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব সচিব

পুরোনো দিনের দিকে তাকালে আমার মনে হয়, আমরা যা করছি সম্ভবত তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমরা করতে পারতাম। প্রচুর পরিমাণ সম্পদ আমরা নষ্ট করেছি। ভেবে দেখুন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশ বিভক্ত হয়ে গেল—সেই চরম অবস্থা আমরা মাত্র চার বছরেই কাটিয়ে উঠেছি। তারপর দেশে এক ঐক্যও আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এই আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা, এই শক্তি—এর সঙ্গে আমাদের পার্থিব সম্পদ এমন কিছু কম ছিল না। স্বাধীনতার পর পাঁচটা বছর আমরা বেশ ভাল ভাবেই এগিয়েছি। তারপর এ'ল দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা, 'আবাদী প্রস্তাব' আর কাগজে কলমে সমাজতন্ত্র ; সমাজতন্ত্রের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। আজকের দিনে সব দেশই সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু এই সমাজতন্ত্র সেই দেশের সব কিছুর সঙ্গে তার নিজস্বতাকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমরা! আমরা কি আমাদের দেশের পক্ষে খাপ খায় এমন কোন ধ্যানধারনার সৃষ্টি করতে পেরেছি? এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়ে গেছে।

সমাজতন্ত্র কোন বাঁধাধরা মতবাদ নয়-' দেশের আবহাওয়া, তার পরিস্থিতি অনুযায়ীই এ জিনিষটি গড়ে ওঠে। আমাদের যা করা উচিত ছিল তা হ'ল, আরও ভাল সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে, কৃষি ও শিল্পে আরও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করার ওপর-উৎপাদন বাড়ানোর ওপর বেশী করে মনোনিবেশ করার—যথাসম্ভব একটা বাস্তবধর্মী এবং সর্বজনের কাছে ন্যায় সঙ্গত একটা কর ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়ার। সত্যি সত্যিই আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের অনেক বাস্তব ঘটনার দিকেই আমরা নজর দিইনি ; তার বদলে তত্ত্ব আর ধ্যানধারনা নিয়েই আমরা ব্যস্ত ছিলাম।

আমি আপনার কাছে পল ষ্ট্রিটেন এবং মাইকেল লিপটনের লেখা 'দি ক্রাইসিস অফ ইণ্ডিয়ান প্ল্যানিং' বইটার এই অংশটুকু পড়ে শোনাতে চাই। এতে বলেছে, "একটার পর একটা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার বিবরণী পড়লে আপনার মনে হবে পরিকল্পনা কমিশন যেন ক্রমশই একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে, সেই মাটির প্রতিমার পায়ে নিয়মমাফিক প্রণাম জানাতেই বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত। এই মাটির প্রতিমাগুলো অবিশ্যি পরিকল্পনা কমিশনের নিজের সৃষ্টি নয়, এগুলো রাজনৈতিক নেতাদের কীর্তি।'

ফল যা দাঁড়িয়েছে, তা হ'ল, আমরা শুধু অতীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতেই ব্যর্থ হয়নি, বর্তমানও আমাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আজ, আমরা আরও দারিদ্র্য, আরও বেকারত্ব আর ক্রমবর্দ্ধমান জীবনযাত্রা মানের সম্মুখীন।

রাজনৈতিক নেতাদের প্রধানত: ধ্যানধারনা নিয়েই কাজ কারবার। কঠিন বাস্তবের মধ্যে তারা কদাচিৎ নাক গলান। একটা মতবাদ একটা মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু কি লাভ তাতে ; যদি অভীষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য সামর্থ্য এবং পন্থা তার না জানা থাকে। আমি একজন পেশাদার প্রশাসকের হয়ে এখানে ওকালতিও করতে চাই না, আবার অন্যের দোষ তার ঘাড়ে এসে পড়ুক তাও চাই না। আমাদের দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক নিরক্ষর, লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগই যেখানে নেই, সেখানে রাজনৈতিক নেতারা যদি অসম্ভব লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেন, তা হ'লে প্রশাসকের কাছ থেকে সেই সব শুভ ফল আশা করা নেহাৎই অসঙ্গত। 'পঞ্চায়েতি রাজ' আর "সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর" কি হাল হয়েছে, তা আমাদের আর জানতে বাকি নেই। আমরা সামান্য সম্বল নিয়ে বিরাট বিরাট লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা করছি। এর ফলে আমাদের জাতীয় স্বত্বা ক্রমশই ক্ষয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই আমরা এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছেছি, যখন আত্মোৎসর্গ, নিয়মনিষ্ঠা ইত্যাদি জিনিষের সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। অতীতে যদি আমরা

কোন ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে থাকি, তা হ'ল আমাদের বাস্তব বুদ্ধিহীনতার জন্যে ; আর যদি আমরা কোন ব্যাপারে সফল হয়ে থাকি, তা হল আমাদের বাস্তব বুদ্ধির জন্যে। কিন্তু আমি একেবারে নিরাশ হই নি, এখনও আমাদের বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ওঠার সময় শেষ হয়ে যায় নি।

## জে. আর. ডি. টাটা
### প্রখ্যাত শিল্পপতি বলেন

গত ২৫ বছরে আমরা প্রতিরক্ষা বিষয়ে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বেশ কিছু সাফল্য লাভ করেছি। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে আমরা পৃথিবীর স্থায়ী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে একটি অন্যতম দেশ হয়ে উঠেছি। প্রতিরক্ষা বিষয়ে—সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা যতটুকু উন্নতি করেছি তার দ্বারা বৃহৎ শক্তিগুলি ছাড়া যে কোন শক্তির মোকাবিলা করতেই আমরা সমর্থ। অর্থনৈতিক দিকে—আমাদের খাদ্য শস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে, শিল্পের উৎপাদন তিনগুণ হয়েছে, আমাদের প্রকৃত মাথাপিছু আয় বেড়েছে শতকরা ২৫ ভাগ, লোকের গড় আয়ু ৩১ বছর থেকে বেড়ে ৫২ বছরে দাঁড়িয়েছে. এবং দেশে সাক্ষরতা বেড়েছে শতকরা ১৬.৬ ভাগ থেকে শতকরা ২৫ ভাগ।

এইসব সাফল্য থেকে আত্মতুষ্টির কিছুটা অবকাশ থাকলেও আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, সারা পৃথিবীর মোট ইস্পাত উৎপাদনের মাত্র শতকরা একভাগ আমাদের দেশে তৈরী হয়ে থাকে। পৃথিবীর মোট রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের অংশ হ'ল শতকরা আধভাগ। সারা বছরে আমাদের দেশে যা উৎপাদন হয়, জাপান তা একমাসেই উৎপাদন করে। আমাদের মাথাপিছু আয়ে শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৫১ সালে পরিকল্পনা সুরু হওয়ার আগে আমরা যে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করেছিলাম ; এ হ'ল তার চারভাগের একভাগ মাত্র। বিরাট সংখ্যক জনসমষ্টি এখনও দারিদ্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। ২৫ বছর ধরে উন্নয়ন খাতে প্রায় ৩৫,০০০ কোটি টাকা খরচ করবার পরও দেখা যাচ্ছে, বেকারদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আমাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীতে এ বিষয়ে সর্বনিম্ন দেশগুলির মধ্যে এখনও একটি।

কিন্তু তাই বলে আগামী ২৫ বছরের জন্য আমাদের নিরাশ হবার কিছু নেই। এ পর্যন্ত আমরা যে মিশ্র অর্থনীতির নীতি অবলম্বন করে এসেছি, তা পুরোপুরিভাবেই ঠিক। সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন এ থেকেই পাওয়া সম্ভব এবং এই নীতিটিকে আমরা যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারি এবং সর্বক্ষেত্রের শিল্পকে অর্থাৎ বেসরকারী, সরকারী সহযোগিতামূলক এবং যৌথ ক্ষেত্রকে যদি বেড়ে ওঠার সুযোগ দিই ; তা হ'লে যথেষ্ট উন্নতি আমরা অবশ্যই করতে পারব।

দুর্ভাগ্য বশতঃ, সাম্প্রতিককালে সরকার এবং কংগ্রেস পার্টি বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার, যাকে আমি বলব এক অবাস্তব ও অহেতুক ভীতির ফলে সম্ভবত তার মিশ্র অর্থনীতির নীতিকে পরিত্যাগ করেছে। তারা যেন বেসরকারী বৃহৎ শিল্প সংস্থা পরিচালিত সব বৃহৎ শিল্পোদ্যোগগুলিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। যেহেতু বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে থাকে এই বৃহৎ শিল্পোদ্যোগগুলিতে ; তাই সরকারের এই মনোভাবের ফলে দেশের মোট শিল্পোন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত দু' বছর ধরে এবং এখনও শিল্পোৎপাদনে যে বৃদ্ধির হার কমে আসা চলেছে তার একটি অন্যতম প্রধান কারণই হ'ল সরকারের ও কংগ্রেস পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গী।

আমার মতে, ছোট বড় সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকেই—যাদের দেশের শিল্পোন্নয়নে সম্পদ বিনিয়োগের, শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতা দেখাবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে এবং যারা তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন ও বিশ্বাসভাজন এমন সব প্রতিষ্ঠানকেই যথাসম্ভব বেড়ে ওঠবার সুযোগ দেওয়া সরকারের উচিত।

সাম্প্রতিক কালে শিল্পোন্নয়নের শ্লথগতির কারণ যেমন বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পদ বিনিয়োগে অনিচ্ছা তা নয় ; এর কারণ হ'ল সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক এবং সংযতকারী নীতি। এ ছাড়া বিদ্যুৎ শক্তি ও রেল যোগাযোগের অভাব এবং কাজের দিনের অত্যধিক অপচয় তো আছেই।

উন্নয়নের সুফলের ভাগীদার সমাজের দুর্বলতম অংশই মূলতঃ হোক—সরকারের এই ইচ্ছাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। কিন্তু এজন্য যেন দুটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অর্থাৎ (১) কর্মসংস্থানের প্রচুর ও বিপুল সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং (২) ভোগ্যপণ্য এবং প্রয়োজনীয় জন সেবামূলক কাজকর্মের সুবিধা যেন জনসাধারণের কাছে সুলভ হয়—যা তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরী। এটি না হ'লে জনগণের আয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হেতু মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাবে না।

কৃষিক্ষেত্রে সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেগুলি সঠিক এবং তা অনেকদিন আগেই করা উচিত ছিল।

কিন্তু বেসরকারী বৃহৎ শিল্পোদ্যোগগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হবে না ; কেন না, জনগণের কাছে যে জিনিষগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে জিনিষগুলি তারা উৎপাদন করে থাকে বলেই শুধু নয়, পরন্তু তারা সরকারী রাজকোষে প্রচুর পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসাবে দিয়ে থাকে—যা গ্রামীন কর্মসংস্থান ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সরকার ব্যয় করে থাকেন। সুতরাং আগামী ২৫ বছরে সরকার যদি কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা এবং রাজনীতিমূলক বিবেচনার বশবর্ত্তী না হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনার ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেন, তা হলে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের মত আমাদের দেশও এগিয়ে যেতে পারবে—এতে কোন সন্দেহই নেই। সেই সঙ্গে অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে, যেন এই উন্নয়ন থেকে প্রাপ্ত সুফলগুলির ভাগীদার প্রধানত ব্যাপক জনসাধারণই হতে পারেন।

## রবীন্দ্র ভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন—

স্বাধীনতার ২৫ বছরে বহু ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জ্জণ করেছি ; আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হোল সামাজিক ক্ষেত্রে—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে গণ চেতনা। সংক্ষেপে বলা যায় সুমহান সাম্যভাব—সংবিধানে সকলের সমান সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি। এই সাম্যভাব কিছুটা অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার স্বরূপে। এর মূলে রয়েছে ভারতবাসীর চিরাচরিত বিশ্বাস যে মানুষ স্বভাবত: নীচ বা পাপী নয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বর্তমান। মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক ভাবের ধারণা অতীতে সমস্ত সমাজ সংস্কারক ও সমাজ কর্মীদের প্রভাবিত করে।

সাম্যের এই নীতি আরও সুদৃঢ় হয়েছে অধিকাংশ অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যকলাপ জাতীয় করণের দ্বারা এবং অন্যান্য জাতিকে সমান মনে করার দ্বারা। কাজে ও কর্মে ভারত "এক বিশ্বের" সুমহান নীতি গ্রহণ করেছে। সেই কারণে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও ভারত আজ কেবল এশিয়া নয় সারা বিশ্বের নেতৃ স্থানীয়।

এর জন্যে শিক্ষা ও শিক্ষাবিদগণকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কোরতে হয়েছে। কারণ শিক্ষা বিনা কিছুই করা করা যায় না।

বর্তমানে শিক্ষা নীতি আধুনিক জীবন ধারার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। বরং বলা যায় যে জীবনে যে-সব দুঃখ কষ্ট এবং সমস্যাদি রয়েছে তার সঙ্গে এই শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সম্পর্কই নেই। বস্তুত: আজকের শিক্ষা ক্লাশ ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুকুমার মতি শিশুমন অনুপ্রাণিত কোরতে সে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের চিন্তাধারা ঠিক পথে চালিত কোরতে এ ব্যবস্থা অক্ষম।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। যেমন (১) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা—গুরুকুল পদ্ধতিতে যা দেখতে পাওয়া যায়-এক উপযুক্ত, স্নেহবৎসল, সহানুভূতিশীল গুরুর অধীনে শিক্ষার ব্যবস্থা; (২) আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ব্যবস্থা, যাতে সেখানকার শিক্ষকগণই দেখা শুনা কোরবেন; (৩) আলোচনা চক্র; (৪) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সংস্কার; (৫) কেবল চাকরী পাওয়ার জন্যেই যে শিক্ষা এই মনোভাবের পরিবর্তন (৬) শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই সুসংহত হবে যাতে দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি ঘটে।

## ছাত্রনেতা ও নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী বলে

আমার মনে হয় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার কোন সুযোগ ভারতীয় যুব সম্প্রদায় পাননি। তাছাড়া তাঁদের স্বভাব চরিত্র ও চিন্তাধারা অনুযায়ী এক সামাজিক গোষ্ঠি হিসাবে স্বীকৃতিও তাঁরা কখনো পাননি যা তাঁদের অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে থাকতে হোত ; যেমন সরকারী নীতি, যোজনা সূচী ও উদ্দেশ্য ; কিন্তু দেশের যুবা সম্প্রদায়কে আদর্শ নাগরিক কোরে গড়ে তোলার অথবা জাতীয় উন্নয়নে তাঁদের কর্মোদ্যম যথাযথভাবে পরিচালিত করার কোন প্রচেষ্টাই কোনদিন হয়নি। সুতরাং একথা বলা যায় যে সরকারী নীতি ও কর্মসূচী তাদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি অথবা সরকারী সূচী কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে তাদের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। সে ক্ষেত্রে আমি বলব, এই সব নীতি ও কার্য্যসূচী, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য [illegible] সময় বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত হয়নি। এগুলি প্রণয়ন করা হয় সাময়িকভাবে ; সেই কারণে এর মধ্যে প্রাণশক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অভাব থেকে যায়, যার জন্যে যুবা সম্প্রদায়ের প্রয়োজনাদি মেটাবার মত কিছু এতে তাঁরা খুঁজে পাননি। নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিরাও এটা উপলব্ধি কোরতে পারেননি যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হবেন যুবা সম্প্রদায়ই।

অবাঞ্ছিত হয়ে থাকার ফলে যুবা সম্প্র-

দায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের কর্মশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রধানত: দুভাবে এটা ঘটে, প্রথমত: যাকে আমরা বলি 'ব্রেন ড্রেন' বা মেধাবী ছাত্রগণের দেশত্যাগ। যে-সব মেধাবী ছাত্র বিদেশ যাবার সুযোগ পেলেন তাঁরা বিদেশে গিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দেশে ফিরে জাতির সেবায় নিজেদের আত্মোৎসর্গ করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। এই শ্রেণীর মধ্যে আছেন— বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ ইত্যাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত: যাঁরা এদেশেই রয়ে গেলেন তাঁরা এমন সব কাজে নিজেদের নিয়োগ কোরলেন, যা না তাদের স্বার্থে, না দেশের স্বার্থে। আর এর থেকে সুত্রপাত হ'ল আজকের ভারতে শিক্ষিত বেকারী সমস্যার।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, আজকের যুবকদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা দূরের কথা, তাঁদের মেধা বিকাশের পক্ষেও উপযুক্ত নয়। যুব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ অথবা দেশের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনাদির উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্ণবিন্যাসের কোন চেষ্টাই কোন দিন হয়নি। ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন প্রাণ নেই, এটা সর্বনাশী। আমি চাই, শিক্ষা ব্যবস্থায় আশু এবং আমূল পরিবর্তন, যাতে—দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকে এবং যুব সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ কোরতে পারে। এক কথায় বলা যায়, এই ব্যবস্থা যেন এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বাস্তবিকই প্রগতিশীল হয়।

তবে এখানে প্রশ্ন জাগে এই, নতুন ব্যবস্থা একান্তভাবে ভারতীয় হবে না এরমধ্যে আন্তর্জাতিক ছোঁয়াচ থাকবে। অচিরে এ বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

আজ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অশান্তভাব দেখা যাচ্ছে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হোল পুরুষানুক্রম ব্যবধান। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হোল এই যে, ভারতের যুব সম্প্রদায় নানা রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় কেবল যে জর্জরিত তা নয় সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণেরও তাঁরা শিকার হয়েছেন। তাছাড়া যুব সম্প্রদায়কে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলেছে। এ সত্বেও আশার কথা এই, আমাদের যুব সম্প্রদায়, সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। অবিশ্যি এক গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এই সচেতনতা কদাচিৎ ম্লান হয়।

গঠনমূলক কাজে যুব শক্তিকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কথা আমি বলব: (১) যেখানে সম্ভব যুবকদের জাতীয় সম্মান এবং সেই সঙ্গে যে-সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে সেগুলি দেওয়া দরকার। এযাবৎ এ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে। (২) বর্তমান নেতাদের উচিৎ ত্রুটি স্বীকার এবং আপোষের ভিত্তিতে যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। অতীতের দোষ ত্রুটি তাঁদের স্বীকার কোরতে হবে। এরফলে আজকের যুব সম্প্রদায় তাঁদের কার্যাকলাপে সতর্ক হবেন যাতে তাঁদের আজকের নেতাদের মত অবস্থা না হয়। (৩) জাতীয় ভিত্তিতে যুব সম্প্রদায়ের কর্মক্ষমতার হিসেব নিতে হবে এবং দেশের কল্যাণে সে শক্তি নিয়োগ কোরতে হবে।

এবার আমি বলব, ভোটদানের বয়:-সীমা হ্রাস কোরতে। যুবকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা এবং ছোট খাট নষ্টামি-গুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হবে; এইসব সমস্যা সমাধানের জন্যে যে সব আধুনিক ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োগ কোরতে হবে।

---

## মধ্যবিত্ত পরিবার ও স্বাধীনতার পঁচিশ বছর

৩৬ পৃষ্ঠার পর

এঁরাও দেশ বিপন্ন হওয়ার সময়ে নিজের জীবন দান করে দেশ মাতৃকার দেনা শোধ করেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শেষ প্রশ্নর নির্ঝরা 'রাজেন' এদের দলে নেই। খুদিরাম তো নয়ই।

আমাদের ভারতবর্ষের সমাজে আগেকার মধ্যবিত্তকে যদি না পাওয়া যায়, তাতে দেশের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? প্রতিটি বিপ্লব এনেছে আবর্তন। ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম কি এক বৃহত্তম আবর্তন আনে নি? কোন বিপ্লব কি কোন দিন সমাজ ও দেশকে অপরিবর্তনীয় রেখেছে? মধ্যবিত্ত সমাজ প্রসঙ্গেও এই কথাটি প্রযোজ্য। ভবিষ্যতে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেবে এবং নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু সেই শ্রেণী বিত্তের ওপর ভিত্তি স্থাপন করবে কি না বলা শক্ত। আগেকার মধ্যবিত্ত বিত্তহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার 'মধ্য' স্থানটুকুর হস্তান্তর হোলো। আগামী ভারতবর্ষে বিত্ত হয়তো প্রাধান্য পাবে না; পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হোলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সেই বিত্তহীন ভিত্তির উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চতর এবং বা নিম্নতর শ্রেণী থাকবে বলে অনুমান করা যায়। তাতে শ্রেণী বিশেষে প্রতিভার গর্ব থাকলেও অর্থের ঔদ্ধত্য থাকবে না বলে আশা করা যায়। এই ভাবী আশা গঠনের মূলে অতীতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান কি কম?

নবীন ভারতের স্রষ্টাগণ

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভীরেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।
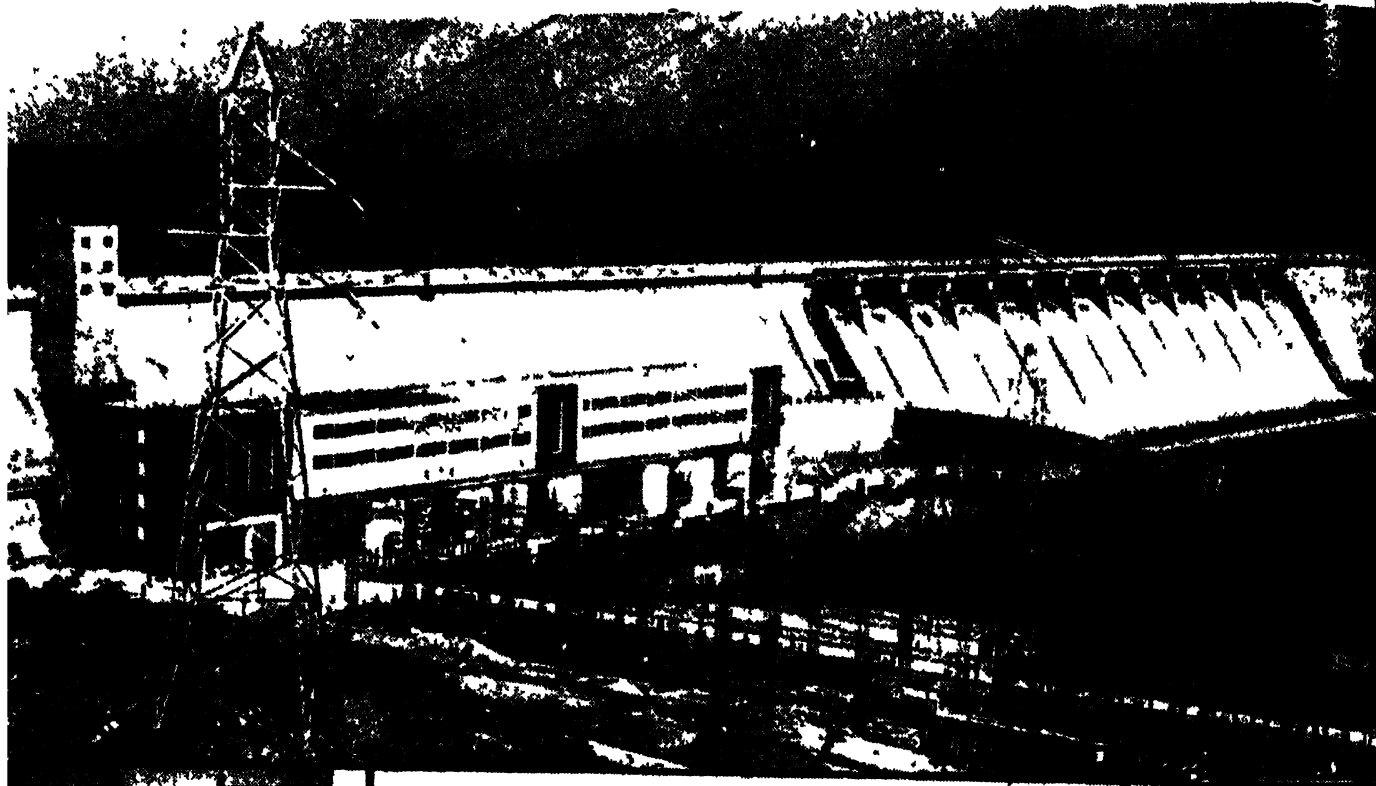
# ধনধান্যে

চতুর্থ বর্ষ ঃ ৭ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ২৫ পয়সা

# ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ : ২৪শে ভাদ্র ১৩৭৯
Vol Iv : No 7 : Spet 15 1972

এই পত্রিকায় দেশের আর্থিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।



সম্পাদকীয় কার্য্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১
টেলিফোন : ৩৮১৬০০, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০
৩৮৫৪৮১/৪০২
টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

## যুগবাণী

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

## এই সংখ্যায়



### প্রচ্ছদপট

ভারতের শিল্পোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের অবদান সামান্য নয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পর শিল্পোন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়। স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের শিল্পে আবার শান্তি ফিরে আসে।

# খরা এবং তারপর

**সম্পাদকীয়**

এ বছর জুলাই আগষ্ট মাসে দেশের ব্যাপক অঞ্চলে খরা দেখা দেয়। শেষের দিকে বেশ কিছু বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে ফসলের ক্ষতি যতটা আশংকা করা গিয়েছিল, তার তুলনায় কম হয়েছে। তবুও অনেক জায়গাতেই বৃষ্টি আসার আগেই ফসল পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং তা কোন ক্রমেই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

ফসলের এই ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার অনেকগুলি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেমন : অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে চাষ করা যায় এমন ধরনের ফসলের উৎপাদন বাড়ানো, খরিফ ও রবি শস্য চাষ করার মধ্যবর্তী সময়ে ডাল, আলু ইত্যাদির ব্যাপক চাষ। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট এড়াবার ব্যাপারে অধিকতর কার্যকারী খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা এবং দেশের অতিরিক্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য পরিবহনের জন্য রেলওয়ের অধিকতর কার্য্যকারীতাও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এছাড়া এ সঙ্কট লাঘবে খাদ্যের 'বাফার ষ্টকের' বা আপদকালে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষিত শস্যের ভূমিকা এবং সঙ্কট মোচনে জাতির দৃঢ়তার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

নাতিশীতোষ্ণ এবং প্রায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জলের অভাব না দেখা দিলে একই জমিতে বছরে দুই বা ততোধিকবার চাষ করা সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক কালের এক বিশ্ব সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে চীন, জাপান, মিশর এবং আরও অন্যান্য অনেক দেশে এই প্রকারের চাষের ফলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে যে সব অঞ্চলে নিশ্চিত সেচের সুবিধা আছে, সেখানে বেশ কিছু কাল ধরে দুই ধরনের ধান বা ভুট্টা এবং গম চাষ চালু হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, জমির দীর্ঘ কালব্যাপী উৎপাদিকা শক্তির কোন ক্ষতি না করেই 'মালটিপল ক্রপিং' বা একই জমিতে বহু ফলন প্রথায় চাষ করে জমি, সময় এবং জলের যথেষ্ট সাশ্রয় করে বেশী পরিমাণ ফসল পাওয়া সম্ভব। সবুজ বিপ্লবে এই 'মালটিপল ক্রপিং' এর অবদান সামান্য নয়। এই ধরনের চাষে নিশ্চিতভাবে সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষের ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। এ সবই সত্যি কথা ; কিন্তু বর্তমানে দেশের কৃষিযোগ্য জমির মাত্র এক চতুর্থাংশ জমিতেই নিশ্চিত সেচের সুবিধা আছে এবং বাকী প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগ জমিতে চাষবাস পুরোপুরিভাবেই প্রকৃতির খেয়াল খুশীর ওপর নিভরশীল।

প্রকৃতির এই আকস্মিক খেয়াল ছাড়াও বরাবরের বৈষম্যমূলক আচরণ তো আছেই : ভারতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০৫ সে: মি:। কিন্তু আসাম এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার নিকটস্থ কিছু অঞ্চলে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ৪০০ সে: মি: ; আবার পশ্চিম রাজস্থান অঞ্চল মাত্র ৪০ সে: মি:।

প্রকৃতির এই খেয়াল খুশী দমনে এবং বৈষম্যমূলক আচরণ রোধবার জন্য আমরা নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যে সব অঞ্চলে অল্প বৃষ্টিপাত হয়, সে সব অঞ্চলের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় স্বল্প সময়ে চাষ হয় এমন এবং অধিক ফলনশীল শস্য চাষের ব্যাপারে ড্রাই ফার্মিং বা শুষ্ক জমিতে চাষের প্রচলন, জমি এবং জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিশ্চিত সেচের উন্নয়ন কল্পে ভূগর্ভস্থ জল ও মাটির ওপরের জল সর্বোচ্চ পরিমাণে কাজে লাগাবার পরিকল্পনাও আমাদের আছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই দেশে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। এই সঙ্গে নানাবিধ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বনসৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির দ্বারা প্রকৃতির খেয়ালখুশীকে সংযত করা সম্ভব হবে। দেশের মোট ৫৪টি জেলায় খরার প্রাদুর্ভাব প্রায় নিয়মিত ভাবেই ঘটে থাকে। এই জেলাগুলিতে খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য চতুর্থ যোজনায় মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যোজনার প্রথম দুই বছরে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩১ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। খরা নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর সেচ প্রকল্প, জমি সংরক্ষণ, বনসৃষ্টি, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগকারী প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ১৯৭০-৭১ সাল থেকে প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকগণের উন্নতির জন্যে গঠিত সংস্থা এবং ক্ষুদ্র চাষিদের উন্নয়নের জন্যে গঠিত সংস্থা বিবিধ প্রকল্পের কাজ সুরু করেছে—ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের চাষীরা যাতে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে। প্রান্তিক কৃষক সংক্রান্ত প্রকল্পে ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে প্রায় ৬.৫ কোটি টাকা এবং এর দ্বারা প্রায় ১.৫ লক্ষ চাষী উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পের যা কাজ হয়েছে, সেগুলি এই রকম : প্রায় ৩৪.০০০ টিউবওয়েল এবং ৮০০০ পাম্পসেট স্থাপন, ৫০০০ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালু করা, ১১০০০ গরু বাছুরের

যোগান দেওয়া। তাছাড়া এই প্রকল্প অনুযায়ী সমবায়ের মাধ্যমে চাষীদের মধ্যে প্রায় ১২ কোটী টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ১৪ কোটি টাকা মাঝারি ধরণের মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে। বাণিজ্যিক লেনদেন করে এমন ব্যাঙ্কগুলিও যথাক্রমে স্বল্প মেয়াদী এবং মাঝারী ধরণের বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে দিয়েছেন যথাক্রমে ৩১ লক্ষ এবং ৩৭ লক্ষ টাকা। সেই রকম ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্যে গঠিত সংস্থার কর্মসূচী অনুযায়ী প্রায় ২,৫00 টিউবওয়েল ও ১২00 পাম্পসেট বসান এবং ২৪0টা সেচ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর থেকে ২.৯ কোটী টাকা ব্যয়ে প্রায় ৬৭000 জন লোক উপকৃত হয়েছেন। সমবায় ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ঋণের পরিমান যথাক্রমে ৩ লক্ষ এবং ৮১ লক্ষ টাকা। এই সব সুযোগ সুবিধা অবশ্য যে সব জায়গায় সবুজ বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করার সম্ভাবনা আছে অথচ উদ্যোগের অভাব ছিল, সেই জায়গাগুলিতেই দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পেছনে যে সব কারণ আছে, তার মধ্যে একটি বড় কারণ হল, অসময়োচিত এবং অপ্রচুর বৃষ্টিপাত এবং চোরাকারবারীদের উৎপাত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধহয় প্রাসঙ্গিক হবে, তা হল, আজ দেশ খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার পর এবং পি. এল. ৪৮0 অনুযায়ী খাদ্য আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর পূর্বের দামে খাদ্যদ্রব্য কিনতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না—অংশত ভাবে এর জন্য দায়ী হল শস্য মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা চাষীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করা।

# বন্যার সঙ্গে সংগ্রাম

সম্পাদকীয়

বন্যার সঙ্গে সংগ্রাম বন্যার তাণ্ডব পৃথিবীর সব দেশেই অল্প বিস্তর ঘটে থাকে এবং আমাদের দেশেও প্রতি বছরই একটা না একটা জায়গা বন্যার শিকার হয়। কিন্তু ভারত সম্বন্ধে যে অদ্ভুত বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়, তা হল একই সময়ে কোথাও বন্যা এবং কোথাও খরার আবির্ভাব। দেশের বিরাটত্ব এবং দেশের বিভিন্ন জায়গার জলবায়ুর মধ্যে তারতম্যই এর কারণ। এই সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই, যদিও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বর্তমানে দেশে যথেষ্ট; তবুও এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের তুলনায় সামান্যই বলতে হবে। এর কারণ স্বাধীন ভারত বন্যা দমনে দামোদর ভ্যালি প্রকল্প, কোশী প্রকল্প ইত্যাদি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে।

তবুও স্বাধীন ভারতে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ কিছু কম নয় প্রকৃতির এই খেয়ালখুশীতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কি রকম, সে সম্বন্ধে নীচের লাইনগুলি থেকেই একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যাবে।

ঠিকমত জল নিষ্কাশনের অভাবে এবং বন্যার ফলে আমাদের দেশে বছরে গড়ে প্রায় ৬৪ লক্ষ হেক্টর জমি ডুবে যায় এবং এর মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ২৪ লক্ষ হেক্টর। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের শিকার হয় প্রধানত বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িশ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ। এই চারটি রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ হল সারা দেশের প্রায় শতকরা ৬0 ভাগ। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭0 সাল পর্য্যন্ত এই আঠারো বছরে বন্যার জন্য আমাদের মোট ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৪00 কোটি টাকা। এর মধ্যে গত চার বছরেই ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয়েছে : ১৯৬৮ সালে ২0৪ কোটি টাকা, ১৯৬৯ সালে ৩৩৩ কোটী টাকা, ১৯৭0 সালে ২৮৭ কোটি টাকা এবং ১৯৭১ সালে ৫৯৬ কোটী টাকা।

সম্পদের ক্ষতি ছাড়াও প্রাণের যা ক্ষতি হয়েছে, তাও খুব কম নয়। বছরে গড়ে বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৭৩C জন লোক এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয়েছে ১৯৬৮ সালে, ৩,৪৯৮ জন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি এই চার বছরে বন্যা ইত্যাদিতে প্রায় হারিয়েছেন গড়ে বার্ষিক ১0৩৩ জনেরও বেশী লোক।

বন্যার এই তাণ্ডব মেটাতে গত ২৫ বছরে আমরা যা করেছি, স্বাধীনতার আগের একশ বছরেও ততখানি করা হয়নি। চতুর্থ যোজনার শুরু পর্য্যন্ত দেশে ৭000 কি: মি: বাঁধ তৈরী হয়েছে, ৯,২00 কি: মি: খাল কাটা হয়েছে, ৪৬00টি গ্রামকে বন্যার কবল থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং ১৭৮গুলি শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এ সবের ফলে ১৬0 লক্ষ হেক্টর জমি ( যেখানে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা সম্ভব ) মধ্যে ৬0 লক্ষ হেক্টর জমি বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো গেছে। এত কিছু করা সত্বেও এখনো অনেক কাজই বাকী রয়ে গেছে।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার একটি এক দশকের পরিকল্পনা (Decade plan ) (১৯৭১-৮১) প্রণয়ণ করেছেন। এতে

ব্যয় হবে ৫৪০ কোটি টাকা এবং এর দ্বারা আরও ৪৬ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এক দশকের পরিকল্পনা রূপায়িত হলে বন্যার জন্য ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ হওয়া বা বন্যাত্রানের জন্য খরচই শুধু বাঁচবে না; পরন্তু এ থেকে বহু লোকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। ১৯৬৯-৭১ সালের বার্ষিক বরাদ্দের চেয়ে ১৯৭১-৭৪ সালের বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ২১.২ কোটি টাকা বেশী করা হয়েছে। হিসাবে দেখা গেছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে ১ কোটি টাকা ব্যয়ের দ্বারা প্রায় ৬০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। সেই অনুযায়ী এই পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরের প্রতি বছরেই প্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। পরিকল্পনার বাকী সাত বছরের বার্ষিক ব্যয় ১৯৬৯-৭১ এর তুলনায় ৩৭.৩ কোটি টাকা করে বাড়বে এবং তারফলে ঐ সাত বছরের প্রতি বছরেই ২.২৪ লক্ষ জন লোক কাজ পাবেন।

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি যেমন হয়ে থাকে, তেমনি বন্যার ফলে প্লাবিত অঞ্চলের জমিতে যে পলি পড়ে, তা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরোপুরি হলে হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালান্স উল্টে যেতে পারে। তাই কিছু কিছু অঞ্চলে বন্যা নিবারণের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য বন্যায় ধন ও প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি যথা সম্ভব কম যাতে হয়, সেজন্য নিরাপত্তামূলক সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তাই বলে সমুদ্র দ্বারা জমির অবক্ষয় রোধ করতে হবে না, এমন কথা নয়। উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহীশূর, মহারাষ্ট্র ও কেরালা এই রাজ্যগুলির ওপর দিয়ে ভারতের সমুদ্র উপকূল রেখা ছড়িয়ে আছে ৫৫০ কি: মিটার ধরে: এর মধ্যে ৩২০ কি: মি: উপকূল রেখা নিরন্তই এই অবক্ষয়ের স্বীকার হচ্ছে। দেখা গেছে, উপকূল রেখা বরাবর গড়ে বার্ষিক জমির অবক্ষয় হয় ৫ থেকে ১০ মিটার জায়গা। এ ক্ষতি নেহাৎ সামান্য নয়—বিশেষ করে ঘনবসতি পূর্ণ রাজ্যগুলির পক্ষে, যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ কম।

উপকূল বরাবর পাথরের দেওয়াল তুলে এই অবক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ষোল বছরে আমরা ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৮০ কি: মি: উপকূল রেখা বরাবর এইভাবে পাথরের দেওয়াল তুলেছি। এখনো পর্যাপ্ত অরক্ষিত উপকূল রেখা বরাবর এই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ৪১ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বিচার বিবেচনা চলেছে—এই পরিকল্পনা রূপায়িত হতে সময় লাগবে দশ বছর।

বন্যা আসছে—এ খবর আগে ভাগেই জানতে পেরে গ্রামবাসীরা বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি বিবিধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন।

# দারিদ্র্য এবং পরিকল্পনা

ডঃ কে. এন. রাজ
সভাপতি, কৃষি-কর কমিটি

বলাবাহুল্য দারিদ্র্য হোল একটি আপেক্ষিক বিষয়। ১৯৬৪ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো এক রিপোর্টে বলা হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী দরিদ্রাবস্থায় রয়েছেন। দারিদ্র্যের সেই মানদণ্ডে যদি আমাদের বিচার করা হয়, তাহলে সামান্য কয়েকজন ছাড়া সকলেই দরিদ্রাবস্থারও নীচে থাকবে। কাজেই ভারতের প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারন করতে হবে।

## উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ :-

ভারতের দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছে। ঠিক এক দশক আগে, পরিকল্পনা কমিশনে এই নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়েছিল। পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত, প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি আদর্শ নমুনা প্রণয়ন করা হয়। এই সংজ্ঞা অনুসারে খাদ্য ছাড়া সাধারণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক আরো কয়েকটি জিনিষ নিয়ে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানের হিসেবে জীবনধারনের ন্যূনতম মান বজায় রাখতে হলে, একটি পরিবারের প্রতিমাসে মাথাপিছু ৩৫ টাকার দরকার হয়। এবং সেই সময়ে দেশের এক পঞ্চমাংশ জনগণেরও তা ব্যয় করার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই দেশের সমগ্র জনগণকে জীবন ধারনের এক স্তরে উন্নীত করার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হোল।

এরপর সাধারন জীবন যাপনের আরো একটু বাস্তবোচিত নমুনা প্রণয়ন করা হোল। এতে বলা হোল, ৫ জন সদস্যের একটি পরিবারের জীবন ধারনের কম পক্ষে ১০০ টাকার প্রয়োজন : অর্থাৎ মাথাপিছু ২০ টাকা।

বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন এই মানই গ্রহণ করেছেন। দু'মাস আগে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে পেশ করা পঞ্চম পরিকল্পনার প্রাথমিক নথিপত্রে বলা হোল যে, ভোগের ন্যূনতম স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারিত করতে হবে। এবং প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬০-৬১ মূল্যমান অনুসারে, জীবন যাপনের একটা যুক্তি সংগত মানে পৌঁছোনোর জন্য মাথাপিছু প্রতিমাসে ২০ টাকা ব্যয় করা দরকার। বর্তমান মূল্যমান অনুসারে অবশ্য এর আনুপাতিক পরিমাণ বেশী হবে।

পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ, 'সুষম খাদ্যের' যে কথা বলেছেন তা বিভ্রান্তিকর। কারণ ভারতে দারিদ্র্যের তীব্রতা এত বেশী যে যে স্বাভাবিক ভাবেই লোকে প্রথমে চাইবে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য কত কম দামে পাওয়া যায়। পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ এর ব্যয়ের দিকের কথা চিন্তা করেন নি।

## ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য :-

পুষ্টি সংক্রান্ত এই নিয়ম সন্তোষজনক কিনা তা নিরূপনের উদ্দেশ্যে নমুনা সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ভোগ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অনুরূপভাবেই বিপদজনক। যে দেশে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য বিভিন্ন দামে পাওয়া যায়, সেখানে ভোগ্যপণ্যের ব্যয়কে পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করা কখনই ঠিক হবে না। খাদ্যে ন্যূনতম যে পরিমাণ ক্যালোরী থাকা দরকার শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী লোক তা পায়না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশে শতকরা ১৮ জন ব্যক্তিকে অন্তত: ক্যালোরীর দিক থেকে খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে হয়। অথচ কেরালায় এর পরিমান হোল শতকরা ৯০ ভাগ। যদিও দুটি রাজ্যের মাথাপিছু আয় সমান। ক্যালোরীর অভাবজনিত অপুষ্টির সংখ্যা কেরালায় অনেক কম হতে পারতো।

এই অপুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের যে মাপকাঠি নিনীত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটি ধারনা করে নিতে পারি। অধ্যাপক দন্তেকরের মতে পুষ্টি হীনতা জনিত দারিদ্র্যের কারণ হোল, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব। এর সমাধান হোল, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

দেশের পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক নীতির বর্তমান মূল লক্ষ্য হোল, কিভাবে দারিদ্র্য দূর করা যায়। 'গরীবি হটাও'- এই স্লোগানের মধ্যেই রাজনৈতিক আদর্শ পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এই আদর্শ,—কর্মসূচী এবং বাস্তবোচিত নীতিতে পরিণত করতে হবে। এটা এমন সময়ে করতে হবে যখন ভারত বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নিভরশীলতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করে নিজস্ব সম্পদের ওপর জোর দিতে সুরু করেছে।

অবশ্য এরমধ্যেও বিতর্কের কিছু অবকাশ আছে। যেমন, কোন ব্যক্তির অপুষ্টির কারণ, তাঁর কর্মহীনতা নাও হতে পারে। খাদ্যের উচ্চ মূল্য ও তাঁর উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতাও এই অপুষ্টি এবং দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে। তাই যদি হয়, তবে কাজের সময় না বাড়িয়ে তার প্রকৃত আয়বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে।

## পূর্ত কর্মসূচী :

দারিদ্র্য-দূরীকরণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে জীবন ধারণের যে ন্যূনতম মানের সুপারিশ করা হয়েছিল, তাতে পূর্ত কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। যেমন, স্থানীয় সহায় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে, সস্তায় পাকা বাড়ী তৈরী করতে পারলে জীবন ধারণের ন্যূনতম মানের একটি অংশ পূরণ করা যায়। গৃহ সমস্যা এমনই তীব্র যে, যুক্তি সঙ্গত দামে যদি বাসস্থানের মত একটি ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানো যায়, তাহ'লে দরিদ্র ব্যক্তিদের সঞ্চয়ে আগ্রহী করে তোলা সম্ভবপর হবে।

যেসব ব্যক্তি চাকরীর জন্য চেষ্টা করেছেন কিংবা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা চাকরীর জন্য সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করেন নি; কিন্তু পেলে সে কাজ করতে ইচ্ছুক—এমন সব ব্যক্তির সংখ্যা নির্ণয় করেছেন জাতীয় নমুনা সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান। তবে এই কথা কতটা নির্ভরযোগ্য তা বলা মুশকিল। ষাট দশকের প্রথমদিকে সংগৃহীত এই তথ্যে জানা গেছে যে, পল্লী অঞ্চলে গড়ে শ্রমশক্তির ৪ থেকে ৫ শতাংশ সম্পূর্ণভাবে বেকার, এবং ৪ শতাংশ আধা বেকার। কাজেই ঐ সময়েই পল্লী অঞ্চলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৮।৯ ভাগ। বেকার এবং আধা বেকারের হার যদি একই থাকে, কিংবা বেশী হয়, তাহলে পূর্ত সংক্রান্ত কর্মসূচীর রূপায়নের মাধ্যমে তাঁদের মোটামুটি কাজে লাগানো যেতে পারে।

## অধ্যাপক দণ্ডেকারের অভিমত :

অধ্যাপক দাণ্ডেকরের মতে গ্রামীন জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যাবস্থার নীচে থাকলেও, এদের মধ্যে দশ শতাংশের ব্যবস্থা সামাজিক সাহায্যদান কার্যসূচীর মাধ্যমে করা যেতে পারে। এ ছাড়া, কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত আধা বেকারদেরই পূর্ত ও নির্মাণ কর্মসূচীতে নিয়োগের প্রয়োজন নেই, কিছু সংখ্যককে পূর্ণভাবে নিয়োগ করলেই হবে, যাতে কৃষিক্ষেত্রে অন্যান্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। প্রকৃত পক্ষে,

তাঁর মতে, পল্লী জনসংখ্যার অবশিষ্ট ৩০ ভাগের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের এক পঞ্চমাংশেরও বেশীকে পূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। এবং আশা করা যায়, এর ফলে অবশিষ্ট আধা বেকারদের কিছুটা সুরাহা হবে এবং পল্লী জনগণের আয়, জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্যালোরী পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হবে। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল, এই কার্যসূচী রূপায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ কত সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যায়, কারণ এর ওপরই নির্ভর করছে জীবন ধারনের ন্যূনতম মান অর্জন অথবা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সাফল্য।

অধ্যাপক দণ্ডেকরের হিসেব অনুযায়ী পূর্ত কার্যসূচীতে মজুরী বাবদ ব্যয় হবে বছরে ৮০০ কোটি টাকা। মজুরী হার গড়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু দৈনিক ২.৪০ পয়সা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ১.৬০ পয়সা। তবে বছরে ৩০০ দিন কাজ দিতে হবে। মজুরী এবং কর্মসূচী রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বাবদ ব্যয় সব মিলিয়ে মোট খরচ দাঁড়াবে ১০০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা বছরে। আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মাণ হচ্ছে যে পরিকল্পনা কমিশনও এই পথে অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপক কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার জন্য পঞ্চম পরিকল্পনা কালে মোটামুটি ভাবে ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ধরণের কর্মসূচী যদি যুক্তি সঙ্গত দক্ষতা এবং পারদর্শিতার সঙ্গে কার্যকর করা যায়, তাহলে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুরাহা। প্রতিক্রিয়ার হবে। বর্তমানে কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে!

## কেরালার দৃষ্টান্ত :

কেরালায় একটি পরীক্ষা মূলক প্রকল্পে, শ্রম তথা উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহায়তায় কর্মহীন শ্রমশক্তিকে উৎপাদনী প্রকল্পে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ এই প্রকল্পগুলি প্রণয়ন করলেও ব্যাঙ্ক কর্তৃক এগুলি অনুমোদিত হতে হবে। এর পর ঐ অঞ্চলের অদক্ষ শ্রমিকদের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরীতে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সর্ত হোল, মজুরীর দুই তৃতীয়াংশ থেকে তিন চতুর্থাংশ নগদ দেওয়া হবে, এবং অবশিষ্ট

অংশ, বছরে শতকরা সাড়ে বারো টাকা হার সুদে, ব্যাঙ্কের তিন বছরের জন্য ফিক্সড্ ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে (Fixed Deposit Account) রেখে দেওয়া হবে। এইভাবে এই প্রকল্পের ব্যয় বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে।

যদিও এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পে কী ধরণের অসুবিধা দেখা দেবে তা এখন থেকে বলা মুশকিল। তবু অনেকে আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রকল্পের দ্বারা স্থানীয় সর্বশ্রেণীর লোকেরই উপকার হবে। অবশ্য নির্ধারিত সর্তাদি মেনে চলতে হবে। পরীক্ষামূলক এই ব্যবস্থার একেবারে শুরু থেকে রাজনৈতিক সমর্থন এবং সাংগঠনিক
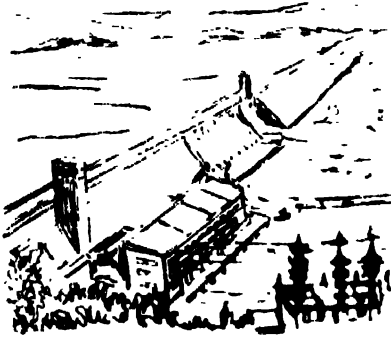
দক্ষতার প্রয়োজন। যদি এ পথে কোন অগ্রগতি না হয়, তাহলে দেশের আজকের সবথেকে বড় সমস্যার সুরাহা হবার আশা নির্মূল হয়ে যাবে।

## অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী

পরিকল্পনা কমিশন এই সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তাতে যথেষ্ট অবাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের অর্থনীতি এমন স্তরে এসে পৌঁছায়নি, যাতে বেকারত্ব, আধা বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সরাসরি মোকাবিলা করতে পারি এবং যথোপযুক্ত উন্নতি সাধন করতে পারি। কিন্তু পরিমাণগত দিক দিয়ে বিচার করলে তা মনে হয় না।

দৃষ্টান্ত হিসাবে কমিশনের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা যায়। কমিশন, পঞ্চম পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ, চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিগুণ করার সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী এর পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের হারের উন্নতি সম্পর্কে যদি আশাবাদী হই, যেমন ১৯৭৩-৭৪ সালে সব লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হওয়া ; পঞ্চম পরিকল্পনা কালে বছরে ৬ শতাংশ হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ১১ শতাংশ থেকে, —১৬ শতাংশ বাড়ানো ইত্যাদি। যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব—তাহলে পঞ্চম পরিকল্পনাকালের বিনিয়োগ থেকে সংগৃহীত সম্পদের পরিমাণ সম্ভবত: ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশী হবে না।

তদুপরি, স্বাভাবিক ভাবেই পঞ্চম পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের কিছুটা অংশ বিনিয়োগ বহির্ভূত ভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় দেখা গেছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধির হার, এবং সরকারী ও বেসরকারী অর্থনীতি ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার, কোনটাই আশানুরূপ হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল সাড়ে ৫ শতাংশের কিছু বেশী ;কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়েছে অনেক কম। বিনিয়োগের হার ৬৮-৬৯ সালের সাড়ে ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৩-৭৪ সালে ১৩ শতাংশ করার কথা ছিল, তা হয়নি। এবং চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ তিন বছরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেটুকু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, তার পেছনে আছে সরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

এইভাবে চতুর্থ পরিকল্পনা কালের মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ থেকে অনেক পরিসংখ্যান নিয়ে দেখানো যায় প্রত্যাশিত উন্নয়নের কতটুকু এখনও বাকী আছে, এবং কতটুকু অর্জিত হয়েছে। কাজেই এটি বোঝা মুশকিল যে, পরিকল্পনা কমিশন কিভাবে বলছেন, এই ধরণের একটা ব্যাপক উন্নয়নী পরিকল্পনা, বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের নিজস্ব উদ্বৃত্ত দিয়েই কার্যকর করা যাবে।

পঞ্চম পরিকল্পনার ব্যাপক লক্ষ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত নথিপত্র প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি কমিশন দিয়েছেন। কাজেই তা হাতে না আসা পর্যন্ত পরিকল্পনার প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সঠিক মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হবার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী রচনা করা হয়, শেষ পর্যন্ত তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয় না
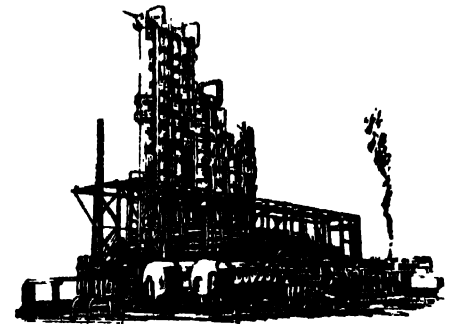
এবং যেটুকু রূপায়িত করা হয়, তাও উপযুক্ত শৃঙ্খলা এবং সতর্কতার অভাবে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হবে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে আগের তুলনায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো বেশী আশার সঞ্চার হয়েছে।

৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

# ১৬ দফা কর্মসূচী

# ও
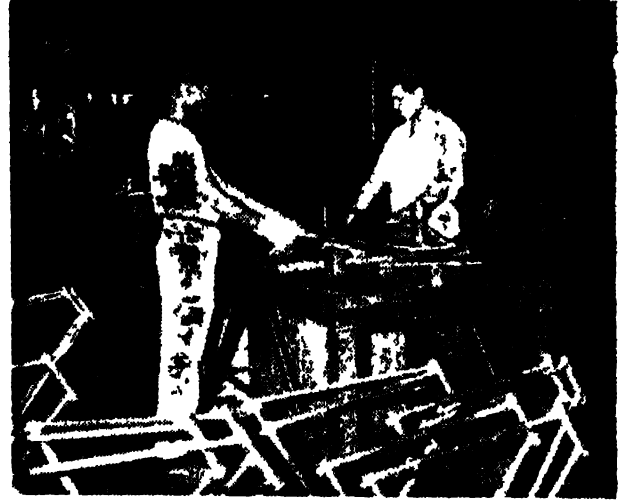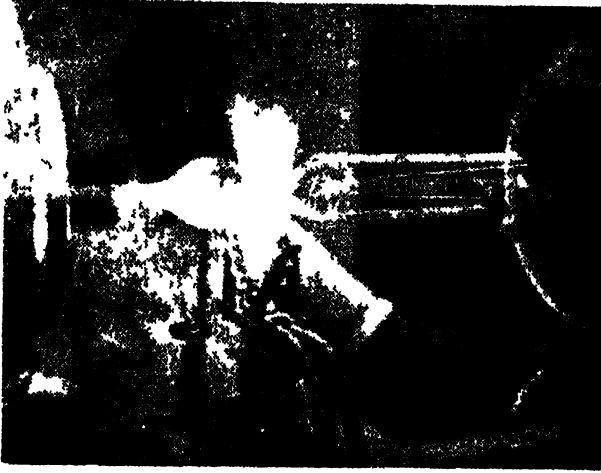
# পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে পুনরুজ্জীবন

রাজ্যে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর থেকেই এখানের শিল্প আবহাওয়া ক্রমশ ভাল হতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলি রাজ্যের শিল্প আবহাওয়া ভাল হওয়ার পিছনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এবছর মার্চ মাস থেকে জুন মাসের শেষ অবধি এই চার মাসে রাজ্যের শিল্পে ৩৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের সাড়া পাওয়া গেছে। এখানে লক্ষ্য করার জিনিষ হচ্ছে, ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে গত পাঁচ বছরে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ কোটি টাকা।

রাজ্যের নতুন সরকার এ পর্যন্ত ২৪টি বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা আবার চালু করাতে সমর্থ হয়েছেন। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি এক বছরের ওপর বন্ধ হয়েছিল। এর ফলে ৯৯০০ জন শ্রমিক আবার তাদের কাজ ফিরে পেয়েছেন। এই ২৪টি কলকারখানার মধ্যে আছে দুটি

চা বাগান, একটি পরিবহণ সংস্থা, একটি সিনেমা কোম্পানি, একটি কাপড়ের মিল, একটি জুট মিল, একটি রবার কারখানা, এবং অন্যান্য কলকারখানাগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সংযোগিতায় ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এ্যাক্ট অনুযায়ী ৯টি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রুগ্ন শিল্প সংস্থার পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন। এগুলির মধ্যে আছে ৬টি কাপড়ের কল (মোট শ্রমিক সংখ্যা ৮৪০০) দুটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা (মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৭০০) এবং একটি ওষুধপত্র তৈরীর কারখানা (মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৯০০) এছাড়া, 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিকনস্ট্রাকসন কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া' এর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আরও তিনটি কাপড়ের কল খুলেছে। এগুলির মোট শ্রমিক সংখ্যা হল ৪৭০০ জন।

বৈদ্যুতিক পাখা উৎপাদন এখন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে
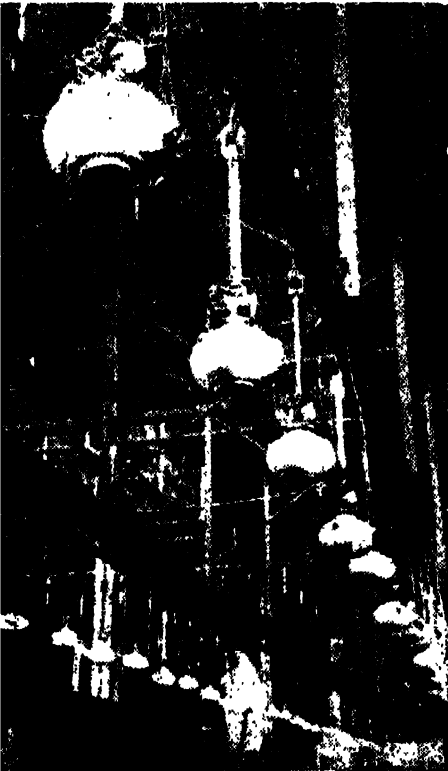
১৯৭১ সালে মোট ৯২টি বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা (মোট শ্রমিক সংখ্যা ৪৬,০০০ জন) আবার খুলেছে।

১৯৭১ সাল থেকে শিল্প স্থাপনের জন্য লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের অবস্থা ক্রমশই ভালর দিকে যাচ্ছে। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্য মঞ্জুর করা লাইসেন্সগুলির সংখ্যা এইরকম: ১৯৬৮ সালে ৩৪, ১৯৬৯ সালে ৬৪, ১৯৭০ সালে ৩৯ এবং ১৯৭১ সালে ৮৭টি। এ ছাড়াও ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৯৭১ সালে মোট ৫৪টি 'লেটার অফ ইনটেন্ট' মঞ্জুর করেছেন। এ বছর জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস অবধি পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২৬টি লাইসেন্স। লেটার অফ ইনটেন্ট মঞ্জুর করা হয়েছে, এর মধ্যে ৪টি নতুন কারখানা, ৯টি কারখানার সম্প্রসারণ, নতুন ধরণের জিনিষ তৈরীর জন্য ৯টি কারখানা এবং ৪টি সি. ও. বি। এই কারখানাগুলির প্রত্যেকটিতেই বিনিয়োগের পরিমাণ হবে অন্তত ১ কোটি টাকা এবং প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতির শতকরা দশ ভাগের বেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করার দরকার পড়বে।

শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে এবং নতুন শিল্প শহরগুলিতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মূল সুযোগ সুবিধাগুলি বন্দোবস্ত করে যাতে এই রাজ্যে শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে 'দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন' সংস্থাটিকে ঢেলে সাজান হয়েছে। কাগজ, কায়ার ব্রীক, এ্যালয় ষ্টীল, মেল্টিং এবং রি-রোলিং ষ্টীল, লৌহপিণ্ড, রিফ্র্যাক্টরী, চাষবাসের যন্ত্রপাতি, সফট্ ড্রিংক এবং বীয়ার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি (W. B.I.D.C.) ইতিমধ্যেই বড় ও মাঝারী ধরণের

কাপড়ের উৎপাদনও নেহাত কম নয়

শিল্পোদ্যোগগুলি থেকে সাড়া পেয়েছে। এই শিল্পগুলির জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০০ কোটি টাকার মত। সম্প্রতি ভারত সরকার যে 'জেনেরাল এ্যালয় ষ্টীল প্ল্যান্টটি' স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন (মোট বিনিয়োগ ৪২ কোটি টাকা) তার শতকরা ২৬ ভাগ সাধারণ শেয়ার নিতে W. B. I. D. C. নীতিগত দিক দিয়ে রাজী হয়েছেন। পুরুলিয়ার একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য 'লেটার অফ ইনটেন্ট' ইতিমধ্যে W. B. I. D C. কে মঞ্জুর করা হয়েছে। ভারত সরকার এছাড়া আরও যে দুটি কারখানা স্থাপনের জন্য নীতিগত দিক দিয়ে 'লেটার অফ ইনটেন্ট' মঞ্জুর করতে সম্মত হয়েছেন; সেগুলি হল, একটি নাইলন সুতো তৈরীর কারখানা এবং একটি অটোমোবাইল টায়ার ও টিউব তৈরীর কারখানা। এ কারখানা দুটি স্থাপিত হবে যৌথ ক্ষেত্রে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য মূল ও প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা যা পাওয়া গেছে তা এইরকম: দুর্গাপুর, কল্যাণী এবং হলদিয়াতে

ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাট, জল নিষ্কাশন ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্গাপুরে একটি বড় ধরণের পূর্ণাঙ্গ শিল্পোদ্যোগ (industrial complex) গড়ে উঠেছে; কল্যাণীতে ছোট ও মাঝারী ধরণের পূর্ণাঙ্গ শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে এবং তৃতীয় শিল্পনগরীটি এখন হলদিয়ায় গড়ে উঠছে। তৈল শোধনাগার, অয়েল-জেটি, গভীর সমুদ্রের বন্দর এবং সার কারখানা হলদিয়ায় এখন নির্মিয়মান অবস্থায়। ফরাক্কা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, সাঁওতালদি এবং খড়গপুরকে শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার একটি কর্মসূচীও রাজ্য সরকার তৈরী করেছেন।

রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর চারটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন: একটি কমিটি শিল্পোন্নয়নের জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার জন্য, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কি পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাবে—তা হিসেব করে দেখার জন্য একটি কমিটি, বিদ্যুতের চাহিদা কি পরিমাণ হতে পারে—তা হিসেব করে দেখবার জন্য একটি কমিটি এবং বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার কতখানি অংশ ব্যবহৃত হচ্ছে তা নির্দ্ধারণ করার জন্য একটি কমিটি। কমিটিগুলিকে তিন মাসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছে।

সুবিধাজনক শর্তে সরকার পরিচালিত আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে আর্থিক সাহায্য যাতে পাওয়া যায় সেজন্য ১৬ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতা, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাকেই অনুন্নত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রেল মন্ত্রক থেকে পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলির জন্য অর্ডার পাওয়ার ব্যাপারেও উন্নতি দেখা গেছে। রেল মন্ত্রক ১৯৭১-৭২ সালের কোটা অনুযায়ী ১২০০০ ওয়াগন এবং ১৯৭২-৭৩ সালের কোটা অনুযায়ী ৮৮৭২টি ওয়াগন তৈরীর অর্ডার দিয়েছেন। একাধিক শিফটে কাজ করবার অনুমতি চেয়ে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আবেদন করে ছিলেন, রাজ্য সরকার তার মধ্যে ১২টি আবেদন পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এর মধ্যে দুটি আবেদন ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করেছেন।

১৬ দফা কর্মসূচীতে এই রাজ্যে বছরে ২০০০টি করে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল, এর মধ্যে এবছর জুন মাস অবধি ১৫২১টি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং এগুলিতে ১০,০১০ জন লোক কাজ পেয়েছেন। শিল্পে কাঁচামাল জোগান দেবার জন্য 'ওয়েষ্টবেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন নামে' একটি কাঁচামাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদার পরিমাণ ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন।

## দারিদ্র্য এবং পরিকল্পনা

৬ পৃষ্ঠার পর

তথাকথিত সবুজ বিপ্লব তার মধ্যে একটি। যদিও শুধুমাত্র গম এবং অন্যান্য দু'একটি শস্যের ক্ষেত্রেই এই সবুজ বিপ্লব সফল হয়েছে, সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়। ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে মোটামুটি একটা অগ্রগতি আশা করা যায়। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে এবং উৎপাদন ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। এছাড়া আর একটি অনুকূল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটা হোল, ডলার মূল্যে সোনার দাম যথেষ্ট বেড়ে যাওয়া এবং সেই তুলনায় ভারতীয় বাজারে সোনার দাম কম বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাশ্রয় হবে এবং এই অতিরিক্ত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা দিয়ে বিদেশী সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কম করতে পারি।

একই সঙ্গে এর অন্ধকারময় দিকগুলির দিকেও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। প্রথমত: উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ প্রয়োগ করা সত্বেও চাল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থতা। দ্বিতীয়ত: রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নমুখীনতা। তৃতীয়ত: সরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনীয় হারে বৃদ্ধি না পাওয়া এবং অদূর ভবিষ্যতেও তার সম্ভাবনা না থাকা। কর আরোপ করে রাজস্ব সংগ্রহ করলেও সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী পূরণ করতে গেলে সংগৃহীত রাজস্বের কিছুই উদ্বৃত্ত থাকবে না।

সম্পদের ওপর চাপ— এ হেন পরিস্থিতিতে রাজস্বের ওপর আরো তীব্র হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নতির গতি দ্রুততর করতে হলে এবং বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হলে প্রাপ্ত সহায় সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্য উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে একটি কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চম পরিকল্পনায় যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছেন এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে যেসব বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে ব্যাপক বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। এই সাধ্যাতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য শুধুমাত্র রাজ্যসরকারগুলিই দায়ী নন, কেন্দ্রীয় সরকারও নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করার দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন ঘটনা থেকে বলা যায় যে, প্রাপ্ত সহায় সম্পদ ঠিকমতো কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা, উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে তার দিকে নজর দিতে পরিকল্পনা কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এটা কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না।

# ভারতের উন্নয়ন নীতিতে সাহায্যকারী মাধ্যম

ডঃ অশোক মিত্র
অর্থ মন্ত্রকের প্রাক্তণ মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

বর্তমান বছরে স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্ণ হবে। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দু' দশক পূর্ণ হবার দিক থেকেও এই বছরটি উল্লেখযোগ্য। কিছুটা দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়ে, ভারতীয় পরিকল্পনা অনেকটা পথ পরিক্রমা করে এসেছে। এককভাবে এবং জাতিগত ভাবে প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু ভুল ভ্রান্তি এবং যথাযথ পরিকল্পনার অভাব ছিল। তবে এই সবের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা আসে।

## পূর্ণতার সন্ধানে

ভারতীয় পরিকল্পনায় পূর্ণতা অর্জনের যাত্রা এখনও চলছে। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য খুবই সাধারণ ছিল, এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের সাহায্যকারী মাধ্যমগুলিও ছিল পরীক্ষামূলক এবং সংগতি বিহীন। মহলানবিশ মডেলে রচিত দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেই, প্রথম আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রকৃত পক্ষে পরিকল্পনায় একটা বাস্তবরূপ লাভ করে। আমরা সম্পদ সংগ্রহের পন্থা, মূলধনী দ্রব্য এবং ভোগ্য পণ্যের মধ্যে সম্পর্ক, মূলধন ও উৎপাদন অনুপাতের বৈশিষ্ট্য বা সেক্‌টোরিয়াল ক্যাপিটেল আউট পুট্‌ রেশিও, এবং স্বয়ংম্ভরতা অর্জনের সহায়ক পণ্য প্রভৃতির বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এ ছাড়া, দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে, আন্তঃশিল্প সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক পরিকল্পনার দুর্বলতা সম্পর্কেও সচেতন হয়েছি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাও কিছুটা এলোমেলো ভাবে শেষ হয়েছিল। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকট প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার নির্দ্দিষ্ট রূপদানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং এই পর্যায়ে একটা জোড়াতালি দেবার চেষ্টা ছিল।

## অভিজ্ঞতার সীমারেখা

কোন অভিজ্ঞতাই ব্যর্থ হয় না। তা সত্বেও পরিকল্পনাকে গত ১০ বছরে অনেক চড়াই উৎরাই এর পর্যায় পার হতে হয়েছে। আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কার্যকরী মাধ্যমগুলির মান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তবুও মোটামুটি ভাবে রাজস্ব ও আর্থিক নীতির চিরাচরিত সাহায্যকারী মাধ্যমগুলির ওপরেই নির্ভর করে এসেছি। আমরা একটা পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা বল্লেও প্রকৃত পক্ষে সরকারের অবাধ-নীতিই অনুসরণ করেছি। অবশ্য এই চিরাচরিত পদ্ধতিকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা কদাচিৎ হয়। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার এবং নির্বাচিত কর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

## অর্থ ও রাজস্বের সংগতি

সরকারের রাজস্ব ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের দিকটা এই নীতির মূল বিষয়। নিজস্ব ক্ষেত্রে সরকার, বরাদ্দের মাধ্যমে কোন জিনিষ নির্দ্দিষ্ট ভাবে রূপায়িত করতে পারেন। কিন্তু সরকার যা বিনিয়োগ করেন, তার সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের একটা প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত।

প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যেখানেই প্রয়োগ করা হয়েছে, সেইখানেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে; কিন্তু এর নেতিবাচক প্রয়োগকে অকাম্য বলতে পারি। অর্থাৎ তাদের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের ঈপ্সিত ফল সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। যেমন, ব্যক্তিগত আয় বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য, অনগ্রসর এলাকায় শিল্পায়ন প্রভৃতি। এর কারণ হোল, আমাদের ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক নয়, নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিত। বেশ কয়েকটি চেক্‌ পয়েন্টে আমাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করে এই ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তা সম্ভব নয়। এবং বছরের পর বছর এইটাই ঘটেছে। কেমন কোরে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি করা যাবে কিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে অথবা অনগ্রসর অঞ্চলের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে যখন সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তখন বেশীর ভাগ দায়িত্ব সরকারী আওতার বহির্ভূত থাকায় কোন উল্লেখযোগ্য ফল লাভ হয়নি।

## পল্লী এলাকায় উন্নয়নমূলক পর্যায়

পল্লী এলাকায় কি ঘটেছে তার পটভূমিতে বিষয়টিকে বিস্তারিত ভাবে খতিয়ে

দেখা যেতে পারে। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে এসেছি। প্রথম পর্যায়ে, ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন বহুমুখী সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ব্যাপক সমষ্টি উন্নয়ন কার্যসূচীর মাধ্যমে গ্রামীন জীবনযাত্রার একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। এবং শেষ পর্যায়ে রয়েছে, নতুন কৃষি ব্যবস্থা বা পদ্ধতির প্রবর্তণ করা। প্রত্যেকটি পর্যায়েই সমগ্র কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঘাটতি পূরণের আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মূল ধারণা বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি।

নীতি সংক্রান্ত অদ্ভুত সংকট হলো যে, এমনকি কৃষি ক্ষেত্রেও সরকার সরাসরি বিনিময় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে ফিরে যেতে চাইছেন। সীমিত ভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার পরিবর্তে, সরকার ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দারিদ্র্য দূর করতে এবং উৎপাদনশীলতার নিম্নগতি রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য, পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা যে সীমাবদ্ধ, তা ক্রমেই বেশী করে স্বীকৃত হচ্ছে।

কাজেই, পরিবর্তিত অবস্থায় সরকার নীতি রূপায়নের কার্যকর মাধ্যম কি গ্রহণ করবেন, তা জিজ্ঞাস্য হতে পারে। চিরাচরিত রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রায় অচল হয়ে গেছে, এবং সেই পথে আমরা অতিরিক্ত রাজস্ব সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবো কিনা সন্দেহ। আমরা যদি নীতি প্রতিষ্ঠানগুলি হস্তান্তর করতে প্রস্তুত না থাকি, তাহলে রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি আর বার ঢেলে সাজাবার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। তার ওপর আমাদের বহু সংগঠনহীন বহুবিধ অর্থনীতিতে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটার জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করা উচিত হবে না।

## জনগণের অংশগ্রহণ

যেহেতু পরোক্ষ সাহায্যকারী মাধ্যমগুলির দ্বারা আকাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হয়নি; সেহেতু পরিকল্পনার সর্বস্তরে জনগণের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্যেই সম্ভবতঃ তার সমাধান রয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ওপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা আমাদের পরিকল্পনার বহু সরকারী নিয়মকানুনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু জনগণের অংশ গ্রহণের এই বিষয়টিকে কিভাবে একটা সার্থক রূপদান করা যেতে পারে তার প্রকৃত কোন উপায় বের করা যায়নি। একদিকে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অন্যদিকে সাহায্যকারী মাধ্যমগুলির মধ্যে একটা ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের উপাদান বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, গ্রামীন সমাজের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে আলোচিত হলেও তার বাস্তবায়নের জন্য নীতি, আদর্শ অথবা সম্পদ সংগ্রহের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। পল্লী অঞ্চলের জনগণকে পরিকল্পনা রূপায়নের বাইরে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে, পরিকল্পনা মাফিক শিল্পোৎপাদনের লক্ষ্যে পেঁছোবার উদ্দেশ্যে মেহনতী শ্রেণীকে কদাচিৎ অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের বহু ভাষাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যদান এবং সর্বস্তরে চাপ সৃষ্টির ফলে সমাজের নিম্নস্তর থেকে এক সুসংহত আন্দোলন গড়ে ওঠা কষ্টকর হয়েছে, অথচ এগুলি উন্নয়নমূলক কাজে সরকারী এজেন্সীগুলির পরিপূরক।

এর ফলে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জনগণ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে না। এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পরিকল্পনা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম না হয়ে বহুক্ষেত্রেই আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে।

## সম্পদ সংগ্রহের সমস্যা

সম্পদ সংগ্রহের সমস্যাও এর দ্বারা প্রভাবিত। পল্লী অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় সরকারকে পল্লী অঞ্চলের অবস্থাপন্ন অংশের ওপর নির্ভরশীল হতে হোল। এবং সেইসব গোষ্ঠির যাঁরা গ্রামের একমাত্র যোগসূত্র তাদের ওপর চাপ না দেওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ হচ্ছে না। অনুরূপভাবে সরকার শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠি বা শ্রেণীর ওপর ভরসা করায় আর্থিক নীতির ভারসাম্যতা বজায় রাখা শক্ত হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় পরিকল্পনার এই অবস্থা দূর হবে না; যদি না নীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে সাধারণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা আমূল পুণর্বিন্যাস না করা যায়। অর্থাৎ একদিকের জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণ অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহ। এবং এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এক সাধারণ সামঞ্জস্য থাকবে।

---

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও উপযুক্ত ডাক টিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

---

# আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
# ভেবে দেখুন

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, বাছা দিয়ে পুরুষদের ব্যবহারের জিনিস, রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে কোটি লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

**সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়**

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবারের জন্মনিরোধক

মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

davp 71/460

# "আপনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই

# কিছু না কিছু উন্নয়নমূলক কাজ চলেছে"

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে অভিভাষণ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কি কি উন্নয়নমূলক কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতের জন্য রাজ্য সরকার কি কি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছেন, সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। জনগণের সহযোগিতায় এই রাজ্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামোদী জনতার কাছে সবচেয়ে সুখের খবর হল, রাজ্য সরকার লবন হ্রদ এলাকায় সুইমিং পুল সম্বলিত একটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটি ইনডোর ষ্টেডিয়ামও কলকাতায় নির্মিত হবে।

সরকার পরিচালনাধীন তিনটি সংস্থা—কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম, ট্রাম কোম্পানি এবং উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম এই তিনটি সংস্থাতেই সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯৭১ সালের তুলনায় বেড়েছে। ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালের প্রথম ছয় মাসে এই সংস্থাগুলির সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৪ লক্ষ টাকা, ১৪০ লক্ষ টাকা, ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ২৯৪ লক্ষ টাকা, ১৬০ লক্ষ টাকা ও ১০৯ লক্ষ টাকা।

স্যাক্সবী ফার্মার এবং ওয়েষ্টিং হাউস কোম্পানি দুটিতে কাজকর্মের যথেষ্ট উন্নতি দেখা দিয়েছে এবং এ দুটি সংস্থাই উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

**রাজ্যে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রেও প্রাণ ফিরে এসেছে—বন্ধ কল কারখানা খুলেছে—সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ছে—সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মের গতি যেমন, টিউব ওয়েল বসান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ত্বরান্বিত হচ্ছে—গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের সুবিধা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও বাড়ছে—লবন হ্রদে ষ্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে।**

গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ ব্যাপারে রাজ্য সরকার গত মাসের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গ্রাম মেদিনীপুর জেলাতেই বিদ্যুতায়িত হয়েছে; বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা এই জেলায় ৩৮টি। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গত মাসের লক্ষ্য ছিল ১২৩টি কেন্দ্র স্থাপন করা, তার চেয়েও ২১টি বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং এর ফলে ৬১৪ জনের বদলে ৮২১ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বঙ্গলক্ষ্মী এবং মহালক্ষ্মী কটন মিলের পরিচালনভার রাজ্য সরকার গত মাসে নিজে গ্রহণ করেছেন।

### কলকাতা

কলকাতা কর্পোরেশন ৪টি গভীর নলকূপ বসিয়েছেন এবং ২৫টি বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে হাত দিয়েছেন। কর্পোরেশন আরও ৩৪০টি নলকূপ বসিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। হাউসিং ডিপার্টমেন্ট কলকাতায় ৭৫ ফ্ল্যাট তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন। সি. এম. ডি. এ. জুলাই মাসে বাঁশদ্রোণী, পূর্বপুরটিয়ারী, মানিকতলাপুর, সাবেংগা এবং সাঁকরাইলে একটি করে নলকূপ বসাবেন। যাদবপুর এবং সন্তোষপুরে একটি করে পাম্প হাউস বসান হবে।

জুন মাসে সমাজের দুর্বলতম অংশের ১০,০০০ জন লোককে বিশেষ পুষ্টি

কর্মসূচীর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট ছিল এর মধ্যে শিশু ও আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোকেরাও অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে আমরা ৯,৯১৬ জনকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনতে পেরেছি।

বিভিন্ন জেলায় জুন মাসে টেষ্ট রিলিফ কর্মসূচীর কাজ কেমন হয়েছে :

২৪ পরগণা-৪৪০, নদীয়া-৬৬৭, হাওড়া-২৬০, মুর্শীদাবাদ-৪৩৪, বাঁকুড়া-১৮৮১, পুরুলিয়া-১০১০, পশ্চিম দিনাজপুর-১১৪৯, কুচবিহার-১৬, বর্দ্ধমান-৬৩১, হুগলী-২৭৫, বীরভূম-১৮, মেদিনীপুর-৫৫৯, দার্জিলিং-২২, মালদা-১৯৯, জলপাইগুড়ি-৭৭।

## ২৪ পরগণা

এই জেলায় গত মাসে মোট ৭৮৬টি টিউবওয়েল নতুন বসানো হয়েছে বা পুরোনোগুলিকে আবার নতুন করে বসানো হয়েছে। এছাড়া ১৫০টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে। ৪৮টি বিদ্যালয়কে এই জেলায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, ১১টি স্কুলের জন্য এবং বিল্ডিং রুমের উন্নয়নের জন্য, ৯টি রিসার্চ সেন্টারের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে। হাউসিং ডিপার্টমেন্ট ২৫৬ ফ্ল্যাটের নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করেছেন এবং ৩৬০ ফ্ল্যাটের নির্মাণকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ডায়মণ্ডহারবারে ৬৮টি বেড সম্বলিত মহকুমা হাসপাতালটির নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হয়েছে। শীঘ্রই এটি খোলা হবে। জুন মাসে এ জেলায় ২২টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

## নদীয়া

রাজ্য সরকার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নবদ্বীপে ১২৫টি শয্যা সম্বলিত সাধারণ হাসপাতালটি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১০০৫টি নতুন টিউবওয়েল বা পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসানো হয়েছে এবং ১০৭২টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে। দুটি পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ১০টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার লক্ষ্যও পূরণ হয়েছে।

## হাওড়া

এ জেলায় ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং দুটি রিসার্চ সেন্টারের এবং স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যও ইতিমধ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে। দুটি পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ জুন মাসেই শেষ হয়েছে এবং জুলাই মাসে আরও দুটি পাম্প হাউস নির্মাণ, দুটি গভীর নলকূপ বসান এবং আরও দুটি গভীর নলকূপ চালু করার কাজে হাত দেওয়ার কথা আছে। লক্ষ্য ছিল ৯টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার; তার বদলে বিদ্যুতায়িত হয়েছে ১০টি গ্রাম।

## পশ্চিম দিনাজপুর

জুন মাসে এ জেলায় একটি পাম্প হাউসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং জুলাই মাসে এই রকম আরও আটটি পাম্প হাউস নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'ইরিগেশন ও ওয়াটার ওয়েজ ডিপার্টমেন্ট' তিনটি বাঁধ তৈরী করার কথা ভেবে দেখছেন।

## বাঁকুড়া

এ জেলায় জুন মাসে প্রায় ১০০টি নতুন বা পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসানো হয়েছে এবং ৪৮০টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে। জুন মাসে মোট ১৩টি গ্রাম এ জেলায় বিদ্যুতায়িত হয়েছে।

## পুরুলিয়া

রিগের সাহায্যে এ জেলায় ৪টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে; তাছাড়া ৩৭৬ টিউবওয়েল জুলাই মাসে বসানোর কথা আছে। ১০২৪ রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে এবং ৬৮১ রিংওয়েল খোঁড়া হয়েছে। জুন মাসে প্রায় ৪৪১০ পাকা গাঁথুনির কুয়ো খোঁড়া হয়েছে এবং আরও ৬০০ কুয়ো খোঁড়ার কাজ শীঘ্রই শেষ হবে। এ জেলায় মোট ৯ গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছে।

## মুর্শীদাবাদ

জুন মাসে নতুন বা পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসানো হয়েছে এমন টিউবওয়েলের সংখ্যা হল ১১৪৯টি। এছাড়া ১২টি কুয়োও খোঁড়া হয়েছে। নতুন বসান চারটি গভীর নলকূপ থেকে সেচের জন্য জুন মাস থেকেই চাষীরা জল পেতে সুরু করেছেন। ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে গোড়ার কাজ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এগুলির কাজ জুলাই মাসেই সম্পূর্ণ হবে। এগুলি স্থাপিত হবে চাকুলিয়া, হরিরামপুর, খাসপুর এবং কাসমাগুতে। জুন মাসে ৯টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হওয়ার কথা আছে।

## কুচবিহার

নতুন ও পুরোনো টিউবওয়েল নতুন করে বসান হয়েছে এমন টিউবওয়েলের সংখ্যা হল ৩৭৩টি। জুলাই মাসেই হাসকুয়া বাঁধকে শক্ত করে দেওয়ার কাজ এবং আব্বাসুদ্দিন ব্রীজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। প্রকল্পিত ৮টির মধ্যে ৪টি নলকূপ থেকে ইতিমধ্যেই চাষীরা জলের সুবিধা পেতে আরম্ভ করেছেন।

## বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান বি. সি. হাসপাতালে শীঘ্রই শয্যা সংখ্যা ৫৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ করা হচ্ছে এবং একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শীঘ্রই স্থাপিত হবে। ইরিগেশন এণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেন্ট ১১টি কর্মসূচীর মধ্যে ৭টির কাজ ইতিমধ্যেই সুরু করেছেন। কিন্তু বাকীগুলির কাজে এখন হাত দেওয়া সম্ভব নয়,

কাঁচামালের অভাবের জন্য মোট ৬৬৮টি নতুন এবং পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসান হয়েছে এবং ৩৪৭৪টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল, ১৯টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার; কিন্তু তার পরিবর্তে ২২টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছে জুনমাসে এবং জুলাই মাসে আরও দশটি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার কথা আছে।

## হুগলী

এই জেলায় মোট ৬৮৯টি নতুন বা পুরোনো নলকূপ নতুন করে বসানো হয়েছে এবং জুন মাসেই ২৫৯টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে। ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ৪টি স্কুলকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। জুলাই মাসে দুটি গভীর নলকূপ থেকে সেচের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার এবং নতুন আরও ১৪টি গভীর নলকূপ বসানোর কথা আছে।

## বীরভূম

বীরভূম জেলায় ইতিমধ্যেই ৪টি সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। জুলাই মাসে আরও ৪টি বাঁধ তৈরীর কাজে হাত দেবার কথা আছে। গত জুন মাসে নতুন টিউবওয়েল বসান এবং পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসান হয়েছে মোট ৬৩৪টি এবং ৭৮২টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছে। গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের জন্য জুন মাসের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল (৬টি গ্রাম) তা পূরণ হয়েছে এবং জুলাই মাসে আরও পাঁচটি গ্রাম বিদ্যুতায়িত করার কথা আছে।



## জলপাইগুড়ি

জুন মাসে এ জেলায় নতুন বসান টিউবওয়েল এবং পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসানো এর সংখ্যা হল মোট ৫৭৯টি এবং মেরামত করা হয়েছে মোট ৩১১৮টি টিউবওয়েল। রাজ্যের বন বিভাগ ঐ মাসে ২২০০ হেক্টর জমি নিয়ে একটি 'ক্র্যাস প্রোগ্রামে' হাত দিয়েছেন। জুন মাসে আরও যা উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে তার মধ্যে আছে ৪টি গভীর নলকূপ চালু করা এবং ৫টি পাম্প হাউস নির্মাণ করা। জুলাই মাসে আরও ৫টি গভীর নলকূপ চালু হওয়ার কথা আছে। রাজ্যের সেচ বিভাগ, গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমন ৫টি প্রকল্পের মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। জুন মাসে গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্য ছিল ৩৮টি গ্রাম—এ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে এবং জুলাই মাসে ১৬টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত করার কথা আছে।

## মালদা

নতুন বসান টিউবওয়েল এবং নতুন করে বসান পুরানো টিউবওয়েলের সংখ্যা হল ৪২৩টি। মেরামত করা হয়েছে মোট ৩৭৩টি টিউবওয়েল। গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্য ১৫টি গ্রাম তা পূরণ হয়েছে। এ সব কিছু হয়েছে গত জুন মাসে। জুলাই মাসে যা হবার কথা আছে, তা হল ৩০টি গভীর নলকূপ চালু করা এবং ১১টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করা।

## জলপাইগুড়ি

শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত রাজ্য সড়কটিতে পাঙ্গা নদীর ওপর সেতুটির নির্মাণ কাজ জুলাই মাসে শেষ হবার কথা আছে। হাসিমারা থেকে মাগুলিং পর্যন্ত রাস্তাটির মেরামতি কাজও জুলাই মাসে শেষ হওয়ার কথা। আরও যা জুলাই মাসে হওয়ার কথা আছে, তা হল ৭টি জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা এবং মাদারিহাটে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা। জুন মাসে এ জেলায় নতুন বসান হয়েছে বা নতুন করে পুরানো টিউবওয়েল বসান হয়েছে মোট ২৩২টি।

## দার্জিলিং

নতুন বসান বা পুরানো টিউবওয়েল নতুন করে বসান এমন টিউবওয়েলের সংখ্যা হল ২৯টি। জুলাই মাসের জন্য নির্দিষ্ট করা কাজের মধ্যে আছে: হাউসিং ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানায় ১৮টা ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া এবং দার্জিলিং এ সরকারী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগটির নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া। জুন মাসেই কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি অবধি ছোট বাস চলাচল আরম্ভ হয়েগেছে।

## রেলে যাত্রাসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি

চলতি বছরের জুন মাসে ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের যাত্রীদের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের এ মাসের তুলনায় শতকরা ৮.১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সময়ে শহরতলী ও দূর পাল্লার রেল যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১১.৪ ও ৩.০৩ ভাগ।

অপর দিকে এ [illegible] ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের ১ লক্ষ টন [illegible] পেয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়েগুলি ১৯৭২ সালে সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসে চার কোটি ১৪ লক্ষ টন মাল পরিবহণ করে। পূর্ববর্তী বছরের এ তিন মাসের তুলনায় এটি প্রায় ২ লক্ষ টন কম।

এই বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই এই চার মাসে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া-বাবদ রেলের আয় গত বছরের সমতুল্য মাসগুলির তুলনায় ৯.৮ শতাংশ বেড়েছে। মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলের আয় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয়তার প্রবক্তা, দেশপ্রেমের কবি ও দিব্যজীবনের ঋষি

শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

# শ্রী অরবিন্দ ও যুগচেতনা

মণি বাগচি

॥ এক ॥

'We do not belong to the past dawns, but to the noons of the future.' সূত্রাকারে বিবৃত শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তিটির মধ্যেই সুস্পষ্ট-রূপে আভাষিত হয়েছে তাঁর যুগচেতনা। তাঁর তপস্যাপূত সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে আমরা শুধু যে ভারত ইতিহাসের ত্রিকালকে প্রত্যক্ষ করি তা নয়—বিশ্ব মানবের ক্রমোত্তরণের ইতিহাসও তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি শুধু ভারতাত্মারই বাণী-মূর্তি নন, তিনি বিশ্বাত্মারই একটি আলোকিত আত্মপ্রত্যয়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও চরিত্র দুই-ই বিস্ময়কর। একদিকে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের সমস্ত জীবনটা নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য এক অলৌকিক যোগসাধনায়—পূর্ণ যোগসাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের যুগচেতনা দুটি ধারায় প্রবাহিত। তার একটি হলো রাজনীতি, অপরটি দর্শন। তাঁর জীবনকে তাই দুটি অধ্যায়ে ভাগ করে দেখতে হবে—একটি তাঁর রাজনৈতিক জীবন, অপরটি আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁর রাজনীতি হলো ক্ষত্রিয়ের রণনীতির সমতুল্য আর তাঁর দর্শন হলো উদ্বর্তনের দর্শন (philosophy of growth) এবং উন্নতির দর্শন। এক-দিকে ভারতবর্ষে তিনি যেমন স্বাধীনতার প্রথম উদ্বোধক, অন্যদিকে তেমনি তিনিই দিব্যজীবনের উদ্‌গাতা।

যে যুগের বাণী চিন্তায় ও কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নতুন পথে নিয়ে যায়, তাকেই ইতিহাসে বলা হয় নবযুগ। নতুন যুগ বা নতুন সৃষ্টি সেই মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায় যিনি পরি-পূর্ণতা লাভের জন্য সদা জাগ্রত থাকেন। এমনি একজন যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ। এমনি এক নতুন যুগের স্রষ্টা তিনি। তাঁর প্রথম জীবনের কর্মসাধনা আর পরবর্তী-কালের যোগসাধন উভয়ক্ষেত্রেই তিনি অতীতকালের রেখাঙ্কিত ঐতিহ্যের পথকে বর্জন করে চলেছেন সামনের দিকে। তাঁর বক্তব্যই হলো 'মহৎ অতীতের পরে আবাহন করতে হবে মহত্তর ভবিষ্যতকে।'

শ্রীঅরবিন্দ একাধারে সংসারী ও সন্ন্যাসী, কবি ও দার্শনিক, যোগী ও যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ, সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও রাজ-নৈতিক নেতা। সাধারণের মতো জীবন-যাপন যে তাঁর ভবিতব্য নয়, এ কথা তিনি অল্প বয়স থেকেই অনুভব করেছিলেন। সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: 'এই ভাব নূতন নহে, আজকালকারও নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এক মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল।'

তাঁর জীবনের বাল্য-পর্বেই বুঝতে

পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সমাধি

পারা গিয়েছিল যে, দেশসেবাই শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ব্রত এবং এই বস্তুটিকেই উপলক্ষ্যরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বরোদায় চাকরীতে। এই সময়ে (১৮৯৩) তিনি বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই পত্রিকাটির সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডে, কেম্ব্রিজে তাঁরই সহপাঠি ছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধের ফল: 'New Lamps for the old,' যা পাঠ করে কংগ্রেসের প্রবীন নেতারা পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের এক স্থলে তিনি লিখেছিলেন: 'কংগ্রেসের নেতারা সর্বহারা নিম্নশ্রেণীকে উপেক্ষা করেছেন—যেন তারা কেউই নয়, কিছুই নয়। তাঁদের কিন্তু বোঝা উচিত যে, এরাই সব, এরাই সব কিছু- এই নিম্নশ্রেণীর হাতেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, আশা-আকাঙ্খার চাবিকাঠি।' গান্ধীযুগের কংগ্রেস যদিও এই সর্ব্বহারা নিম্নশ্রেণীদের কথা চিন্তা করতে সুরু করেছিল, কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে শ্লোগান উঠেছে 'গরিবি হটাও', এরই মধ্যে রূপায়িত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের এই চিন্তা যা আজ থেকে আশী বছর আগে তাঁর মনে উদয় হয়েছিল।

॥ দুই ॥

বরোদা কলেজের অধ্যাপকরূপে শ্রীঅরবিন্দ যখন নিজেকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। যে যুগে গলাবাজিই ছিল দেশসেবার পরিচায়ক, সেই যুগের একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি নীরব কর্মী। তাঁর অন্তরঙ্গ স্থানীয়দের মতে এমন নীরব লোক সংসারে থাকতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ সেই তাঁর অন্তলস্পর্শী নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো চিন্তার বিপুল স্রোত তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে (১৯০৬) শ্রীঅরবিন্দকে জনসাধারণের সম্মুখে আসতে হয়েছিল—তাই লোকে তাঁর কর্মের পরিচয় পেয়েছিল। কিন্তু বরোদায় থাকবার সময়ে নীরবে তিনি যে দেশের কাজ করেছিলেন—খুব কম লোকই তার সংবাদ রাখতেন। বাংলার কাজ আরম্ভ করবার পূর্বেই তিনি মহারাষ্ট্রের তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এই ভাবে: 'একটা জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো তার জীবনধারণের অত্যাবশ্যক শ্বাসবায়ু। এ জিনিস ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতেই পারে না, বাড়তেই পারে না।......জাতির বন্ধনমুক্তি করা, অতি মহৎ ও পবিত্র কাজ। দেশসেবা যজ্ঞের প্রজ্জ্বলন্ত সপ্তশিখার মুখে এখন আমাদের নিজেদেরকে ও আমাদের সব কিছুকেই আহুতি দিতে হবে।'

এ যেন শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান।

১৯০৬। বাংলাদেশে তখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বরোদা কলেজে সাতশো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ মাত্র দেড় শত টাকা বেতনে কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন এবং সেখান থেকেই নীরবে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিচালিত করতে লাগলেন। যে আন্দোলন কেবলমাত্র বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদরূপে আরম্ভ হয়েছিল, প্রধানত: তাঁরই প্রভাবে তা ভারতের স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে এক যুগান্তরের সূচনা করল।

সে যুগে আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শ ছিল ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করে দরবার করে দেশের শাসনকার্য নির্ব্বাহে যতটুকু অধিকার পাওয়া যায়, তার জন্য চেষ্টা করা, নয়ত সভাসমিতি করে আন্দোলন করা এবং এইরকম নিরুত্তাপ আন্দোলনের কেন্দ্ররূপেই আমাদের জাতীয় কংগ্রেস পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। স্বাধীনতার স্বপ্ন যে বাঙালীর প্রাণে তখনও জাগেনি তা নয়, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলবার সাহস কারো হয়নি। তারপর সহসা একদিন যেন সুপ্তোত্থিত হয়ে বাঙালী শুনল বাংলাদেশের আকাশ বাতাস 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। আমরাও যে মানুষ, আমরাও যে মাকে "মা" বলে ডাকতে পারি—আমাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস জাগাল স্বদেশী আন্দোলন; আর এই আন্দোলনের পুরোহিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

স্বদেশী আন্দোলন ছিল ভারতের সনাতন আদর্শে ভারতীয় আত্মাকে জাগ্রত করবার আন্দোলন। শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় এই নবজাগরণের, নব ভারতীয়তার বাণী যেভাবে প্রচার করেছিলেন তাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতে এক নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, প্রখ্যাত বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র পাল জাতীয়তাবাদী দলের ইংরেজী মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটি আরম্ভ করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এর ঘোষিত সম্পাদক। জাতীয় কলেজে অধ্যক্ষ থাকবার সময়েই শ্রীঅরবিন্দ এই পত্রিকাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন এবং

কালক্রমে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন এর প্রাণস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রধান—বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও শ্রীঅরবিন্দ।

মধ্য কলিকাতার স্কটস লেনে 'বন্দেমাতরম' অফিস। রাত তখন দশটা বেজে গিয়েছে। কাগজের অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণপ্রায়। অবশিষ্ট আছে কেবল প্রধান সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এটি প্রধানত লিখতেন শ্রীঅরবিন্দ। আত্মভোলা কবির মতো তিনি বসে আছেন, যেন আত্মসমাহিত। শ্যামসুন্দরবাবু এসে সম্পাদকীয় চাইলেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে তাঁর রচনাকার্য শেষ করে দিলেন—কোথাও একটু কাটলেন না বা থামলেন না—এমন কি ভাবলেনও না। পরদিন প্রত্যুষে সেই লেখা সামমন্ত্রোত্ররূপে প্রকাশিত হলো। স্বৈরাচারী শাসক তাতে কেঁপে উঠল, জাতির প্রাণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল প্রাণাগ্নি। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির একস্থলে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন—'We want absolute autonomy free from British control' অর্থাৎ 'ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা'—জাতির লক্ষ্য বলে শ্রীঅরবিন্দ প্রচার করলেন।

বস্তুতঃ, 'বন্দেমাতরম' ও শ্রীঅরবিন্দ এক এবং অভিন্ন বস্তু। স্বদেশী আন্দোলনের স্বর্ণযুগে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে দিনের পর দিন যুগচেতনা যেভাবে মূর্ত ও প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল এবং শ্রীঅরবিন্দের লেখনী মুখে আশা ও নির্ভীকতার অনলবাণী যেভাবে নির্গত হয়েছিল তা অতুলনীয়। সেদিন তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর স্বজাতিকে দিয়েছিলেন এক নতুন পথের সন্ধান। স্বদেশীযুগের মধ্যপর্বে বিদেশীর অনুসৃত নির্যাতন-নীতির প্রয়োগে যখন জাতির চিত্ত নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন—আমাদের জাতীয় জীবনের সেই দুর্যোগের দিনে 'বন্দেমাতরম্'-এর মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ শুনিয়েছিলেন অভয়বাণী। সেদিন তিনি জাতিকে মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রণক্ষেত্রে নামবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন: 'তোমরা এসো—রক্ত ও অগ্নিস্নানে পরিশুদ্ধ হয়ে তোমরা সবাই মুক্তি অভিযানে অগ্রসর হও' এই বাণীকে সম্বল করেই বাংলায় সেদিন গড়ে উঠেছিল সশস্ত্র বিপ্লব।
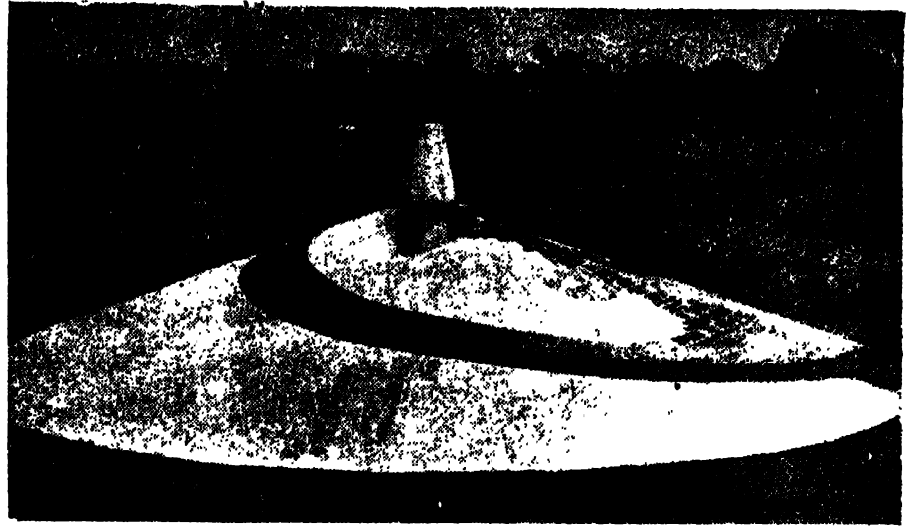
অরোভিলার ভিত্তি—পৃথিবীর সব দেশের মাটি এনে এখানে রাখা হয়েছে

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহচর, বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ যথার্থই বলেছেন: 'This was the man of the hour who had come to take his rightful place in the God ordained movement for the self-fulfilment of the Indian people' অর্থাৎ ভারতীয় জাতিকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য ভগবৎ-প্রেরিত আন্দোলনে যুগনেতারূপে ইনিই এসে তাঁর যথাস্থান অধিকার করলেন।'

জাতীয়তা বা ন্যাশানালিজম—এটাই ছিল সেদিনের যুগচেতনা। বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের মধ্যে জাতীয়তার যে রূপটি ফুটে উঠেছিল তাঁরই চিন্তার উত্তরসাধক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ তাকেই দিয়েছিলেন একটি সুবলয়িত রূপ। যে জাতীয়তা আর দশজনের কাছে বড় জোর মানসিক বিলাস কিংবা রাজনৈতিক হট্টগোল অথবা আকাঙ্খা, সেই জাতীয়তাই শ্রীঅরবিন্দের কাছে ছিল আত্মারই এক বিশেষ প্রকাশ।

শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠেই আমরা প্রথম শুনলাম: ভারতমাতা একটি ভূমি মাত্র নয়। তিনি একটি শক্তি, একটি দেবী।... দেশ বা জাতি কি? আমাদের মাতৃভূমি কি? তা শুধু মাত্র ভূমি নয়, একটা ভাষার অলঙ্কার নয়, মনের কল্পনা নয়; তা এক মহাশক্তি—যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি দিয়ে দেশ গঠিত তাদের সকলের মিলিত শক্তি। যে শক্তিকে বলি ভারতবর্ষ, তা ত্রিশ কোটি লোকের একত্রবদ্ধ প্রাণ শক্তি।'

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় এসেছিলেন নিছক একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে নয়—তিনি এসেছিলেন একটি 'মিশন' নিয়ে। দেশ-হিতৈষণাকে ইষ্ট-নিষ্ঠার মর্যাদা দিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে অধ্যাত্ম-সাধনায় রূপান্তরিত করতেই তাঁর অভ্যুত্থান। অরবিন্দের ন্যাশনালিজম তাই আধ্যাত্মিক

জাতীয়তাবাদ বা spiritual nationalism, এবং তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

দেখতে দেখতে 'বন্দেমাতরম্' শ্রীঅরবিন্দের হাতে হয়ে উঠল অগ্নিবীণা। দিনের পর দিন অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ নির্গত তাঁর লেখনীমুখে অবিরাম এবং অজস্র-ধারায়। তরুণ বাংলা, তরুণ ভারত পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য উদ্দাম হয়ে উঠতে থাকে সেই সব প্রবন্ধ পাঠ করে। মোট কথা, ভারতের অন্তরের ইতিহাস এবং জাতীয়তার এক নব-সংহিতা সেদিন রচিত হয়েছিল বন্দেমাতরমের পৃষ্ঠায় বা ভারতের রাজনীতিতে এনে দিয়েছিল একটা অকল্পিত যুগান্তর। প্রতিদিনের মানুষকে তার প্রত্যক্ষ মর্মে উদ্বুদ্ধ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ জাতির চিরন্তন স্বধর্মের কথা নতুন করে তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এইভাবেই সেদিন তিনি এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছিলেন অচেতন এই জাতির অন্তরে—এই কথা বলেছেন মহারাষ্ট্রকেশরী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। বস্তুতঃ, 'সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্তভাষায়' আর কোনো সংবাদপত্রে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীক অধিকারের দাবি এমনভাবে ঘোষিত বা প্রচারিত হয়নি যেমন হয়েছিল 'বন্দেমাতরম্ পত্রিকায়।

তাঁর এই সময়কার একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: 'আপনারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে থাকেন। জাতীয়তা শব্দটির অর্থ কি? এ তো একটা রাজনৈতিক প্রোগ্রাম মাত্র নয়। এ হলো একটা ধর্ম, যা এসেছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে; এ হলো একটা বিশ্বাস, যার মধ্যে আপনাদের বাঁচতে হবে। জাতীয়তা ধ্বংস হবার নয়। যত অস্ত্রশস্ত্রই এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হোক না কেন, একে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। জাতীয়তার মৃত্যু নেই।' বিদেশী সরকারের দৃষ্টি এইবার নিবদ্ধ হলো শ্রীঅরবিন্দের উপরে। প্রথমবার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনতে গিয়ে সরকার হেরে গেলেন। তারপর ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি ও তাঁর সঙ্গে আরো প্রায় চল্লিশ জন সহকর্মী ধৃত হন। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ—এই ছিল সরকারের অভিযোগ অরবিন্দপ্রমুখ ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এটাই "আলিপুর বোমার মামলা" নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী।

কিন্তু সরকারকে এইবারও হার মানতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের (পরবর্তীকালের 'দেশবন্ধু') সুনিপুণ যুক্তিপূর্ণ জেরার মুখে টিকল না। প্রধান আসামী বেকসুর খালাস পেলেন। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে এমন রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা এর আগে বা পরে আর কখনো হয়নি। আদালতের সামনে শত্রুপক্ষ সমর্থন করে সেদিন প্রধান আসামী মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন: 'আমি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছি। এইজন্য আমি আমার জীবনের সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়েছি। এইজন্য আমি কলিকাতায় এসেছিলাম, এরই জন্য জীবনধারণ করেছি, শ্রম স্বীকার করেছি। এইটিই আমার জাগরণের, নিদ্রার স্বপ্ন। এ যদি অপরাধ হয়, আমি সে অপরাধ স্বীকার করছি। আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে চাই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোনো ধারামতেই অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না।' চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দ প্রচারিত এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকেই ইংরেজের আদালতে বৈধ বলে স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের যুগচেতনার একটি ধারার কথা বললাম। এইবার বলব দ্বিতীয় ধারাটির কথা। আলিপুর আশ্রম থেকে (মামলার সময়ে তিনি আলিপুর জেলে বিচারধীন আসামী হিসাবে একটি বছর কাটিয়েছিলেন; জেলকে তিনি আশ্রম বলে উল্লেখ করেছেন) আমি এক নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলাম। বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কারামুক্তির তিন সপ্তাহ পরে উত্তরপাড়ায় স্থানীয় ধর্মরক্ষিণী সভায় তিনি যে বক্তৃতাটি করেছিলেন সেটি পাঠ করলেই জানা যায় যে, সত্যিই যখন তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি ভগবৎ দ্রষ্টা।

শুরু হয় রাজবিদ্রোহীর মহিমান্বিত জীবনের দিক পরিবর্তন। আগে যাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল Nationalism is religion এখন তাঁরই মুখে শোনা গেল Religion is nationalism শ্রীঅরবিন্দ মানসের এইটাই হলো স্বাভাবিক বিবর্তন এবং এর নিগূঢ় মর্ম উপলব্ধি করতে না পারলে রূপান্তরিত অরবিন্দ মানসের নাগাল পাওয়া কঠিন।

বোমার মামলা থেকে সসম্মানে মুক্তিলাভ করে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু কিছুকাল কাজ করবার পর অন্তরের নির্দেশে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করেন এবং পণ্ডিচেরী গমন করে যোগ সাধনায় নিবিষ্ট হন। এখানে মনে রাখা দরকার যে তাঁর জীবনের বরোদা-পর্বেই তাঁর যোগ সাধনা সূচনা হয়েছিল। যোগী তিনি তখন থেকেই। পরবর্তীকালে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন: আমি যে কাজ আরম্ভ করেছিলাম তা আমারই পরিকল্পিত

REGD. NO. D-233

ধারায় অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং আমি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলাম আমার ব্যক্তিগত কর্ম বা উপস্থিতি ব্যতিরেকেও সুনিশ্চিত জয়যুক্ত হবে। পণ্ডিচেরী যাওয়ার ষোল বছর পরে শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ভারত স্বাধীন হবেই it is a thing decreed, তবে এখনো সে সময় আসেনি। তিনি আরো বলেছিলেন : ঘটনাচক্র এমন দাঁড়াবে যে ইংরেজরা নিজেরাই অতি শীঘ্র ভারত ছেড়ে চলে যাবে। তাই-ই হয়েছিল—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তাঁর জন্মতিথিতে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ধন্য হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ যে নূতন সাধনার সূত্রপাত করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীঅরবিন্দই তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে প্রকট করে গেলেন। তাঁদের জীবনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল। প্রচণ্ড ভারতবর্ষকে তিনিই বিশ্বচেতনার মানচিত্রে দীপ্যমান করে দিয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সেই নূতন ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ; তাঁরই দিব্যবাণীতে শুনলাম এই ভারত-যজ্ঞে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণলিপি বেদে উপনিষদে ছিল ভারত-ঋষির অমৃতত্বের যে প্রতিশ্রুতি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের সাধনার মধ্যে হল তার পরিপূর্তি।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপূর্ব সাধনার বলে ভারতের প্রাচীন যোগসাধনাকেই উজ্জ্বল করে, বর্তমান যুগের উপযোগী রূপ দিয়ে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। গীতাই যে কর্মের প্রকৃত কৌশল 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষাকেই আমাদের কানে নতুন করে বহন করে নিয়ে এলেন শ্রীঅরবিন্দ। গীতার সত্য আদর্শকেই তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন তাঁর পূর্ণযোগ সাধনার মধ্যে। জড়বাদী য়ুরোপ ভগবানকে অস্বীকার করেছিল আর মায়াবাদী ভারত হয়েছিল কর্মবিমুখ। শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যয়ের সুরে ঘোষণা করলেন 'মানবজাতিকে যদি রক্ষা পেতে হয়, তবে আবার সেই গীতার সত্য আদর্শে ফিরে যেতে হবে—ভিতরে অধ্যাত্ম চৈতন্য ভাগবত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিব্যভাবে বাইরের সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করতে হবে।'

আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জীবনের সমন্বয়—এই আদর্শই বর্তমান যুগের পক্ষে উপযোগী। শ্রীঅরবিন্দ গীতার সাধনার লক্ষ্য থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন : ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানবজাতি একদিন এমন স্তরে উপনীত হবে যেখানে অধ্যাত্ম জীবন লাভ করতে মানুষকে আর আগের মতো বেগ পেতে হবে না।' তিনি দেখিয়েছেন যে, ঊর্ধ্ব হতে পৃথিবীতে এক ভাগবত শক্তির অবতরণের ফলেই মানবজাতির ঊর্দ্ধতর বিবর্তন সংসিদ্ধ হবে। সেই শক্তির অবতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্রত।

শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল মন্ত্র আত্মসমর্পণ, আর মূল লক্ষ্য হলো এই পৃথিবীর মানুষের দেবত্বে রূপান্তর। তিনি বলেছেন : দেবতা কেউই নয়। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দেবতা আছেন। তাঁকে প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। ১৯২৬ সালে তখন তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এলেন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দকে দর্শন করতে। তাঁকে তাঁর নিভৃত তপস্যার আসনে সন্দর্শন করে কবি লিখেছিলেন আজ অরবিন্দকে দেখলুম তাঁর তপস্যার আসনে। অপ্রগলভ স্তব্ধতায়। আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। আমার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে—শৃন্বন্তু বিশ্বে। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের এই উপলব্ধিকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অলৌকিক সাধনার দ্বারা সত্য করেছেন, সার্থক করছেন। পণ্ডিচেরী আজ তাই বিশ্বমানবের নবীন তীর্থ।

## গ্রীষ্মকালে ডিম সংরক্ষণের উপায়

হরিয়ানার হিসারে অবস্থিত পশু বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গরম কালে ডিম সংরক্ষণ করা মোটেই সমস্যার বিষয় নয়। তাঁরা বলেন, তরল প্যারাফিন এর সঙ্গে তিল তেল মিশিয়ে ডিমের গায়ে প্রলেপ দিয়ে রাখলে বেশী গরমেও ডিম তাজা থাকে।

৭৫ ভাগ প্যারাফিন এবং ২৫ ভাগ তিল তেল একটি বাটিতে মিশিয়ে তার ভিতর একটির পর একটি ডিম ডুবিয়ে নিয়ে তুলে রাখলে তা অন্তত তিন সপ্তাহ তাজা থাকে।

## উচ্চফলনশীল জাতের মসূর ডাল

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে, সেখানে উদ্ভাবিত তিন রকম নতুন জাতের মসুর ডাল যথা পুসা-১২ এবং পুসা-১-৬ ও ২ হেক্টারে ১৭ থেকে ১১ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

এই নতুন জাতের মসুর শুধু বেশী ফলনই দেয় না, তা পাকতেও সময় লাগে কম। অন্যান্য জাতের স্থানীয় মসুর যেখানে পাকতে সময় নেয় ১১০ থেকে ২০০ দিন, সেখানে এই নতুন ডালগুলি মাত্র ৭০ থেকে ৮০ দিনেই কাটার উপযোগী হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই তিনটি জাতের মধ্যে পুসা-১-৬ ৭২ দিনে হেক্টার প্রতি ১৮১৭ কেজি ফলন দিতে সক্ষম হয়েছে।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং তীরেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী ৫ কর্তৃক মুদ্রিত

REGD. NO. D-233

# ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

## নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

সব রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"

যোজনা ভবন

পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট,

নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-

বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন

দেশকে জানুন
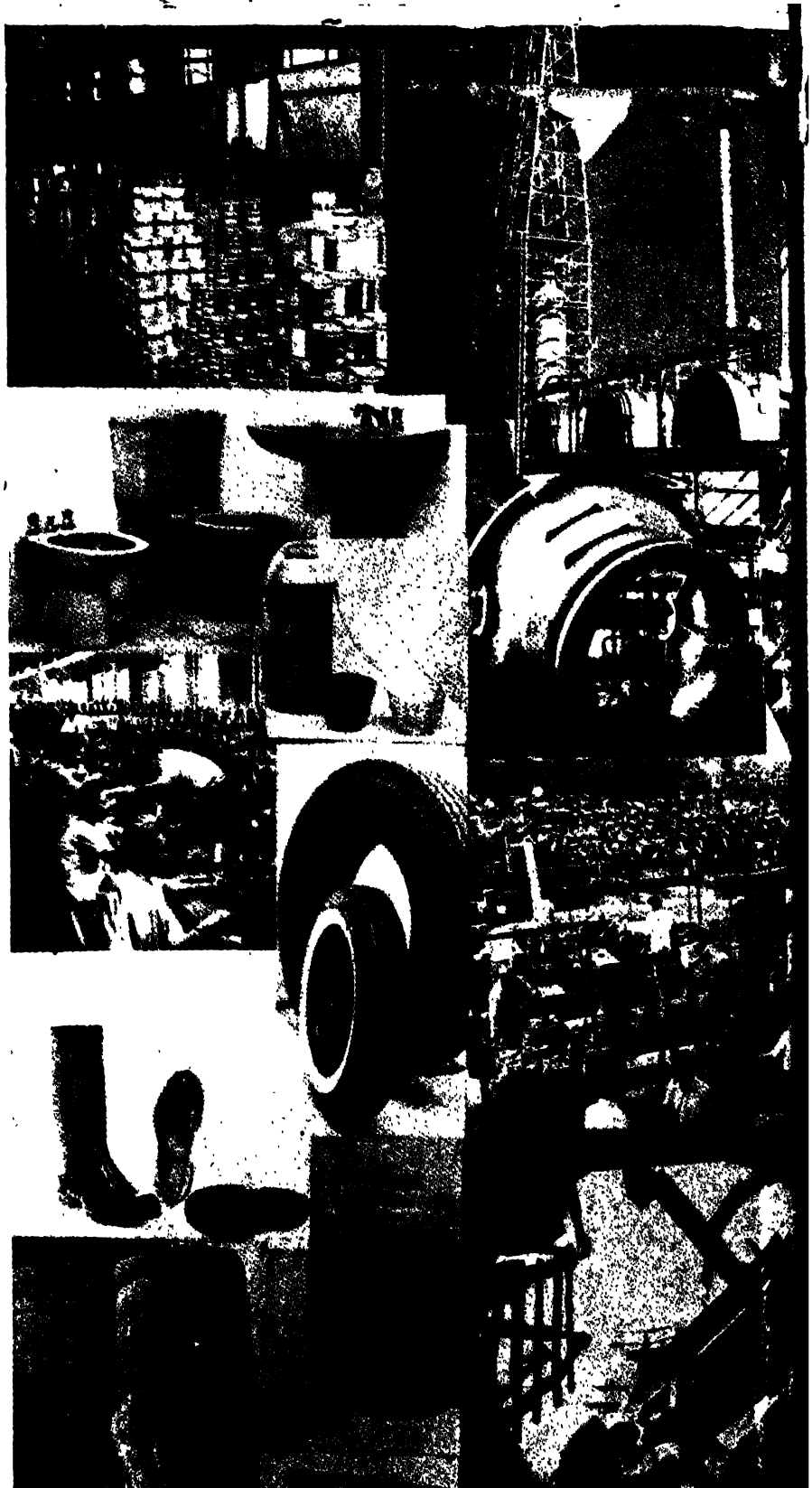
# ধনধান্যে
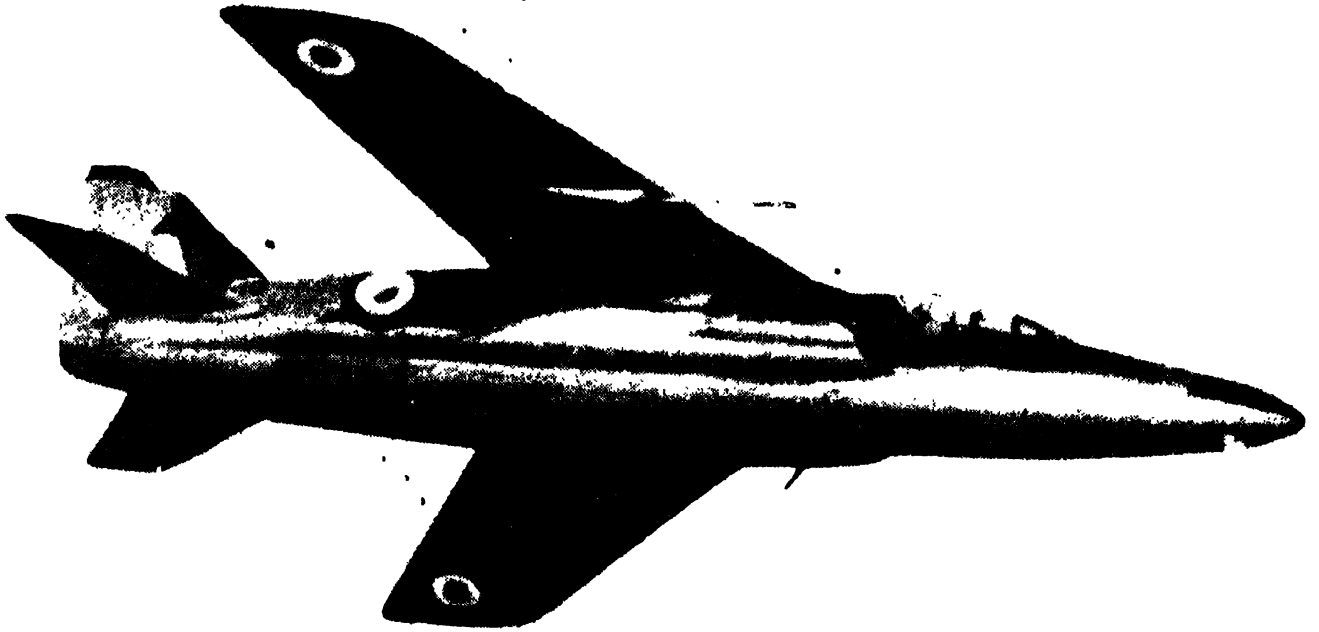
প্রতিরক্ষা উৎপাদন ★ দুর্গাপুরের শিল্পনৈতিক গুরুত্ব

# ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ নবম সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর ১৯৭২ : ২৪শে আশ্বিন ১৮৯৪
Vol vI : No 9 Oct. 15 1972


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।


প্রধান সম্পাদক
দ্বারকা নাথ মুন্সী
সহ সম্পাদক
সমর ঘোষ
উপ-সম্পাদক
দিলীপ কুমার ঘোষ
সংবাদদাতাগণ
সুভাষ বসু ( কলিকাতা )
এস. ভি. রাঘবন ( মাদ্রাজ )
বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ( শিলং )
বসকট কৃষ্ণ পিল্লে ( ত্রিবান্দ্রাম )
অবিনাশ গোডবোলে ( বোম্বাই )
সিদ্ধাতন কারিয়াল ( দিল্লী )
ফোটো অফিসার
কে. নারায়নস্বামী
প্রচ্ছদ পট
স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র উপরে ;
শূন্য থেকে শূন্য নীচে :
স্থল থেকে স্থলে

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১
টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২
টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা


## যুগবাণী

যে দিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রীক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেন না পরস্পর নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে সকল ধর্ম্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে —রবীন্দ্রনাথ

## এই সংখ্যায়

সূচী

# বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

"পঞ্চম যোজনার পথে" নামে যে তথ্যমূলক দলিলটি ইতিমধ্যেই তৈরী করা হয়েছে, তাতে এই যোজনায় বিনিয়োগের আকার, ধরণ এবং যোজনার মূল লক্ষ্য ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে। মূল লক্ষ্য হল, সবচেয়ে অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করা। বাস্তবিকই, বেকার সমস্যা আজ এমন এক অবস্থায় এসে পেঁাছেছে যে এটির সমাধান পঞ্চম যোজনার মূল লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। সমস্যাটিকে আমরা সমাধান করতে চলেছি এক যোদ্ধার মনোভাব নিয়ে। বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার অর্থই হল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা।

সম্প্রতি, পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির এক আলোচনা চক্রে যোজনামন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধর বেকারত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা সম্বন্ধে আভাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শীঘ্রই আমরা এমন কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যার দ্বারা বর্তমানে দেশের ২৬ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই বিষয়ে এমন কতকগুলি নীতি প্রণয়ন করা দরকার, যেগুলির সুফল চতুর্থ যোজনার বছরগুলিতেই যেন পাওয়া যায়। অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলিতে, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের উৎপাদনকল্পে এবং কৃষিতে আরও বিনিয়োগ বাড়িয়ে অবশ্যই এ সমস্যার সুরাহা হবে এবং পঞ্চম যোজনা রচনায় এই গুলিই হবে নির্দেশক নীতি।

খুবই দুঃখের বিষয় যে, প্রত্যেকটি যোজনাতেই আমরা এই সমস্যাটির আশু সমাধানের কথা বলে এসেছি, কিন্তু আজ বিশ বছর ধরে পরিকল্পনার পরও সমস্যাটির আকার কিছু মাত্রায় কমেনি। দশ বছর আগে দেশে কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা যা ছিল, আজ তার তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক লোক কর্মে নিযুক্ত আছেন সত্য, তা সত্বেও সমস্যাটি দিন দিন কমার বদলে বেড়েই চলেছে। এর ফলে বিষয়টি আজ এমনই অবস্থায় এসে পেঁাছেছে যে, বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখনই অর্থনীতির (সরকারী এবং বেসরকারী) উভয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে যদি এ সমস্যার সমাধান না হয়, তবে এক দারুণ বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। এ নিয়ে এ যাবৎকাল বহু আলোচনা, বহু তথ্যমূলক রচনাও তৈরী হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুতেই তেমন কিছু ফল লাভ হয়নি। তাই চতুর্থ যোজনার মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়নে পঞ্চম যোজনা রচনাকালে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।

এই সব বিমূর্ত বিতর্ক ও আলোচনায় এবং তথ্যমূলক রচনায় আমরা কাগজে কলমে হিসেব করে দেখেছি, কোন একটি বিশেষ যোজনার কর্মসংস্থান ক্ষমতা কত—একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগের পিছনে কি কি যান্ত্রিক সম্ভাবনা আছে বা যোজনার ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত আয় এবং কর্মসংস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ইত্যাদি। অথবা বিনিয়োগ এবং শ্রমশক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে সরাসরি নির্দ্ধারণ করতে চেয়েছি যোজনার শেষে কি পরিমাণ অতিরিক্ত কর্ম সৃষ্টি হতে পারে, সেই বিষয়ে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আমাদের পর্ব পরিকল্পিত সব চিন্তা ভাবনাই বানচাল হয়ে গেছে।

অবস্থাটি এই রকম: না সরকারের না নীতি নির্দ্ধারকদের কারোরই, কি সরকারী কি বেসরকারী কোন ক্ষেত্রেই কর্মসৃষ্টি-কারী বিনিয়োগের ওপর সম্ভবত কোন হাত নেই। এই রকম হয়ে থাকে, কারণ যোজনা রচনা এবং তার রূপায়ণের মধ্যে এমন অনেক কিছু প্রতিকূল ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ভাবে ঘটে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পরিকল্পনা এবং প্রকল্পগুলিতে অনেক সময়ই পূর্ব নির্দ্ধারিত অঙ্কের চেয়ে আমরা কম ব্যয় করতে বাধ্য হই। তাই দেখা যায়, সবুজ বিপ্লব বা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প ক্ষেত্রগুলি কোনটিই গ্রাম থেকে শহরে শ্রমশক্তির অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারেনি। সুতরাং যা প্রয়োজন, তাহল, যোজনার আরও বাস্তবধর্মী মূল্যায়ণ ও আরও বাস্তবধর্মী ভাবনা চিন্তা—যাতে করে এই সমস্যাটির ঠিকমত সমাধান করার জন্য একটি চরম নীতি নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়।

আরেকটি বিষয় হল এই যে, বেসরকারী উদ্যোগগুলি দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে মোটেই সচেষ্ট নয়। বেসরকারী উদ্যোগগুলির নীতি নির্দ্ধারিত হয় প্রতিষ্ঠান কি করে অধিক লাভবান হবে তার ওপর ভিত্তি করে। একথাও সত্য যে, সরকারী উদ্যোগগুলির তুলনায় বেসরকারী উদ্যোগগুলিতে প্রতি একক অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা অধিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বর্তমান। কেন না, সরকারী উদ্যোগগুলি প্রধানতঃ ভারী এবং মূল শিল্পগুলির মাধ্যমে শিল্পে স্বয়ংভরতা অর্জনের কাজেই ব্যস্ত। কাজেই দেশের বেকার সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টারই অধীন নয়, এ দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগগুলিরও। এই কারণে যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগগুলিকেও বহন করতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতি রচনায় অবশ্যই এ বিষয়টির স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার।

# দুর্গাপুরের শিল্পনৈতিক গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

অনিল কুমার আচার্য

১৯৫৬ সালে ইস্পাত কারখানা নির্মাণ শুরু হল। ক্রমে ক্রমে আনুষঙ্গিক শিল্পও অনেক গড়ে উঠতে লাগল এই ইস্পাত কারখানাকে ঘিরে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগও বেড়ে চলল দুর্গাপুর কালক্রমে এক ইনডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্সে পরিণত হল। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পর এই উন্নয়নের গতিতে ভাঁটা পড়ল—ইস্পাত কারখানার প্রাথমিক লক্ষ্য, ১৬ লক্ষ টন উৎপাদন পূরণ হবার পর কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্য, ৩৪ লক্ষ টন উৎপাদনের কাজ ঠিক ভাবে এগোচ্ছে না। রাজ্যে ১৯৬৫ সালের পর শিল্পে যে মন্দা দেখা দেয়—তার জন্য এটিও একটি কারণ। উন্নয়নের গতি ঠিকভাবে চললে কর্মসংস্থান সমস্যার কিছুটা সমাধান অবশ্যই হত এবং রাজ্যের শিল্পায়নও বেশ এগিয়ে যেত।

স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুরকে পশ্চিমবঙ্গের "রূঢ়"-অঞ্চল রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে স্বপ্ন কতটুকু সফল হয়েছে জানিনা। তবে বিভিন্ন শিল্প সমাবেশের ফলে একক শিল্প-নগর হিসেবে দুর্গাপুর যে ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু কি কি শিল্প সমাবেশের ফলে দুর্গাপুরের এই গুরুত্ব, এর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনাই বা কতটুকু, সে সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই সুস্পষ্ট ধারণা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দুর্গাপুর সম্বন্ধে আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দুর্গাপুরে আনুমানিক ২০টি বড় ও মাঝারি এবং ৪৩টি ছোট শিল্প সংস্থা অবস্থিত। বর্তমানে এখানে বিনিয়োগের পরিমান প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। শুধু নিবন্ধীকৃত (Registered) ফাক্টরী কর্মীর সংখ্যাই প্রায় ৬০ হাজার। একক শ্রমিক সমাবেশের দিক্ থেকে দুর্গাপুরের স্থান সকলের পুরো ভাগে। শিক্ষা মানের দিক্ থেকেও এরা তুলনামূলক ভাবে বেশ এগিয়ে আছেন, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও বেশ উল্লেখযোগ্য। যেখানে জাতীয় গড় পড়তা আয় প্রায় ৫০৬ টাকা মাত্র সেখানে দুর্গাপুরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ প্রায় ৯০০ টাকা।

১৯৫৫ সনের কাছাকাছি দুর্গাপুরে দামোদর নদীর উপর ডিভিসি বাঁধ নির্মিত হয়। পাঞ্চেৎ ও মাইথন বাঁধের জলে পরিপুষ্ট এই বাধ হুগলী ও বর্ধমান জেলায় সেচ-ব্যবস্থার এক প্রধান উৎস এবং দুর্গাপুরে অবস্থিত তাবৎ শিল্প প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জলের একমাত্র উৎস। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঐ সময়েই গৃহীত হয় এবং ১৯৫৬ সালে এর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রায় এই সময়েই ডাক্তার বি. সি রায় রাজ্য সরকারের তরফে এখানে একটি কয়লা চুল্লী (কোক ওভেন) ও উপজাত দ্রব্য সমূহের কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। উদ্দেশ্য, রাজ্যের বিরাট কয়লা-সম্পদের সদ্ব্যবহার, কয়লা-ভিত্তিক কেমিক্যাল শিল্প সমূহের ভিত্তি স্থাপন এবং কলকাতায় কয়লা চুল্লিজাত ৫০ লক্ষ ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা। নির্মীয়মান স্থানীয় শিল্প সমূহকে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোক-ওভেনের সঙ্গে একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রও (থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট) স্থাপিত হয়। এই কোক-ওভেন ও থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের পরি-

চালনা ভার রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রীস্ বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হয়। জমিদখল ও নগর উন্নয়নের ভারও এই বোর্ডের উপরই ন্যস্ত করা হয়।

১৯৫৫ সনের ১০ বছরের মধ্যে দুর্গাপুরে অনেক বৃহৎ ও মাঝারি আয়তনের শিল্প সংস্থা গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর শিল্প সমূহের অনুপূরক হিসেবে অনেক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও এখানে গড়ে উঠবে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্ (কোক-ওভেন ও থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট) ছাড়াও নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান শিল্প সংস্থা সমূহও এখানে গড়ে উঠেছে :—

১। এলিসি ভিকারস্ ব্যাবকক্ (A V. B) এদের কাজ হল সিমেন্ট তৈরির যন্ত্রপাতি, বয়লার, প্রেসার ভেসেল প্রভৃতি তৈয়ার করা।

২। এ্যালয় ষ্টিলস্ প্ল্যান্ট (হিন্দুস্থান ষ্টীলের একটি একক শাখা)। এদের কাজ নানা ধরণের মিশ্র লৌহের উৎপাদন।

৩। দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ লিমিটেড (রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা)। এদের কাজ হল মৌল, জৈব ও অজৈব ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন।

৪। দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন (দুর্গাপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র—ডি ভি সির একটি শাখা)। নামেই এর কাজের প্রকাশ।

৫। মাইনিং অ্যাণ্ড এ্যালায়েড মেশিনারী করপোরেশন (MAMC)—কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা। এদের কাজ কয়লা উত্তোলনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ।

১৯৬৫ সনের পর দুর্গাপুরের শিল্পোন্নয়নের গতিতে ভাটা পড়েছে। দশ লক্ষ টন থেকে ১৬ লক্ষ টনে দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যান্টের সম্প্রসারণের কাজ তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ১৬ লক্ষ থেকে ৩৪ লক্ষ টনে উন্নয়নের কাজ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৫ সনের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে যে মন্দা ও অন্যান্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখা দেয়, তা প্রধানত এসবেরই কারণ। যাই হোক্, ইতিমধ্যে (AVB) ৭০ লক্ষ টাকার এক উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

## দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা ও শিল্পোন্নয়ন

১৯৫৮ সনের দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড কন্ট্রোল অব বিল্ডিংস অপারেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী একটি আইনানুগ সংস্থা হিসেবে দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থা দুর্গাপুর শিল্প বোর্ডের হাত থেকে ১৯৬০ সনের পর ধাপে ধাপে শিল্পোন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের ভার গ্রহণ করে। তৃতীয় যোজনাকালে রাজ্য সরকার সাবসিডিয়ারি ইণ্ডাষ্ট্রিস স্কিম নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে ইণ্ডাষ্ট্রিস বোর্ড ও পরে দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী রূপায়ণের ভার গ্রহণ করে। জমি দখল, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, পয়: প্রণালী, রেলওয়ে সাইডিং ও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা এই প্রকল্পের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিল্পোদ্যমে বিনিয়োগকারিগণকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে জমি সরবরাহ করাও এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। এই প্রকল্প অনুসারে এখন পর্যন্ত ১৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, আর ৫০০১ একর জমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সন পর্যন্ত এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্রিম অর্থ সাহায্যের [illegible] ১৭১ লক্ষ টাকা। বাকী ৪৭ [illegible] বিক্রয় [illegible]

দুর্গাপুর সিটি সেন্টার। ছবি [illegible]
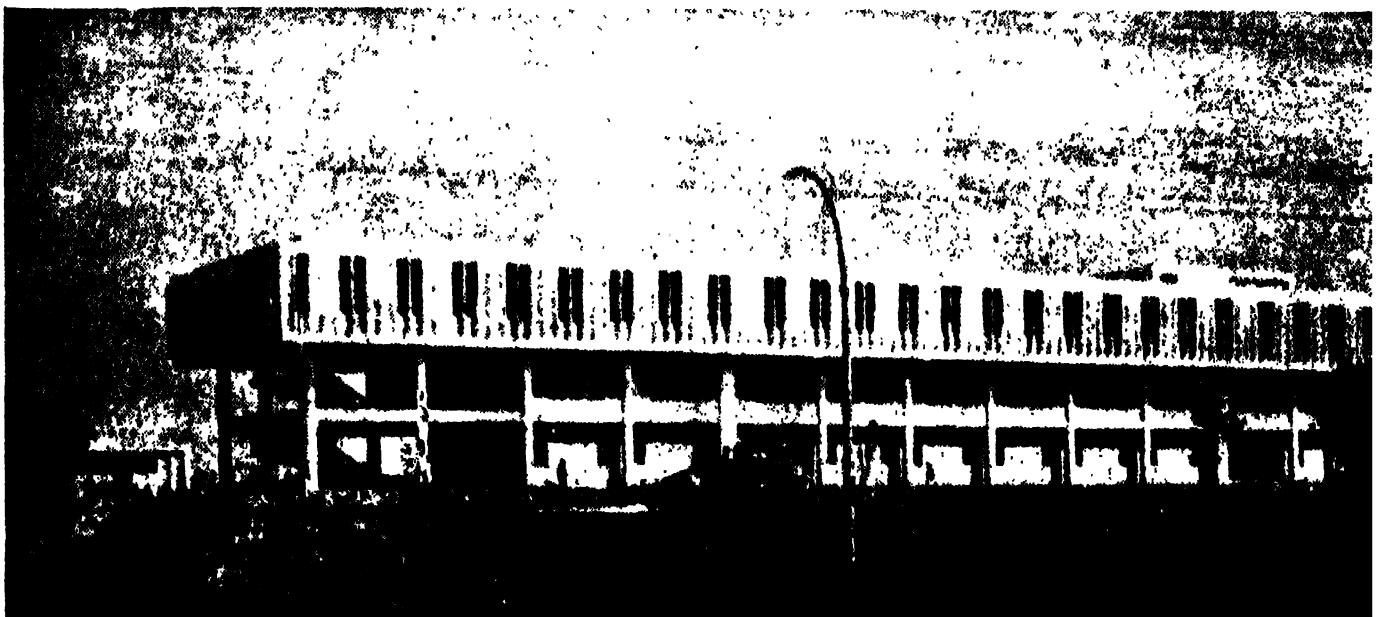
থেকে এসেছে। দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা থেকে সরকার এখন পর্যন্ত পূর্বোক্ত ১০০ লক্ষ টাকা অগ্রিমের মধ্যে প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা ফেরৎ পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ ভারত সরকারের সহায়তায় গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প (Rural Industries project) নামে একটি প্রকল্পের কাজ দুর্গাপুর ও তৎসন্নিহিত বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার প্রায় ৮০০ বর্গ মাইল এলাকায় সুরু হয়েছে। মূলধনের জোগান, কিশতিবন্দিশর্তে ক্রয় প্রথানুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও কাঁচামালের জোগান এই প্রকল্পের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

## শহর উন্নয়ন

প্রাথমিক পর্য্যায়ে দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রিস বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল শিল্পসংস্থা সমূহের জন্য জমির উন্নয়ন। দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যান্ট, এম. এ. এম সি (MAMC) এ. ভি. বি. (AVB) প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পসংস্থা সমূহকে নিজ নিজ শিল্প শহর গড়ে তুলতে দেওয়া হয়। এই সব সংস্থা নিজ নিজ এলাকায় আপন আপন কর্মচারীদের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে। ফলে, দুর্গাপুরে পরস্পর সংলগ্ন অথচ একক পরিচালনাধীন নয়—এমন ছয়টি শিল্প শহর গড়ে উঠেছে। এরা হল:—(১) দুর্গাপুর ষ্টীল টাউনশিপ (বর্তমান জনসংখ্যা ১ লক্ষ), এম. এ. এম সি টাউনশিপ (জনসংখ্যা কুড়ি হাজার), এ. ভি. বি. টাউনশিপ (জনসংখ্যা দশ হাজার) ডি. ভি. সি. থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন টাউনশিপ (জনসংখ্যা পাঁচ হাজার), দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড ও দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড টাউনশিপ (২০ হাজার)। যেহেতু এখানে পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি শিল্পসংস্থার নিজ নিজ শিল্প, এ সব স্থানে বসবাসের সুযোগ সুবিধাও ঐ সব শিল্পসংস্থার নিজ নিজ কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এজন্য দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা ১৯৬১ সনের কাছাকাছি আর একটি ছোট শহর গড়ে তোলার দিকে নজর দেয়। এইখানে প্রধানত: মাঝারি শিল্পসংস্থা সমূহের কর্মচারীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমির ব্যবস্থা করা হয়।

## ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

দুর্গাপুরে মূলধন বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা বিদ্যমান। যে সব শিল্পে অবিলম্বেই বিনিয়োগ করা চলে সেগুলি হল:—বড় ও মাঝারি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, কয়লা ভিত্তিক রসায়ন ও মৌলধাতু শিল্প, স্কুটার কারখানা, অটোমোবাইল কারখানা, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে কৃষি ভিত্তিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প যেমন: ট্রাক্টর, পাম্প, ভারী ক্রেন ইত্যাদি শিল্প, মাটি কাটার যন্ত্রপাতি, রোড রোলার, রেলের যন্ত্রপাতি, ঢালাই লোহার পাইপ, রেডিও ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, ধাতু নির্মিত আধার, মেশিন টুলস, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্ষুদ্রাংশ বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, মাঝারি ও ছোট ঢালাই কারখানা প্রভৃতি নানা শিল্পসংস্থা দুর্গাপুরে গড়ে উঠতে পারে। একটি বা দুটি ব্লাষ্ট ফারনেস ও ছোটখাট কারখানাও গড়ে উঠার সুযোগ আছে। কয়লা ভিত্তিক রসায়ণ কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এরূপ প্রকল্প অনুযায়ী জ্বালানি গ্যাস, এ্যামোনিয়াম, কয়লাজাত আলকাতরা, এ্যামোনিয়াম সালফেট, বেঞ্জিন, টলুয়েন, ন্যাপথালিন, এনথ্রাসিন, ফেনল ও ক্রিসোল প্রভৃতি নানা ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হতে পারে। মৌল উপজাত দ্রব্য সমূহ (bye products) থেকে রং, সুগন্ধ, কার্বলিক এসিড, ঔষধ ও ঔষধ তৈরীর উপাদান, প্লাষ্টিক, বীজানু নাশক দ্রব্যাদি, জ্বালানির উপাদান, নাইলন, সিন্থেটিক রবার প্রভৃতি বহু দ্রব্য উৎপাদন করা যেতে পারে। স্পেয়ার পার্টস, বেয়ারিংস মেকানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, পলিথিন নির্মিত দ্রব্যাদি, বিশেষ ধরণের কাঁচ ও কাঁচজাত দ্রব্যাদি, রিফ্রাক্টরি প্রভৃতি বহু দ্রব্যও উৎপাদন করা সম্ভব। সম্প্রতি যোজনা প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, শুধু দুর্গাপুর অঞ্চলেই আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির (Ancillary products) চাহিদা বছরে প্রায় ১৬ কোটি টাকার মত হবে। বর্তমানে বিহারের ন্যায় দুর্গাপুরেও একটি (Ancillary Industries Development Committee) স্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের বিবেচনাধীন।

## কর্ম্মসংস্থান

যথাযথ ও যুক্তিসম্মতভাবে রাজ্যে শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও এর ফলশ্রুতি স্বরূপ ব্যাপকহারে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য নিয়েই দুর্গাপুরে এত বিরাট আর্থিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারির পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সবদিক দিয়ে দুর্গাপুরের যথাসম্ভব সম্প্রসারণ ও একে রাজ্যের প্রধান শিল্প নগরীতে উন্নীত করার আদর্শ রাজ্য সরকারের নীতিতে স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ করবে। খুব কম করে ধরেও আর প্রায় ১৫ বছর পর দুর্গাপুরের জনসংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশীতে গিয়ে দাঁড়াবে। এ সংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

# পূর্ব-মগরাহাট জল নিকাশী প্রকল্প

## দক্ষিণ গাঙ্গেয় এলাকা বন্যার কবলমুক্ত হচ্ছে—
## পতিত জমি উদ্ধার হচ্ছে—
## বহুলোকের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হচ্ছে

একবার করে বন্যা আসে, আর নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শস্যসম্ভার নিমেষে নষ্ট হয়ে যায়। ঘরবাড়ী যায় ডুবে; দেখা দেয় খাদ্যাভাব মহামারি।

বন্যা অধ্যুষিত এমন একটি অঞ্চল ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ ভাগ। আলিপুর সদর ও ডায়মণ্ডহারবার—এই মহকুমার দুটির মানুষের বন্যার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এ অঞ্চলে জলপ্লাবনের অন্যতম কারণ পিয়ালী নদী। দৈর্ঘে ১৬ মাইল পিয়ালী বারুইপুরের বোসা থেকে শুরু করে উভয় মহকুমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে পূর্ব মগরাহাটের কুলতোর গ্রামের কাছে মাতলা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

সম্প্রতি বেশ কয়েক বছরের বন্যায় এই নদী ও তার শাখাপ্রশাখার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ আজ নিঃস্বপ্রায়। ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালের নিদারুণ বন্যায় ৯০ বর্গমাইল এলাকা জলনিকাশের অভাবে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে স্বাভাবিক বন্যায় অন্যূন ৪০ বর্গমাইল এলাকা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ গাঙ্গেয় এলাকা এক ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে পড়ে। ফলে ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আংশিক ঋণ ও ত্রাণ খাতে অনাবর্তক ব্যয় মঞ্জুরী বাবদ ৫৬ কোটি টাকা দেন।

এ অর্থের প্রয়োজন ছিল ঠিকই। তেমনি ছিল বন্যা প্রতিরোধের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা। সমস্ত পরিস্থিতির

কল্যাণ দাশ

মূল্যায়ণ করে এ ক্ষেত্রে এক নতুন কর্মোদ্যোগ শুরু করা হল এবং পাঁচটি বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রচনা করা হল। এই বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে ১১ কোটি টাকাও বরাদ্দ করা হল। পাঁচটি পরিকল্পনা হল: (১) পূর্ব মগরাহাট জলনিকাশী প্রকল্প:—২৪ পরগণা, (২) বিজ-বল্লী—২৪ পরগণা; (৩) দুবদা অববাহিকা প্রকল্প—মেদিনীপুর, (৪) সুবর্ণরেখা বাঁধ পরিকল্পনা—মেদিনীপুর, (৫) নিম্ন দামোদর অঞ্চলের উন্নয়ন—হাওড়া ও হুগলী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ এই পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

### কেন এই প্রকল্প?

পূর্ব মগরাহাট জল নিকাশন ও নৌপথ পরিকল্পনা প্রাচীন বলা চলে। অন্ততঃ একশ বছর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু কালক্রমে পিয়ালী পলিবদ্ধ হয়ে যাবার ফলে প্রতি বছর বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবনের কবলে পড়ে এবং এই পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। এসব দিক বিচার করেই বর্তমানে প্রাচীন পরিকল্পনাটির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারী মাস থেকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নদী ও খালগুলিতে যে পলিমাটি দীর্ঘদিন ধরে জমেছে, তার খনন কাজ শুরু করা হয়। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত মাসে যতটুকু সংস্কার হয়েছে তাতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বাস্তুকার ও অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে দৈনিক প্রায় দুই হাজার লোক এই প্রকল্পে কাজ করছে। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির রূপায়ণে সরকার ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। প্রকল্পটি শেষ হতে সময় লাগবে চার বছর এবং এই সময়ে এখানে ২১ কোটি কিউবিক ফিট পরিমাণ

মগরাহাট অববাহিকা জল নিষ্কাশন
প্রকল্পের মানচিত্র
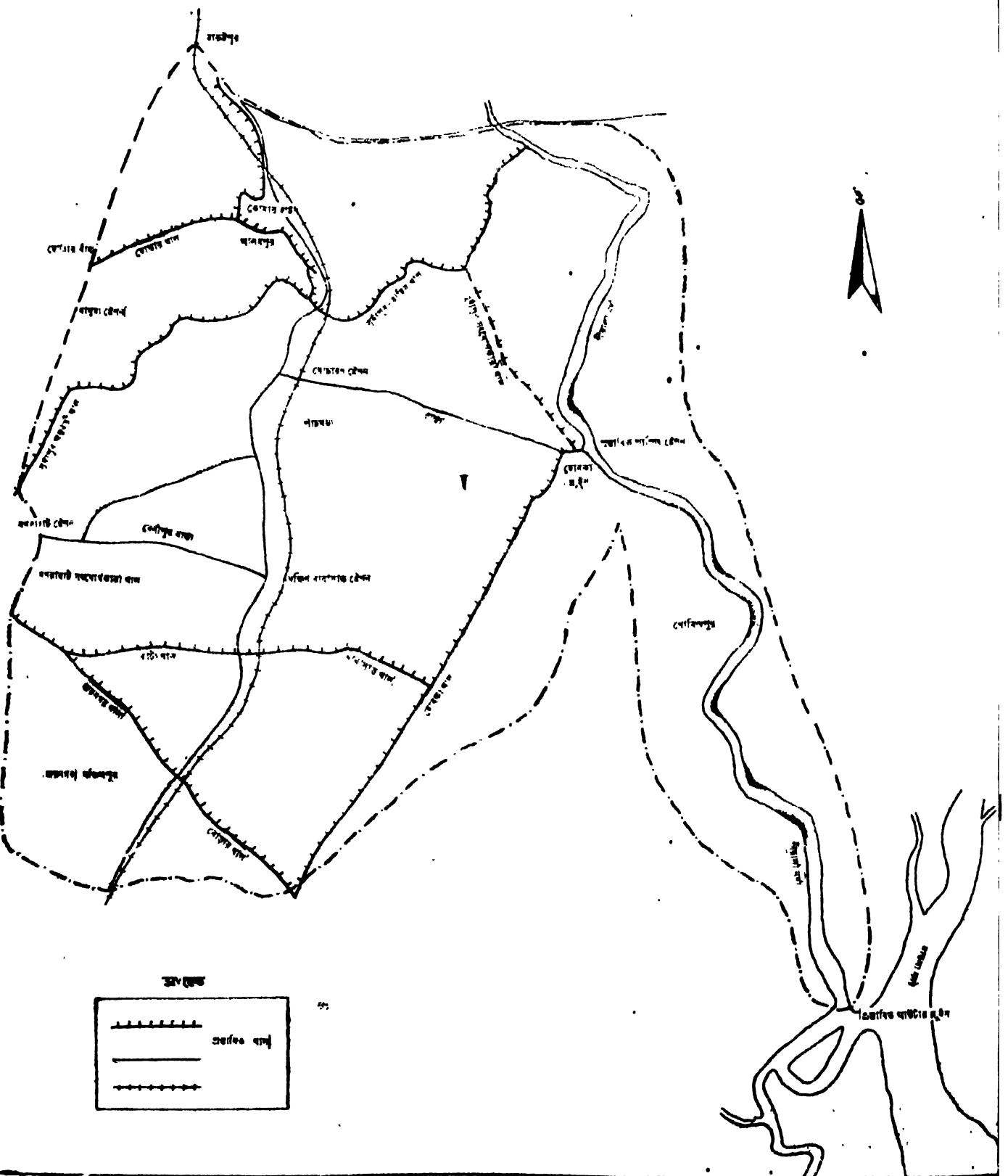
পলিমাটি কাটা হবে ও তার জন্য মাটি কাটা যন্ত্র ড্রেজারেরও সাহায্য নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানান।

## বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎরূপ

এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত সীমানার পূর্বে রয়েছে পিয়ালী নদী; পশ্চিমে—বারুইপুর—জয়নগর রেল লাইন; দক্ষিণের সীমারেখা পূর্বে বিষ্ণুপুর থেকে ত্রিলপী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তরে—বারুইপুর উত্তরভাগ রোড। এই সীমাবদ্ধ বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্তমান খালগুলি পূর্ব মগরাহাট অববাহিকার অধিকাংশ জল নিকাশ করে থাকে। উত্তর ভাগ ও হোবকা স্লুইস দুইটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন ১১৪ ইঞ্চি জলপ্রবাহ এই পিয়ালী নদীতে গিয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ বন্যা অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫৯) প্রতিদিন ৩১৪ ইঞ্চি জলপ্রবাহের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছিলেন। ঐ সুপারিশ গ্রহণ করায় একদিকে যেমন দ্রুত বসতি স্থাপন ও খালগুলির ক্রমাবনতি হতে শুরু করে, তেমন অন্য দিকে পিয়ালী নদী শুকিয়ে যাওয়ায় উত্তরভাগে স্লুইসটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে জলনিকাশের তীব্র সংকট দেখা দেয়। এই অববাহিকার জল পিয়ালী নদীর ভিতর দিয়ে মাতলা নদীতে পড়ে। জলগ্রহ ক্ষেত্র (ক্যাচমেন্ট এরিয়া) থেকেও জলপ্রবাহ দুটি প্রধান পথে প্রবাহিত হয়ে পিয়ালী নদীতে পড়ে। যেমন (১) কাটাখাল, হোবকা খাল ও বারাসাত খাল (২) সূর্যপুর অর্দ্ধখাল ও বহিখাল এবং সূর্যপুর সংযোগকারী খাল। অনেক শাখা খাল, যেমন হোতোর খালটি সূর্যপুরের অর্দ্ধখালে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু হোবকা খাল দিয়ে অভিকর্ষ মাধ্যমে বর্তমান হোবকা স্লুইসের ভিতর দিয়ে জল নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না। তাই হোবকা খাল থেকে সূর্যপুর সংযোগকারী খাল পর্যন্ত একটি প্রধান খাল খনন করার প্রস্তাব এই পরিকল্পনার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া জলনিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সূর্যপুর সংযোগকারী খালের সঙ্গমস্থলে একটি স্লুইস নির্মাণের প্রস্তাবও রয়েছে।

প্রতিদিন যাতে ৩১৪ ইঞ্চি হারে জল-

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্ব-মগরাহাট জল নিকাশী প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। চিত্রে একটি খালের সংস্কার কার্যের দ্রুত রূপায়ন দেখানো হচ্ছে।

# যৌথ উদ্যোগ ও যুক্তিগ্রাহ্ নীতির প্রয়োজনীয়তা

ডঃ ভরতরাম

মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে আমরা আমাদের দেশের উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। মিশ্র অর্থনীতি শুধুমাত্র সরকারী বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থান নয়, পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরকও বটে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কারণ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। এই অংশ গ্রহণ শুধুমাত্র মৌলিক উপাদান সমূহ অর্থাৎ বিদ্যুৎ, সেচ, ডাক ও তার, পরিবহন প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। জাতীয় স্বার্থে বিনিয়োগ যেখানে অত্যন্ত প্রয়োজন বলে গণ্য করা হোল, সেই সব শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও সরকার এগিয়ে এলেন।

## শিল্পের ভিত্তি

১৯৪৮ সালে যখন শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশিত হোল এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হোল, তার আগেই ভারতে শিল্পের একটা কাঠামো গড়ে উঠেছিল। ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নে এগিয়ে আসার মত শিল্পোদ্যোক্তাদেরও অভাব ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী শুরু হবার সময়, ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্তভাবে সরকার, বেসরকারী শিল্পোদ্যোক্তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে মনস্থ করলেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হবার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় শিল্পগুলি যথেষ্ট সম্প্রসারিত এবং বহুমুখী হয়েছে। মৌলিক ও ভারী শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্প কাঠামোকে ঢেলে সাজানো হলো। শুধু গত এক দশকের মোট শিল্পোৎপাদনের মধ্যে বুনিয়াদী শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশেরও বেশী হয়েছে এবং মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে ৬.৪ শতাংশ থেকে ১১.৩ শতাংশ। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বুনিয়াদী এবং মূলধনী শিল্পের সম্প্রসারণ হয়েছে যথাক্রমে ২২৮% এবং ৩১৪%। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হোল অনেক বুনিয়াদী পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে চলেছি। যেমন '৬০-৬১ সালে তৈরী ইস্পাতের ক্ষেত্রে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৫ শতাংশ। ১৯৬৯-৭০ সালে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭.৭ শতাংশে। এ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আমদানী ৬৮ শতাংশ থেকে কমে ১.৮ শতাংশে এবং মেসিন টুলসের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ থেকে কমে ৪২ শতাংশে দাঁড়ায়। আরো যেটা উল্লেখযোগ্য বিষয় তা হোল শিল্পদ্রব্য নির্মাণে আধুনিকতা অর্জন এবং মূলধনী ও বুনিয়াদী পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

## পরিপুরকতা

গতিশীল বেসরকারী উদ্যোগে এবং সম্প্রসারণশীল সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি অবস্থানের ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের দেশে যৌথ উন্নয়নী পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এসেছে। এমন কি শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগে একটা সংস্থাগত কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্বও স্বীকৃত হয়েছে। শিল্পে অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগের মূলধনী কাঠামো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই সব কোম্পানীর আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ এবং ইকুইটি বাবদ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার আগে এবং ঠিক পরে তদানীন্তন করদ-রাজ্যগুলি শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সব রাজ্য উপলব্ধি করে যে তাদের উন্নতির অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তা করার সম্ভবপর উপায় হোল, যাঁদের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, বিশেষ জ্ঞান এবং বিদেশের দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, সেই সব উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা। এমন কি ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পরেও অনেক রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনে সচেষ্ট হন এবং সে বিষয়ে রূপরেখা প্রণয়নের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার এমন কি ১৯৬০ সালে একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত মূল্যবান।

## ধ্যানধারণার পরিবর্তন

এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তা হলো যৌথ উদ্যোগ সম্পর্কে রাজনৈতিক এবং সরকারী মহলে ব্যাপকভাবে যা আলোচিত এবং গৃহীত হচ্ছে, তাতে নতুন কিছু আছে কিনা। আমার ধারণা,

দত্ত- কমিশন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত হোল, আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত সরকারী অর্থ যেসব বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে নিয়োজিত হচ্ছে এবং যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, সেখানে পরিচালন বিষয়ে সরকারের অধিকার থাকবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আর্থিক সংস্থাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে সমগ্র ধ্যান ধারণাই পাল্টে গেল। সাধারণ নিয়মানুসারে, এই সব ঋণদান সংস্থার উদ্দেশ্য হোল, আংশিক মালিকানার পরিবর্তে শুধু ঋণ দেওয়া। সাহায্য প্রাপ্ত কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থায় এই সব আর্থিক সংস্থাগুলির অংশ গ্রহণের সুপারিশ—আপাত দৃষ্টিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অর্থাৎ শিল্প সংস্থাগুলিকে দেওয়া ঋণকে ইকুইটিতে ( শেয়ারে ) পরিবর্তিত করার সংস্থান রাখা হয়েছে।

তাছাড়া একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে যৌথ উদ্যোগ সহায়ক হবে—এই ধারণার ফলে ১৯৭০ সালে সরকার যৌথ পরিচালন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলেন। রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হোল, লাইসেন্স দান কালে দেখতে হবে যেন ব্যবসায়ীদের হাতে থাকে ইকুইটি শেয়ারের ২৫ ভাগ, রাজ্য সরকারের হাতে শতকরা ২৬ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৪৯ ভাগ যেন থাকে সরকারী ( আর্থিক ) সংস্থাগুলোর।

## সমাধানের মধ্য পন্থা

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, কয়েকটি ছাড়া সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প সমূহের ফলাফল আশানুরূপ হচ্ছে না এবং এর ফলে একটা সার্বিক হতাশা দেখা দেওয়ায়, যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা, এই সমস্যা সমাধানের মোটামুটি একটা মধ্য পন্থা বলে বিবেচনা করা হোল যেখানে বেসরকারী উদ্যোগ এবং পেশাদার পরিচালন দক্ষতার সঙ্গে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে যুক্ত করা হোল। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা ভালো, তবে প্রভাবের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের কুফল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

যৌথ উদ্যোগের প্রচুর সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে উন্নয়ন সমস্যার সার্বজনীন সমাধান বলা যেতে পারে না। কতকগুলি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকর হলেও সর্বক্ষেত্রে নয়। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে না, তা নির্ণয় করতে হবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিচালিত কোন কোম্পানীকে যদি যৌথ উদ্যোগের আওতায় আনা হয়, তাহলে শেয়ার হোল্ডারদের বৈধ স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শেয়ারের ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অংশ গ্রহণের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, সংস্থাগুলিকে সরকারী বিধিনিয়ম এবং লালফিতার বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে

## পরিচালনগত দিক

যৌথ ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার অনেকগুলি দিক এখনও নির্ণীত হয়নি। পরিচালন জ্ঞানকে পেশা বা বৃত্তিতে পরিণত করা, যৌথ উদ্যোগের বাঞ্ছিত লক্ষ্য হলেও পেশাদার পরিচালন দক্ষতার মূল মাপকাঠি কি হবে? যে সব বেসরকারী শিল্পোৎদ্যোক্তাদের অনুরূপ সংস্থা পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদেরকেই কি পেশাগত দিক থেকে যোগ্য মনে করা হবে না? এই দুয়ের মিশ্রণ কেই? জয়েন্ট সেক্টর কোম্পানীর বোর্ডে থাকবে বেসরকারী সংস্থা, আর্থিক সংস্থা এবং সরকারের প্রতিনিধি। এখন প্রশ্ন হোল, এই প্রতিনিধিদের অনুপাত কি হবে। প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও ক্ষমতাই বা কতটুকু থাকবে এবং পরিচালন ক্ষেত্রে সরকারের সীমাহীন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রক্ষা কবচেরই বা কি ব্যবস্থা করা হবে।

যৌথ সংস্থা গঠন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাবে বলা দরকার যে, ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত নীতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সহ সংস্থাগুলি কি নীতিতে পরিচালিত হবে। বর্তমানে সরকার মনোনীত করেন Chairman—কে এবং বেসরকারী অংশীদারগণ করেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। যদিও ভারসাম্য রক্ষা করা এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলেও, প্রশ্ন হোল কর্ম পরিচালকদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে কিভাবে তা মীমাংসা করা হবে? চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকা কি একান্তই প্রয়োজন? না তার পরিবর্তে দুজনের কাজ একজনের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

## আন্তঃ কোম্পানী বিনিয়োগ

শিল্প স্থাপনের জন্য সম্প্রতি বহু সংখ্যক সম্মতিসূচক পত্র এবং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলোই হবে যৌথ ক্ষেত্রে। প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্বশর্ত হবে নতুন শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে যাদের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা আছে, তাদেরকেই যৌথ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া উচিত। কোম্পানী এবং শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের বিনিময়ে

চতুর্থ কভারে দেখুন

# পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প প্রসঙ্গে

চন্দ্রগুপ্ত

ইতিহাসের নিষ্ঠুর শাসনে খণ্ডিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন অর্থনীতির ভিত্তি ভূমি শক্ত সবল ছিলো লোক শিল্পের পরম কারণে। একদা যে বাঙ্গালীর গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান ও পুকুর ভরা মাছ তাকে স্বর্গসুখ দান করেছিলো তার পিছনে এই লোক শিল্পগুলির অবদান নেহাৎ কম ছিল না। তবে বিভিন্ন লোক শিল্পগুলির উদ্ভব ঠিক কবে ঘটে তা বলা শক্ত। কোন বিশেষ প্রয়োজনে অথবা খেয়ালী মানুষের খেয়ালের বশেই হয়ত একদিন কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, ইলাম বাজারের গালার কাজ, মুর্শীদাবাদের তাঁতের কাপড়, বাঁকুড়া মেদিনীপুরের মৃৎশিল্প, ঢোকরা শিল্প, সবং-এর মাদুর, কালিঘাট ও মেদিনীপুরের পট শিল্প, বেতুয়া দাবাবপুরের কাষ্ঠ ও টেরাকোটার কাজ, নাড়াজোল, পাঁচমুড়া, কাঁটালিয়া তারকেশ্বরের মাটির খেলনা, মেদিনীপুরের ঘড়ার কারু শিল্প ও জোৎবনশ্যামের সিং-এর কাজ, সূত্রধর কর্মকার, কুম্ভকারদের শিল্প উদ্ভাবিত হয়েছিল। শিল্পির সাধনার ফসল চিরকালই একরকম নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়—একথা আংশিক সত্য। অর্থ দিয়ে তো আর শিল্পের মূল্যায়ন হয় না। তবুও তা থেকে বাঙ্গালী লোক শিল্প যা পেত তাতে তা'র ভাত কাপড়ের কষ্ট হোত না। সর্বোপরি মানুষের অভাব সীমিত থাকায় শিল্প সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য শিল্পীকে ভাবতে হোত না। পশ্চিমবঙ্গের লোক শিল্প মূলতঃ সোনা রূপা, তামা, পিতল, লোহা, কাঁসা ইত্যাদি ধাতু, মাটি কাষ্ঠ কাপড়, রেশম ইত্যাদি বস্তুকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। লোক শিল্পগুলি কালে কালে সমৃদ্ধি লাভ করার পিছনে স্থানীয় ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষনাও একটা কারণ।

লোক শিল্পের গোড়ার কথা হল প্রথমতঃ প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ ধন, তৃতীয়তঃ আত্মতুষ্টি ও রসিকজনের মনোরঞ্জন। প্রয়োজন, মেটাতে মানুষ সৃষ্টি করে—এর উৎকর্ষ সাধিত হয় শিল্পী মনের কৌশলের দ্বারা. প্রতিটি শিল্প সৃষ্টির পিছনে থাকে একটি সৌন্দর্য্যবোধ এবং আবশ্যকতা।

**কালের প্রয়োজনেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পের উদ্ভব ঘটেছে। বাংলার সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার লোকশিল্প**

কাপড়ের পুতুল

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, মুড়োগাছা, রাণাঘাট বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, সড়ার [illegible], আঙ্গুড়িয়া, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বীরভূম জেলার [illegible],

**ইণ্ডাষ্টিয়াল সিভিলাইজেশনের যুগ সুরু হওয়ার পর লোকশিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থাতেও ভাঙ্গন ধরে। চর্চা ও কদরের অভাবে শিল্পের উৎকর্ষও দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।**

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ধাতুর সাহায্যে মধ্যযুগ থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ধাতু শিল্প গড়ে উঠে মুর্শীদাবাদ জেলার খাগড়া, বহরমপুর, ২৪ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাসা-পিতলের কাজ হুগলী জেলার কামারপুকুর, নদীয়ার নবদ্বীপ, পুরুলিয়া জেলার ঝালদা

কলকাতার সিমলা পাড়া প্রভৃতি স্থানে লৌহ শিল্প গড়ে উঠলেও সারা বাংলার নানা স্থানেই প্রয়োজন মাফিক নানা লোক শিল্প গড়ে উঠে। লাঙলের ফাল, কাস্তে, নিড়ানী, হাতা, খুন্তি, বঁটিদা, কড়াই, কাঁচি, ছুরি, শাবল, বল্লম, কুড়ুল, কোদাল, পিতল, তামা বা এলুমিনিয়ামের রেকাব, কোষাকুষি, ঘট, ফুলের সাজি, বাটি, থালা, ঘটি, মগ প্রভৃতি জিনিষ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তুত হয়। এছাড়া সোনা রূপা বা ব্রোঞ্জের তৈরী অলঙ্কার সামগ্রী প্রস্তুতকারক শিল্পীরা দেশের নানা স্থানেই ছড়িয়ে আছেন। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ শিল্পীরা ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অনেকেই কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে ভীড় করেছেন।

বাংলার লোক শিল্পের অপর একটি দিক হল মাটির পুতুল, খেলনা, মুখোশ ইত্যাদি বিবাহ ও নানান পারিবারিক মঙ্গলানুষ্ঠান, পীরের থানে মানত শোধ বারব্রত বা পূজোর জন্য ও পুরুলিয়ার বিখ্যাত 'ছৌ' নাচের জন্য নানা সময়ে নানা রকমের পুতুল বা মুখোশের প্রয়োজন। পুতুল তৈরীর উৎপাদন হল ছাতিম, শিমুল, আমড়া, গামার, হলুদ প্রভৃতি কাঠ, কাপড়, সোনা, কাগজের মণ্ড, পাথর, পিটুলী, সর, মাখন মাটি ইত্যাদি। গোবর বা কলাগাছের খোল দিয়েও পুতুল তৈরী হয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল, বাসুদেবপুর ঠেকুয়াচক, কুমারীপারা, আকুবপুর, বেতুয়া দাসপুর, ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর, মাধালপুর, বড়িষা, বারাসত, মুর্শিদাবাদ জেলার কোয়ালিয়া, জেলার পাঁচমুড়া, রাজগ্রাম, বীরভুম জেলার রাজনগর, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, প্রভৃতি স্থানের মাটির পুতুল তৈরীর জন্য খ্যাতি আছে, তবে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত। এছাড়া মুর্শীদাবাদের খাগড়া ও জিয়াগঞ্জের হাতির দাঁতের কাজ এবং জোৎঘনশ্যামের শিঙের শিল্প দ্রব্য, পুরুলিয়া ছৌনাচের জন্য বাগমুণ্ডি অঞ্চলের চোরিদা ও ডুমুরদি গ্রামের শিল্প কাজ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দার্জিলিং জেলার কাঠের মুখোস তৈরীর পদ্ধতি ভ্রমণকারীদের একটি অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার রাজগ্রাম সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান জেলার কানঝরিয়া, হীরাপুর ও শ্যামড়ি পুরুলিয়া জেলার কালিদহ, পুরুলিয়া, সেনেড়া, লালগড়, কুঁয়াপুর, পবতপুর, করগালি, ভাঙাবাঁধ, গদীবেড়া প্রভৃতি গ্রামের লোক শিল্পগুলিও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

উপরোক্ত শিল্পগুলি ছাড়াও আলপনা অঙ্কনের মত বঙ্গ ললনাদের তৈরী নক্সা কাঁথা পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, মুর্শীদাবাদ, বীরভুম বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় বেশ কদর পেত। বিয়ের, পিঁড়ি আলপনা, সূত্রধরদের চালচিত্র, লক্ষ্মীর সরা, চিত্রিত পুঁথির পাটা ও কুলো, মাটির ঘর উলুটি করার সময় নানা কারুকার্য্য আসবাব চিত্রণ বা পঙ্ক্তিগুলিতে রঙের বৈচিত্র্য—এবার থেকেও লোক শিল্পে নিখুঁত গতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও ইতুর সরা, হাড়ি, পট, পর্ব উপলক্ষে উঠোনে চাল পিটুলির আলপনা, গোলাঘরে আলপনা, গিরিমাটির ছোপ ইত্যাদি দিয়ে বাঙালী শিল্পী মন সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছিল।

লোক শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে বলা যাবে এর কারুকার্য্য গঠনরীতি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দেখে একে অতুলনীয় বা অপরূপ বলে গুণীজন বিশেষণে অনেক বিশেষিত করেছেন। এ লোক শিল্প কতদিনের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কষ্টকর। তবে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যেও লোক শিল্পের নিদর্শন মিলে। এছাড়া গ্রীসের মাটির খেলনা padlle doll বা চীনের লোক শিল্প প্রভৃতির বয়সও নেহাৎ কম নয়। বাংলাদেশে লোক শিল্পিদের কর্মরীতি দেখে একথা মনে হয়, বংশ পরম্পরায় শিল্প ক্রমশঃ যান্ত্রিক অভ্যাস ও অশিক্ষিত পটত্বে পরিণত হয়। একথা কেবলমাত্র ধাতু, কাষ্ঠ, মৃৎ, প্রস্তর প্রভৃতি ঘিরে গড়ে ওঠা লোক শিল্পগুলির ক্ষেত্রে খাটে। গৃহের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলির মধ্যে আদি বাঙালী রমণীর যে শিল্পগত নৈপুন্য প্রকাশিত হয় সে ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না। যাকে traditio-

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

# স্বাধীন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা

**স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীর পাদপ্রদী**—পের আলোয় দাঁড়িয়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা মোটেই অযৌক্তিক হবেনা। কেউ কেউ হয়তো কৃতিত্বকেই বড়ো করে দেখবেন। আবার অপরেরা বিফলতার দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করবেন। সম্ভবতঃ একটি বিষয়ে সকলেই জানতে চাইবেন যে স্বাধীনতার পর দেশে শ্রমশক্তির কিরূপ উন্নতি ঘটেছে? কেউ যদি লাভ লোকসানের ভারসাম্য টানতে চান তবে কাজটা হয়তো তেমন কঠিন নাও হতে পারে। কিন্তু মূল বিষয় তা নয়। শ্রমিকেরা কতটা সরকারী আনুকূল্য পেয়েছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান কতটুকু?

চিরাচরিত নিয়মেই স্বাধীনতার পর থেকে শ্রমিক কল্যাণে সরকারী মনোযোগ বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন থেকে আলাদা করে কখনও দেখেনি। প্রকৃত পক্ষে, ১৯৩১ সালে পার্টির করাচী প্রস্তাবেই শ্রমিক কল্যাণের একটি ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে এই ব্লু প্রিন্টের বাস্তবায়নের সাধু সংকল্প অনেকবারই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই একই দল যখন দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে তখন শ্রমিক কল্যাণে সরকারী মনোযোগের অভাব হবেনা বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। শ্রমিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধেও বর্ণিত হয়েছে। একথা বোধ হয় বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, স্বাধীনতার পূর্বে শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার নীতি বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণের ব্যাপারে সরকার বর্তমানে বাস্তবতা, সত্য ও কর্তব্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এই কারণে স্বাধীনতার পরে সরকারকে শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার সমর্থক হিসেবেই দেখা গিয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার ধারাবাহিক বিবরণ রচনা করলে নিশ্চয়ই উৎসাহ ব্যঞ্জক হবে সেটা। যে সমস্ত শিল্প উৎপাদন সংস্থায় শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ নয় সেখানে সরকার ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত সংগঠিত শিল্প সংস্থায় সরকার

## আর. কে. খাদিলকার
(কেন্দ্রীয় শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রী)

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের নীতি নির্দ্ধারণ ও শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুনাল ও মজুরী পর্ষদ গঠিত হয়েছে। দেশের বৃহৎ ২০টি শিল্প সংস্থার পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশী শ্রমিক উপরিউক্ত দুটি পর্ষদের সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হয়েছেন। বোনাস আইন প্রবর্তনের ফলে লাভের একটা অংশ বোনাস হিসেবে শ্রমিকেরা পাচ্ছেন। ১৯৪৮ সালে আইন পাশ হয়ে যাবার ফলে অসুস্থতা এবং কর্মরত অবস্থায় বা দুর্ঘটনায় আহত অথবা মৃত্যু হলে শ্রমিকেরা এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। বর্তমানে প্রায় ৪২ লক্ষ শ্রমিক উপরিউক্ত আইনের ফলে আর্থিক ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রবর্তন শ্রমিকদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। এর আওতায় কয়লা শিল্পের ৪ লক্ষ এবং অন্যান্য শিল্পের ৬০ লক্ষ শ্রমিক আছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে দেয় চাঁদার পরিমাণ শতকরা ১।৪ হতে বাড়িয়ে ৮.৩৩ শতাংশে পরিণত করা হয়েছে। অধুনা সরকার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চাঁদা দাতাদের জন্য পারিবারিক পেনশন ও জীবনবীমা প্রকল্পের সুব্যবস্থা করেছেন। অবসর নেবার পূর্বেই কোন সদস্য মারা গেলে মৃতের পরিবার বর্গ এই স্কীম অনুযায়ী পেনসন পেয়ে থাকেন।

খনি, কারখানা, ডক ইত্যাদিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপযুক্ত আইন প্রচলিত আছে। বাসস্থান, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল-এর ব্যবস্থা, শিক্ষা ও আমোদ প্রমোদের জন্য বিভিন্ন কলকারখানায় বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্প সংস্থায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৪৭ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সদ্ভাব বজায় থাকে সেজন্য ১৯৫৮ সালে অনেকগুলো [illegible] বিধি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সরকারী শিল্প সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিয়োগের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্যে শ্রমভিত্তিক শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। গ্রামাঞ্চল থেকে যাতে কর্মপ্রার্থীদের চাপ শহরে এসে না বাড়ে তার নিশ্চয়তা বিধানের

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

# আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

# ভেবে দেখুন

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, দামী বিদেশি পুরুষদের ব্যবহারের মিহি রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধ'রে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়।

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

# নিরোধ

লাখ লাখ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবারের জন্মনিরোধক
মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

daVP 71/460

# পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কর্মবিনিয়োগ পরিকল্পনা

**পশ্চিমবঙ্গে** ১৯৭২-৭৩ সালে বিশেষ কর্মবিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হবে। এই রাজ্যে আগামী বছরের জন্য যোজনা কমিশন যে নয়টি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, এটি তার মধ্যে অন্যতম। এই কর্মসূচীগুলির রূপায়ণের জন্য যে ২.১৮ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে তার পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন।

রাজ্যের পলিটেকনিকগুলিতে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হবে, এবং এগুলিতে আই. টি. আই. সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষিত তরুণ বেকারদের জন্য বনপালন বিদ্যায় প্রশিক্ষণ, অর্ধ শিক্ষিতদের জন্য প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ এবং পুষ্পবিদ্যায় প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন; ভেষজ গাছগাছালি চিহ্নিতকরণ ও সংগ্রহ; পশুপালন বিদ্যায় এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ।

রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত আর যে সব কর্মসূচী যোজনা কমিশন মঞ্জুর করেছেন সেগুলি হচ্ছে: কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের প্রসার, নতুন পুষ্টি কেন্দ্র খোলা, অসামরিক প্রতিরক্ষা ও জরুরী ত্রাণ ব্যবস্থা, বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে পূর্ত সংক্রান্ত কাজ এবং পূর্ত বিভাগের উদ্যোগে পাথর ভাঙ্গার কাজ।

অন্য একটি কর্মসূচী অনুযায়ী কয়েকটি পাঠকেন্দ্র বা "টিউটোরিয়াল সেন্টার" খোলা হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অনুমোদিত বর্তমান সংখ্যার চেয়েও আরও বেশী শিক্ষক এগুলিতে নিযুক্ত হবেন। অন্য একটি পরিকল্পনাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি পাঠশালা খোলার প্রস্তাব। যে সব শিক্ষক এই পাঠশালাগুলিতে নিযুক্ত হবেন তাঁদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হবে।

# পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প

nal বলে শুদ্ধের বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন তা কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনা প্রচেষ্টা ও উৎকর্ষের অভাব ক্রমশঃ নিম্নমানের হয়ে পড়ে। এর কলাকৌশল বা শিল্পগত বিষয়বস্তু কোনটাই হতে পারে না। বাঁকুড়া মেদিনীপুর কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প পটুয়া চিত্রকরদের পট শিল্পে সূত্রধরদের কাঠ খোদাই এর কাজ, ডোকরা শিল্প সব কিছুই নিষ্ঠাহীন আন্তরিকতার অভাবে ক্রমশঃ নিম্নমানের হয়ে পড়েছে। ফলে পূর্বের মতো জৌলুষ হয়ত এখনকার অনেক লোক শিল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১২ পৃষ্ঠার পর

এরও যথেষ্ট কারণ আছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মৃত্যু ও বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রিক শহর জীবনের উদ্ভব হয়ে পড়ায় পিতল কাঁসার পরিবর্তে এ্যালুমিনিয়াম, ধাতু বা মাটির পুতুলের পরিবর্তে অন্য কিছুর বা প্লাস্টিক ব্যবহার হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি একটা অস্বাভাবিক শ্রদ্ধা দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করেছে। লোক-শিল্পের অবনতির অপর একটি কারণ —যুগ সম্পর্কে কবির সচেতনহীনতা। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলে সমাজ চিত্র যুগে যুগে বদল হয়ে চলেছে বলেই এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাছাড়া লোক শিল্পিদের একটা ধারানুক্রমিক শিক্ষাও প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের লোক শিল্প নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে, ডিগ্রি পেয়ে কেউ উচু দরের চাকরীও পাচ্ছেন। বিদেশীরা অনেক শিল্প দ্রব্য কিনছেন, প্রশংসা করছেন, ভারতেও বই বের হচ্ছে এবং আলোচনা কম নয়। এ নিয়ে বই লিখে অনেকে টাকা লুঠে গাড়ী বাড়ী করেছেন, কিন্তু শিল্পিদের দিকটাই অবহেলিত। বিভিন্ন শিল্পে নামমাত্র প্রতিযোগিতা। সরকারী পুরস্কার দান প্রভৃতি হলেও এর দ্বারা শতকরা ২ জন শিল্পী উপকৃত হচ্ছেন কিনা কে জানে। শিল্প দ্রব্য বিক্রয় করা হচ্ছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বহির্বিশ্বে কিছু কিছু নিদর্শন শুরু করেছে এটাই একমাত্র আশার কথা।

তাছাড়া সমস্যাগ্রস্ত বাঙ্গালী নিজের জীবনধারণের জন্য যেখানে সর্বদা তৎপর, কি করে টিকে থাকা যাবে এটাই যেখানে সমস্যা সেক্ষেত্রে লোক শিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের একান্ত অনীহা যে আসবে তা আর বিচিত্র কি। সুতরাং এ বৃহৎ সমস্যা সমাধানের জন্য এ দিক সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় [illegible] ভাঙ্গা ভাব দেখা যাচ্ছে, [illegible] হয় আগামী অনেক বছরের মধ্যেই হয়তো বাংলার লোক শিল্পের এক একটি ধারা ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যাবে। [illegible] না জাগরিত হয়

## দুর্গাপুরের শিল্পনৈতিক গুরুত্ব

৪ পৃষ্ঠার পর

এর অর্থ এই সময়ের মধ্যেই কমপক্ষে আরও প্রায় ৬০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে। এই কর্মসংস্থানের বেশীর ভাগ যদিও উৎপাদনমূলক শিল্পসংস্থা সমূহ থেকেই আসবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে হতেও উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে সন্দেহ নেই। ক্রমবর্দ্ধমান শহরীকরণের চাপে কর্মসংস্থানের চাহিদাও দিন দিনই বেড়ে চলবে। পূর্বোক্ত ৬০ হাজার কর্মসংস্থানের জন্য অন্তত ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের দরকার।

বর্তমানে দুর্গাপুর যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে এই ১৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ দুর্গাপুরে স্বাচ্ছন্দেও সার্থকভাবে কাজে লাগানো চলে। বর্তমানে দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির হাতে প্রায় ১০০০ একর জমি আছে, যা প্রয়োজন-বোধে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। যাদের হাতে শিল্পসংস্থা সমূহের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ভার সেই দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডের হাতেও এই দুটি জিনিষেরই উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা আছে। কিছুকাল আগেও মূলধনের যোগান, লাইসেন্স ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব ছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদার শিল্পনীতির ফলে এই সব অসুবিধা দূর হয়েছে। বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা ও সামগ্রিক পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পপতিরা এগিয়ে এলে দুর্গাপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজ যে অনেকটা ত্বরান্বিত হবে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

## পূর্ব-মগরহাট জল নিকাশী প্রকল্প

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রবাহ নিষ্কাশন করা যায় তার জন্য এ অঞ্চলের খালগুলির পুনর্সংস্কার সাধন ও নতুন শাখা প্রশাখা খাল খননের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পিয়ালী নদীর সংস্কার এবং মাতলা নদীর সঙ্গে পিয়ালী নদীর সঙ্গমস্থলে কুলতোর গ্রামে একটি বড় স্লুইস তৈরী করা হচ্ছে, যাতে জোয়ারের সময় পলিমাটি ঢুকে পিয়ালী নদীকে পুনরায় নষ্ট না করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত ছোট ছোট নীচু এলাকা থেকে অতিরিক্ত মাধ্যমে সংলগ্ন খালগুলিতে জলপ্রবাহ হবে না সেগুলি থেকে জল পাম্প করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাকল্পে বর্তমান সেতুগুলি প্রশস্ততর ও উন্নয়ন করা এবং সংস্কার করা খালগুলির ওপর নতুন কতকগুলি সেতু নির্মাণও এ পরিকল্পনার অন্তর্গত।

সমগ্র পরিকল্পনাটি রূপায়নের ফলে এই পূর্বমগরাহাট অববাহিকায় ১৬১ বর্গ-মাইল এলাকা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। গোটা অঞ্চলটাই কৃষি প্রধান। দীর্ঘ দিনের এই পতিত জমি আবাদযোগ্য হলে এখান থেকে বছরে ২৫ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য, বিশেষতঃ ধান উৎপন্ন হবে যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এই কৃষিজপণ্য বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলের জনগণের আর্থিক ক্ষেত্রে যে প্রভূত পরোক্ষ উন্নয়ন ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষিকার্যের উপকারিতা ছাড়াও পিয়ালী নদীতে নৌ-চলাচলের সুযোগ ঘটবে এবং সঠিক জলনিকাশন স্থানীয় জনস্বাস্থ্য খন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

## স্বাধীন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা

১৩ পৃষ্ঠার পর

জন্য গ্রামাঞ্চলে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত শ্রমিকল্যাণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি যথেষ্ট নয়। ইহা অস্বীকার করার উপায় নেই, তথাপিও আমার মনে হয় শ্রমিকদের জন্য কি কি করা হয়েছে বা শ্রমিকেরা গত ২৫ বছরে ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছে কিনা এই প্রশ্ন না তুলে তারা আজ দেশের সামগ্রীক উন্নয়নের সঙ্গে একাত্মবোধ করছেন কিনা তাহাই মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত। আমি মনে করি, ন্যায্য পাওনা থেকেও তাঁদের দেশের উন্নয়ন মূলক কাজের সুযোগ্য অংশীদার হওয়ার প্রশ্নই বড়। যদি এটা সম্ভব না হয়ে থাকে তবে এ জন্য আমি শ্রমিকদেরই দোষারূপ করবো। কারণ তাঁরা তাঁদের বিরাট সাংগঠনিক শক্তিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দুর্ভাগ্যের কথা, এই যে শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে অস্বাস্থ্য কর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই তাঁরা তাঁদের যথাযথ শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। যদি শ্রমিকেরা সম্মিলিত ভাবে সমস্বরে দাবী পেশ করেন তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে তাঁরা অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এটা হবে তাঁদের উপরি পাওনা। সুখের কথা এই যে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বর্তমানে এই সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তাই তাঁরা একটি সাধারণ জাতীয় পরিষদ গঠন করেছেন। যদি এই পরিষদ শ্রমিকদের মধ্যে সর্ববিষয়ে ঐক্য সাধন করতে পারে তবে শ্রমিকেরা তাদের যোগ্য আসন শীঘ্রই দখল করতে পারবে না।

## আমাদের জাতীয় অর্থ ব্যবস্থায়

# চাই আরও বেশি অগ্রগতি চাই আরও বেশি সামাজিক ন্যায়বিচার

অমর নাথ দত্ত

সত্তরের এই দশক আমাদের দেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকালের সূচনা করেছে। বর্তমান দশকের সুরুতেই আমাদের অর্থনৈতিক মন্দার রেশ কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। একই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উপর এক দানবীয় সন্ত্রাসের রাজত্ব যাতে বলি হয়েছে শত সহস্রাধিক জীবন আর উৎপীড়িত ছিন্নমূল হয়েছে কোটি সংখ্যারও বেশী নরনারী। ভারতের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে যুদ্ধ। অবিচলিত আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় থেকে সমগ্র দেশবাসী ও আমাদের বীর জওয়ানদের পরম নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতায় প্রত্যেকটি দুরূহ সমস্যার সার্থক মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। স্বাধীন এক নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ জন্মগ্রহন করেছে। ভারত তাকে মমতার সঙ্গে ঐকান্তিক ভালবাসার সঙ্গে সোদরপ্রতিম বন্ধু ও নিকটতম প্রতিবেশী রূপে গ্রহণ করেছে। সুরু হয়েছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিস্তৃততর হয়েছে প্রত্যেক পর্যায়ে বৈষয়িক আদান প্রদান, নতুন এক বৈষয়িক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে সম্পর্ক হয়েছে ঘনিষ্টতর।

### আজকের শ্লোগান গরিবী হটাও

আমাদের দেশেও এর মধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এক বিপ্লব ঘটে গিয়েছে যার আলোকসম্পাতে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি উভয়েরই প্রত্যন্ত সীমায় এক নতুন সম্ভাবনার আভাষ দেখা দিয়েছে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে চতুর্থ পরিকল্পনার নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরও বাস্তবমুখী করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবার তাগিদে সেটিই যথেষ্ট নয়। কারণ এ সময় [illegible] হয়েছে তার মূল লক্ষ্য ছিল অধিকতর উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি। অন্যান্য দেশের পক্ষে তা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে এতদিন বিবেচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আজ দুই দশকের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে যে মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে এই সূত্রের কার্য্যকারিতা একান্ত রূপে সীমাবদ্ধ। এই সূত্র অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয়নি। যোজনা কমিশনের অভিমত অনুযায়ী মাসে কুড়ি টাকা করে মাথাপিছু আয়কে (১৯৬০-৬১ সালের মূল্য স্তরের হিসেবে) যদি নিম্নতম মজুরি বলে ধরে নেওয়া যায় (অবশ্য আজকের মূল্যস্তর অনুযায়ী তাকে প্রায় দ্বিগুণ করে নিতে হবে তবুও সেক্ষেত্রে ২২ কোটিরও বেশী অধিবাসী এই সামান্য উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। তাই যোজনা কমিশনের সভাপতি শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে এই দারিদ্র্য নিরাকরণই হবে এখন থেকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বঞ্চিত যারা, নিপীড়িত যারা, শোষিত যারা সেই বিরাট মানব সমাজকে আজ বৈষয়িক উন্নতির সমান অংশীদার করে নিতে হবে। এজন্য আমাদের পশ্চিমা অর্থনীতির বিধান অনুসরণ করে শুধু মাত্র বৈষয়িক অগ্রগতিকেই মৌল উদ্দেশ্য বলে আঁকড়ে থাকলে চলবেনা, বরং জাতীয় আয়ের বন্টনে আরও বেশী সমতা বিধান করতে হবে। আরও আয় ও আরও বেশি কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই কল্যাণের পথ সম্প্রসারিত হবে, ঘটবে সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, তার বিস্তৃতি ও প্রসার। এই সামগ্রিক চিন্তাধারা ও বিরাট কর্মসূচীকে একটি অর্থপূর্ণ বিশেষ শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করা হয়েছে— "গরিবী হটাও।"

### নতুন পদক্ষেপ

এদিকে দেখতে দেখতে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকাল প্রায় সমাপ্ত হতে চলল। সামনের পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী যোজনাতে নতুন চিন্তাধারার রূপায়ন ঘটানোর জন্য এখন থেকেই সমস্ত দেশ জুড়ে প্রস্তুতি পর্ব সুরু হয়ে গিয়েছে। যোজনা কমিশন তাঁদের বিগত অধিবেশনে তিনটি মৌল লক্ষ্য বস্তুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এগুলি হল যথাক্রমে : (ক) ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি (খ)

ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং (তিন) অর্থনীতির ক্রমোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। পঞ্চম পরিকল্পনায় উপরোক্ত কর্মসূচীর সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তির জন্য যোজনার কলেবর বিশেষভাবে বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। এজন্য সরকারী ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি করে বর্তমান পরিকল্পনার দ্বিগুণ আকারে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করা

হচ্ছে। টাকার অংকে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ৩০,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২,০০০ কোটি টাকার মত ধরা হচ্ছে। জনসাধারণের নুন্যতম চাহিদা মেটাতে ও ব্যাপক কর্মস্থানের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা থেকে ১১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। আমাদের জাতীয় অর্থ ব্যবস্থা আজ এমন এক পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করতে হলে অধিকতর ব্যয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস যেন নিরবচ্ছিন্ন মাত্রায় অব্যাহত থাকে সেই উদ্দেশ্যে আরও তিনটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান ঘটাতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করে। ফলে ওই কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই অধিকতর আয়ের সংস্থান ঘটানো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। তবে শুধু মাত্র আয় ও কর্মনিয়োগ, এই দুটিই সমাধান নয়। দেখতে হবে ব্যাপক মাত্রায় যাতে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যাতে ন্যায্য দামে এবং প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন সামগ্রী গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য হয়। গরীব জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে প্রথমে চাই চাকুরি সংস্থান। সেই সঙ্গে চাই এমনতর এক জাতির পরিকল্পনা যাতে নুতনতর সকল প্রকার মৌল চাহিদা মেটান সম্ভব হয়। সাধারণ ভাবে এগুলি হল ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহ। প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধান, গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও শহরে বস্তী উন্নয়ন প্রভৃতি জনকল্যাণের এক সার্বিক কার্য্যক্রম। ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রচুর মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব হয়। খাদ্য সামগ্রী যেমন ডাল, নিত্য ব্যবহার্য্য তেল, সাধারণ সুতী বস্ত্র, চিনি ও রাঁধবার জ্বালানী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তুর যোগান অব্যাহত রাখতে হবে। মূল্য স্থিতিশীল রাখবার জন্য এটি যে এক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ জন্য যথাযোগ্য মূল্য ও বন্টন ব্যবস্থাকে যেমন অধিকতর সুষম ভিত্তিতে চালু রাখতে হবে তেমনই উৎপাদন নীতি ও ব্যবস্থা যাতে আরও ভোগ্যপণ্যমুখী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পরিকল্পনার বিনিয়োগের ধারাও ব্যয়ের বিভাজন করতে হবে এবং উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করতে হলে কি ভাবে শিল্পনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরও উৎপাদনমুখী করে তোলা যায় তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

## কর ব্যবস্থার নতুন সংস্কার:

আগামী বছরগুলিতে উন্নয়নের গতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য কর সংগ্রহ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। সংবিধানে যে সাম্প্রতিক পরিবর্তণ সাধন করা হয়েছে তা শহর ও গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তিগত মালিকানার বিকেন্দ্রী করণ ব্যবস্থায় বিশেষ সহায়তা করবে। সম্পত্তির এই পুণর্বন্টনের সুযোগ পুরোপুরি মাত্রায় গ্রহণ করতে হলে এবং সম্পত্তিগত আয় যাতে অধিকতর পরিমাণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাপিত হয় তার জন্য কর ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ঘটাতে হবে। কর গোপন করা ও কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা যাতে সবতোভাবে রোধ করা যায় তার জন্য এবং কালো টাকার প্রভাব থেকে অর্থ ব্যবস্থাকে বিমুক্ত করবার জন্য ওয়ানচু কমিটি গত ডিসেম্বর মাসে এক বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। উন্নয়নের কাজে কর ব্যবস্থাকে কি ভাবে আরও কার্য্যকর করে তোলা যায় সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও বিবেচনা করা হচ্ছে কি ভাবে কৃষি ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত বাড়তি আয়কে করের আওতায় নিয়ে আনা যায়।

শুধু মাত্র সম্পদের ব্যবহারই নয়, তার ক্ষেত্র বিশেষে যথাযথ বিভাজন এবং বন্টন হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। একটি যুক্তি সঙ্গত অগ্রাধিকার ব্যবস্থার ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে এবং শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পদের এই বিভাজন কার্য্য-

ব্যয় করতে হবে। কারণ বলাই বাহুল্য যে, বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ ও ক্ষেত্রগত বিভাজন অনেক খানি নির্ভর করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্যগুলির উপরে, তাই একদিকে যেমন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে তেমনি অপরদিকে মূল ও বুনিয়াদী শিল্প তথা যন্ত্র নির্মাণ শিল্পসমূহের সম্প্রসারণ এবং যথোপযুক্ত মাত্রায় বিদ্যুৎ শক্তি, রাস্তাঘাট, পরিবহন প্রভৃতি বুনিয়াদ ব্যবস্থাদে বিস্তার ঘটাতে হবে। এজন্য সামনের বছরগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত রূপে প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন একটি বিশেষ পথে যেমন, শুধু মাত্র ভোগ্যবস্তু বা মূলধনী সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমাদের উভয় দিকেই প্রসার ঘটাতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিল্পের সুষম অগ্রগতি ঘটেছে কিনা। তা যদি না হয় তাহলে কিন্তু উৎপাদনশক্তির সীমা, অপ্রতুল শিল্প বুনিয়াদ ব্যবস্থা এবং অত্যাবশ্যক কাঁচামালের ঘাটতি প্রভৃতি অসুবিধা উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

## নতুন অর্থনীতি :

তাহলে বাস্তবের নিরিখে দেখা গেল যে শুধু মাত্র আয়বৃদ্ধিই যেখানে জাতীয় অর্থব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে সেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন করা সমানভাবে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। কারণ তাতে জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঙ্গিত মেলেনা। ফলে যেমন একদিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হ'তে থাকে অপরদিকে তেমনি ব্যাপকহারে দারিদ্র্য ক্রমশ:ই প্রকট হতে থাকে। বেকারী ও অভাবের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থনৈতিক হতাশায় পর্যাবসিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কল্যাণধর্মী রূপটি সহজেই অন্তর্হিত হয়। তাই আজ ভারতবর্ষে সেই চিরাচরিত পশ্চিমী ধারায় প্রচলিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োগ পদ্ধতির বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই জেহাদ ঘোষিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই নতুন অর্থনীতির যাত্রাপথ সূচনা করেছেন, যার মূল লক্ষ্য হ'ল সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সাম্য বিধান অর্থাৎ এক কথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের যথাযথ কল্যাণধর্মী বাস্তবপ্রয়োগ সকল স্তরের মানুষের মধ্যে, দেশের সকল স্তরের উপজীবিকার মধ্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা ভাবলে ভুল করা হবে যে অর্থনৈতিক উন্নতি তথা জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রতি কোনরকম দৃষ্টিক্ষেপ করা হচ্ছে না। জাতীয় আয়বৃদ্ধি অবশ্যই মৌল লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু
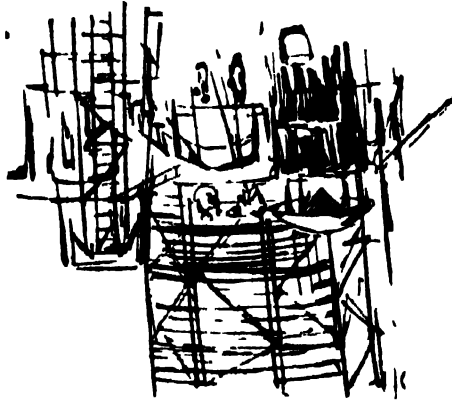
তাকে সামাজিক ন্যায় ও অপেক্ষাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টনের আওতায় এনে সর্বাধিক মাত্রায় জনসাধারণের সহজলভ্য করতে হ'লে আমাদের জাতীয় উৎপাদনের গঠন সমষ্টির পরিবর্তণ ঘটাতে হবে। একদিকে যেমন ভোগ্যপণ্য ও মূলধন এবং কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি করতে হ'বে অন্যদিকে তেমনি এমন এক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে গ্রামাঞ্চলে অধিকতর কর্মসংস্থান সম্ভব হয়। সোজা কথা হ'ল যে অধিকতর সুষম বন্টন ব্যবস্থার তাহাদিগের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির বিষয়টিকে পূর্ণ বিবেচনা করে দেখতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে শহরাঞ্চলে বেকারী বৃদ্ধির পরিমাণ এত ব্যাপক যে শিল্পোৎপাদনে বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি বিদ্যা অবলম্বন করেও বেকারীর পরিসর হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছেনা।

## গ্রাম ও শহর উন্নয়ন :

সেই সঙ্গে রয়েছে শহরাঞ্চলে শিল্পের অত্যাধিক প্রসারের নানাবিধ কুফল। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন দেশে আবেদন জানান হয়েছে (অবশ্য এটি অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে কতটা প্রযোজ্য তা চিন্তার বিষয়)। তারপর আমাদের সীমিত সম্পদের এক বৃহদাংশ যদি শহরাঞ্চলেই ব্যয় করা হয় তা হলে গ্রামীন উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব হবে? সাম্প্রতিক বেকারীর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়াছে যে কর্মহীন ব্যক্তিরা ক্রমশই শহরাঞ্চলে চাকুরি পাবার আশায় ভিড় জমাচ্ছেন কারণ গ্রামের দারিদ্র্যের চাপ তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য করছে। যেখানে আমেরিকা অথবা জাপানে ৯ থেকে ১২ শতাংশ ব্যক্তি গ্রামীন কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে প্রায় ৩৬ শতাংশেরও বেশী লোক আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত হয়ে রয়েছে এবং কৃষি নির্ভর করে কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করছে। কাজেই শহরাঞ্চলে এই ব্যাপক বেকারী প্রতিরোধ করতে হলে তার মূল উৎস খুঁজে বের করে যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় গ্রামাঞ্চলে কৃষির নিবিড় প্রসার ঘটাতে হবে, বছরে ৩।৪ বার পালটি শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে, জমির পুনর্বন্টন করতে হবে আর সেই সঙ্গে যথাযথভাবে গ্রামীন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এজন্য চাই গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত ভিত্তিতে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ ব্যবস্থা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প বুনিয়াদ দ্রুতগতিতে গড়ে

তোলার জন্য হাজারো কমসূচী।

## কর্মকেন্দ্র গ্রাম এলাকা :

তাই এই নতুন আর্থ ব্যবস্থার যথাযথ রূপটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য জাতীয় অগ্রাধিকারগুলি সুবিন্যস্ত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। গত বিশ বছর ধরে জাতীয় আয়ের উপরে যে, একক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই গুরুত্ব এখন থেকে আরোপ করতে হবে ক্রমবর্দ্ধমান স্বয়ম্ভরতার উপর, কর্মসংস্থানের উপযোগী বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধার উপর, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর এবং সেই সঙ্গে সমান ভাবেই এমন কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনা করতে হবে যাতে সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, দরিদ্রতম ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল অধিবাসীগণ আরও নিত্য ব্যবহার্য্য পন্য ও সাধারণ সেবার সুযোগ সুবিধা ন্যায্য অথবা নিম্নমূল্যে পেতে পারেন। আর ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে যেখানে বেকারী, আধা বেকারীর প্রকোপ অত্যন্ত ভয়াবহ ও ব্যাপক, সেখানে বহুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার অর্থই হল জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষম বন্টন। এতে আরও কতকগুলি অপ্রত্যক্ষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপরীতমুখী বেকার জনিত প্রতিক্রিয়া যেমন এতে করে হ্রাস পাবে তেমনই আরও বেশী পরিমাণে স্বয়ম্ভরতার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই উন্নয়নের প্রধানতম বিবেচ্য হবে ক্রমবর্দ্ধমান পরিসরে ব্যাপক কর্মসংস্থান ঘটানো যাতে অর্থনৈতিক সংবৃদ্ধি অল্প আয়াসেই লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এর উল্টোটা যদি হতে থাকে (যেমন এতদিন ধরে হয়ে আসছিল) তাহলে এই বিরাট অগ্নিগর্ভ বেকার সমস্যার সমাধান হবে সুদূর পরাহত। অনুন্নত দেশগুলিকে আজ এই কথা বুঝতে হবে যে এই নতুন দিগদর্শণ ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবমুখী প্রগতি লাভের অন্য কোন পথ খোলা নেই।

## গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান :

অনুন্নত আর্থ ব্যবস্থায় কিভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে জনৈক ইংরাজ অর্থনীতিবিদ সম্প্রতি এক রিপোর্ট পেশ করেছেন। এটা অনুশীলনের বিষয় যে, সেই রিপোর্টেও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সেবা প্রভৃতি অংশে কতটা করে কর্মসংস্থান করা যায় তার একটা সম্ভাব্য হিসেব নিয়ে সেগুলিকে পরস্পর একত্রিত করে সামগ্রিক ভিত্তিতে সমষ্টিগত নিয়োগের সম্ভাব্যতা বিচার করতে হবে। কৃষির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিসংস্কার নীতির সঙ্গে সংগতি বিধান করে জমির মালিকানার পুনর্বন্টন এবং মধ্যস্বত্বভোগী ও ধনতান্ত্রিক চাষ প্রথার পরিবর্তে আরও বেশী শ্রম-নির্ভর এবং পরিবার ভিত্তিক চাষের সুপারিশ করা হয়েছে। সবুজ বিপ্লবের উদ্গাতা যে, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আজ জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার দরুণ জমির আকার ছোট হলেও তাতে ফলনের কোন তারতম্য হবে না বলে আশা করা হচ্ছে। ওদিকে কৃষিতে নিয়োগ বৃদ্ধি ও তজ্জনিত আয় বৃদ্ধির ফলে এমন ধরণের ভোগ্যপণ্য ও সামগ্রীর চাহিদা বাড়বে (যেগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) যা নাকি অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলধন ও অধিকতর শ্রম-নির্ভর শিল্পে সহজেই উৎপাদিত হতে পারে। গ্রামের মধ্যে বা চতুষ্পার্শে এই সমস্ত শিল্প যতই গড়ে উঠবে ততই নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কৃষির উৎপাদন পদ্ধতি যতই যন্ত্র সহযোগী হবে (অবশ্য পরিবার ভিত্তিক ব্যবস্থায় ততই যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়বে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা ও যোগান সবভাবেই বাড়তে থাকলে এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতি কার্য্য অনেকখানি সহজসাধ্য হবে ; তাছাড়া সার, কীটনাশক পদার্থ,
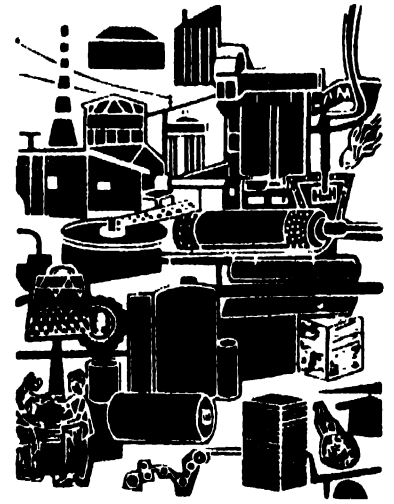
রাসায়নিক দ্রব্য এবং সেচের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য বহুল পরিমাণে মাঝারি ও ছোট সহায়ক শিল্প সংস্থা একই সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্ভব। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হতে থাকবে। ফলে বিভিন্ন রকম গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও মেরামতির সুযোগ সুবিধা যে গ্রামাঞ্চলে বিশেষভাবে বিস্তৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। এইভাবেই একটা করে গ্রামীন শিল্পাঞ্চল ক্রমশ গড়ে উঠলে সেগুলি হবে স্বয়ম্ভর অথচ শহরাঞ্চলের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত.

# ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনী দুভাগে বিভক্ত হয়। এরফলে অনেক উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৈন্যাবাস এবং বিমানক্ষেত্র পাকিস্তানে চলে যায়। উদ্বাস্তু আগমন, কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণ এবং ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায়।

স্বাধীনতার প্রথম দশকে আমাদের সামরিক বাহিনীকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালের সাবেকী ধরণের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। ১৯৬২ সালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত এবং আধুনিক করে গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়। ৫ বছরের এক প্রতিরক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে জোরদার করে তোলা হয়। দেশে নতুন ধরণের অস্ত্রের নক্শা তৈরী এবং উৎপাদনের কাজে হাত দেওয়া হয়। একই সাথে বাইরে থেকেও অস্ত্র আমদানী চলতে থাকে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করা হয়।

এই সকল ব্যবস্থার সুফল পাওয়া গেল ১৯৬৫ সালে। ঐ সময় আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী পাকিস্তানী আক্রমণকে প্রতিহত করে দিতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হল। আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে যথেষ্ট বৃদ্ধির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হোল। ফলে বর্তমানে ভারত এবং পাকিস্তানের সামরিক শক্তির অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৬২:৩৮-এ।

সত্তরের গোড়া থেকেই আমাদের সামরিক বাহিনী দেশে প্রস্তুত আধুনিক ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো। এই দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৭.৬২ ইছাপুর রাইফেল, ৭.৬২ হাল্কা মেশিন গান, ৮১ মি: মি: মর্টার, ৩.৫ রকেট উৎক্ষেপণ যন্ত্র, ৫৭ মি: মি: এবং ১০৬ মি: মি: রিকয়লেস গান, এল-৭০ বিমান ধ্বংসী কামান এবং বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক।

বর্তমানে ভারতের সামরিক বাহিনীর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক এবং শারীরিক উভয়দিক থেকেই আমাদের জওয়ানরা আজ বরফাবৃত পাহাড় জঙ্গলে এবং সমতলভূমিতে যুদ্ধ শুরু করার জন্য নিজেদের তৈরী করেছেন।

## নৌবাহিনীর উন্নতির গতি:

প্রথমত: যুদ্ধ জাহাজের অত্যধিক দাম, দ্বিতীয়ত: স্থল এবং বিমান বাহিনীর উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়ায় ভারতীয় নৌ বাহিনীর উন্নতির গতি অনেকাংশে মন্থর হয়েছে। ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত ক্রুইজার 'মাইশোর,' বিমানবাহী জাহাজ 'বিক্রান্ত' এবং তিন স্কোয়াড্রন সাবমেরিন ও বিমান ধ্বংসী ফ্রিগেট ভারতীয় নৌ বাহিনীর প্রধান সম্পদ ছিল।

১৯৬৮ সালে চার স্কোয়াড্রন সাবমেরিন ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করার সাথে সাথেই নৌবাহিনীর নতুন যুগ শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে ফ্লিট ট্যাঙ্কার, সাবমেরিন উদ্ধারকারী জাহাজ, পেট্রোল বোট, মাইনসুইপার এর মত আধুনিক যুদ্ধযান নৌবাহিনীতে স্থান পেল। ৭০ এর গোড়ায় ভারতীয় নৌবাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র যুগে প্রবেশ করলো। এক স্কোয়াড্রন ছোট ক্ষেপণাস্ত্র বাহিত জলযান নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ঘটালো।

নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আধুনিক ধরণের পোতাশ্রয় এবং জাহাজ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলো। শত বছরের পুরোনো বোম্বের মাজাগান ডকের প্রসারণ এবং আধুনিকরণ এর কাজে হাত দেওয়া হল। বিশেষ কতকগুলি কারিগরী বিষয় ব্যতীত নৌবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম প্রশিক্ষণ আজ আমাদের দেশেই হয়ে থাকে। নৌবাহিনীর জন্য শীঘ্রই একটি পরিকল্পনা দপ্তর খোলা হচ্ছে। মাজাগান ডক, গার্ডেনরীচ এবং হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড থেকে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধ জাহাজ আজ দেশেই তৈরী হচ্ছে।

১৯৭২-এর ৩রা জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতে তৈরী প্রথম ফ্রিগেট "নীলগিরি" কে জলে ভাসিয়েছেন। এই জাতীয় আরো কয়েকটি জাহাজ বর্তমানে ভারতে তৈরী হচ্ছে। দুদশক পূর্বের তুলনায় ভারতের নৌবাহিনী আজ অনেক শক্তিশালী এবং এর আঘাতের ক্ষমতাও অনেক বেশী।

## বিমানবাহিনীর জেট জুগে প্রবেশ

বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রথম ধাপ হলো জেট যুগে প্রবেশ। ব্রিটেন থেকে ভেমপয়ার জেট জঙ্গী বিমানগুলি নিয়ে এশিয়ার মধ্যে ভারতই প্রথম জেট যুগের সূচনা করেছে। এর পরে এলো তুফান, হান্টার, ন্যাট, মারুত (এইচ. এফ. ২৪) মিগ-২১ এবং এস. ইউ. ৭ বিমানগুলি।

দেশ ভাগের সময় ভারতীয় বিমান-

REGD. NO. D-233

বাহিনীতে কোন বোমারু বিমান ছিল না। পঞ্চাশ এর দশকে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে ক্যানবেরা জেট বোমারু বিমান এলো। এখনো ঐ বিমানগুলি আমাদের বোমারু বিমানগুলির মধ্যে অন্যতম।

রিকম্বস্থি জাতীয় হেলিকপ্টার নিয়ে আমাদের বিমানবাহিনীতে ১৯৫৪ সালে হেলিকপ্টারের প্রচলন শুরু হয়। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার বাহিনীতে এম. আই. ৪ এবং অ্যালাউইটি জাতীয় হেলিকপ্টার সংযোজিত হয়েছে। বিমান এবং বিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য বিমানবাহিনীর বাইরের শক্তির উপর নির্ভরশীলতা দূর করবার উদ্দেশ্যে একটি বলিষ্ট এবং সময়োচিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বৈদেশিক সহযোগিতায় প্রথমে হিন্দুস্থান এরোওনেটিক্স লিমিটেড ভ্যামপ্যায়ার জঙ্গী বিমান নির্মাণের কাজে হাত দেয়। এর পরে ন্যাট, মিগ-২১ বিমান এবং এল'উইটি হেলিকপ্টার নির্মাণ শুরু হয়। ন্যাট বিমানের একটি নতুন সংস্করণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

একই সাথে দেশে যাতে স্বাধীন ভাবে বিমান নির্মাণ করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার ফলে এইচ. টি. ২ ট্রেনার এবং সুপার সনিক মেরুট (এইচ. এফ. ২৪) বিমানগুলি তৈরী হয়। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন নতুন ধরণের গ্রাউণ্ড এটাক বিমান নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী আজ এর ৪৫ স্কোয়াড্রন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে।

## অপূর্ব দক্ষতা

আধুনিকীকরণের ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে শক্তিশালী হয়েছে ১৯৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধে তার প্রমাণ মিলেছে। এই যুদ্ধে স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনী আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

# যৌথ উদ্যোগ ও যুক্তিগ্রাহ নীতির প্রয়োজনীয়তা

৯ পৃষ্ঠার পর

উপযুক্ত লভ্যাংশ নিশ্চয় আশা করতে পারে। এই ধরণের আন্তঃ কোম্পানী বিনিয়োগের উন্নয়নের জন্য আর্থিক অসমতা দূর করা প্রয়োজন। আন্তঃ কোম্পানী বিনিয়োগ আয়করের আওতায় পড়ে। একটি কোম্পানীর অন্য কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের ওপর আয়কর ধার্য করা হয়।. যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে আন্তঃ কোম্পানী বিনিয়োগের লভ্যাংশকে সম্পূর্ণভাবে আয়কর মুক্ত করতে হবে। আন্তঃ কোম্পানী বিনিয়োগের জন্য কোম্পানী আইনের ৩৭২ ধারা অনুসারে যে অনুমতির প্রয়োজন হয় তা অনতিবিলম্বে পাওয়া উচিত। গত কয়েক বছরে উচ্চ হার কর ধার্যের দরুণ যৌথ সঞ্চয়ের দ্রুত অবনতি হয়েছে। যদি আশা করা যায় যে বর্তমান কোম্পানীগুলি যৌথ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে, তাহলে করনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে যৌথ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বেসরকারী সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয় মূলধনের একাংশ আসে মূলধনী বাজার থেকে। অথচ মূলধনী বাজার থেকে যে ধরণের সাড়া পাওয়া উচিত, তা পাওয়া যায় না। কাজেই মূলধন সংগ্রহের বাজার সহ, অর্থ সংগ্রহের উৎসগুলি আরো জোরদার করা উচিত।

## প্রয়োজনীয় রূপরেখা

যৌথ পরিচালন ব্যবস্থা হিসেবে জয়েন্ট সেক্টরের উজ্জল দিক অবশ্যই রয়েছে। তবে যৌথ উদ্যোগকে যদি প্রকৃতই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাহলে সরকার এবং বেসরকারী অংশীদারদের মধ্যে, কার কতটুকু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অংশীদারদের বিকেন্দ্রীকরণ, যৌথ উদ্যোগের লক্ষ্য হলেও, মূলধনী বাজার পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনেক রাজ্য সরকার সব শ্রেণীর শিল্প প্রসারে তৎপর হলেও সেই সব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রা[illegible] সহায় সম্বলের অবলম্বন থাকা উচিত সর্বোপরি, জাতীয় লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

## ভূগর্ভে বৈদ্যুতিক রেল

কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার জন্য ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক রেল প্রকল্পটি মঞ্জুর করেছেন। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট'। এই রেলপথ বসবে টালিগঞ্জ থেকে দমদম অবধি ১৬.৪৩ কিলোমিটার জায়গার ওপর। এতে ব্যয় হবে মোট ১৪০ কোটি টাকা, তারমধ্যে বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে ২৩.৭ কোটি টাকাও ধরা হয়েছে। প্রকল্পটির কাজ ১৯৭৭ সাল নাগাৎ শেষ হবার কথা আছে।

## সবার আগে কে ?

বর্তমানে দেশে সবচেয়ে ধনী রাজ্য হ'ল পাঞ্জাব—হরিয়ানার স্থান ঠিক তার পরেই। পাঞ্জাবের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৯৭০-৭১ সালে ছিল ৪৮১ টাকা আর ঐ বছর হরিয়ানার মাথাপিছু আয় ছিল ৪৪৪ টাকা। ভারতের গড় মাথাপিছু আয় হ'ল ৩৪৭ টাকা। কিন্তু উন্নয়ন হারে হরিয়ানারই সবচেয়ে বেশী—তা হ'ল ৬[illegible] শতাংশ।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভীরেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

# ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

চতুর্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

১লা নভেম্বর ১৯৭২ : ১৫ই কার্তিক ১৮৯৪

Vol IV : No 10 Nov. 1 1972

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে, পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।



সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রামের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

## যুগবাণী

**অন্যের বিচার করা উচিত নয়। নিজের সত্যকার বিচার করতে পারলে তবেই প্রকৃত সুখ পাওয়া সম্ভব।**

—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

## এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

# খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং প্রাচ্যের সমস্যাদি

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একাদশতম আঞ্চলিক সম্মেলনের ১০ দিন ব্যাপী অধিবেশন নতুন দিল্লীতে সদ্য শেষ হোল। এই অধিবেশনে আলোচনার ফলাফল এবং যে-সব বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি; তবে এটা ঠিক যে এই সব আলোচনা হয়েছে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অগণিত সমস্যাদি ঘিরে, বিশেষ করে খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে এই এলাকায় সবুজ বিপ্লব দেখা গিয়েছে।

বিগত ষাট দশকের শেষের দিকে এই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের মত ভারতেও সবুজ বিপ্লব দেখা দেয়। আমাদের কাছে এটা একটা অভিনব অভিজ্ঞতা এবং এর ফলও হয় আশ্চর্য্য রকম। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে দানা-শস্যের উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে গম ও ধানের। সকলের মনে এই আশার সঞ্চার হয় যে এইবার বুঝি খাদ্য সঙ্কটের অবসান ঘটবে, বিশেষ করে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে। দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার স্থির করা হয় ৪ শতাংশে। উন্নয়ন দশকের প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে উন্নয়নের সামগ্রিক হার ছিল ৩ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭১ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২ শতাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১ শতাংশে নেমে যায়। তবে সারা অঞ্চলে নিম্ন হার ছিল না যেমন ভারতে। আমাদের একটা সান্ত্বনা এই যে উন্নয়নশীল দেশগুলির গড়পড়তা হারের চেয়ে আমাদের উন্নয়ন হার বেশীই ছিল।

কয়েকটি কারণে উন্নয়ন হারে এই অবনতি ঘটে। একদিকে যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে তেমনি বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান কোরতে পারলেই তবে সবুজ বিপ্লব স্থায়ী হবে। যেমন ধরুণ গবেষণার দ্বারা উৎপাদিত জীবানু উদ্ভিদ জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এনেছে রোগ বীজানু। ক্রমবর্দ্ধমান এইসব রোগ বীজাণু নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি কোরছে। উচ্চ ফলনশীল বীজগুলি এইসব রোগের জীবাণু দ্বারা অতি সহজে আক্রান্ত হয় যা সাধারন শ্রেণীর বীজ অনায়াসে প্রতিরোধ কোরতে পারে। বীজানু নাশক এবং কীটানু নাশক ব্যবহার করা যায় ঠিকই কিন্তু অবিরাম উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কীট নাশক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মানুষ, গৃহপালিত পশু, মৎস্য এবং বন্য জীবজন্তুর মধ্যেও অতি মাত্রায় বিষক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, এই সব রোগ জীবানু বীজানুনাশক দ্রব্যের দ্বারা আর ঘায়েল হয় না। ফলে গাছপালা এবং জীবজন্তু রক্ষা করা এখন এক নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ওপর কৃষির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা রয়েছে সার, সেচ, ব্যয় বহুল বীজ ইত্যাদি। আমাদের দেশে যে জমিতে ২৫ বছর আগে এক টন সার লাগত সে জায়গায় এখন আমরা প্রায় ৩৩ টন সার ব্যবহার করছি। অবিশ্যি সেচযুক্ত চাষ জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে সবুজ বিপ্লবকে যদি জীয়িয়ে রাখতে হয় তাহলে কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ আরও অনেক বেশী করতে হবে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের পল্লী এলাকার বিষয়ে চিন্তা করে দেখা দরকার। বিশেষ এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ফলে মানুষের তুলনায় জমির পরিমাণ ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। সত্তর দশকের শেষের দিকে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিও খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে আমরা দুর্দশার চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিছি। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি থাকবেন অর্দ্ধভুক্ত, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির পুষ্টির অভাব। খাদ্যাভাবের চেয়ে ক্রয় ক্ষমতার অসম বন্টন এবং অপ্রচুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দরুণ অপুষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুখের কথা জনগণ এ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরাহা করার চেষ্টা করছেন। সুরাহার অন্যতম একটি পথ হল ভূমিসংস্কার। এই সচেতনতার কারণ হল গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বেকার ও আধা-বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি—জাতীয় সম্পদের অসম বন্টন এবং সবুজ বিপ্লব সত্বেও ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য।

এই অঞ্চলের কৃষি এবং পল্লী অর্থনীতির এই দিকটায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ উন্নয়ন সূচী, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আরও বেশী নজর দেওয়া দরকার। সুতরাং এটা এখন সুস্পষ্ট যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনাদি অতীতের প্রয়োজনাদি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকের প্রয়োজন হল—কেবল উন্নয়ন নয়, সামাজিক ন্যায় বিচার ও স্বয়ম্ভরতার ওপর ভিত্তি করে মানব কল্যাণ যা এই এলাকা থেকে দারিদ্র্য দূর করবে, মানুষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে।

তাহলে জনগণ, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাজ কি হবে? প্রত্যেক দেশকে নিজ নিজ আর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে অগ্রাধিকার এবং কর্ম কৌশল স্থির করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়, ভূকম্পন, মহামারী, শস্য নষ্টকারী পোকামকড় এই অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি করে। সুতরাং উৎপাদন স্থিতিশীল করা প্রথম প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ, সার এবং উপযুক্তভাবে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত শস্য মজুদ করা সম্ভব। অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে জনসংখ্যা
পুষ্টির অভাব দূর করার জন্য আরও ব্যা
সংস্কার, প্রশাসন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন
উন্নয়ন অত্যাবশ্যক সন্দেহ নেই
ফলগুলিও যেন সমানভাবে বন্টন
উদ্দেশ্য এখন কেবল আরও বেশী
উদ্দেশ্যে হবে স্বল্প দামে আরও বে
পল্লী অঞ্চলের জনগণের আয় বৃ

মধ্যে

# পঞ্চম যোজনার প্রস্তাবনা (১৯৭৪-৭৯)

**স্বাধীনতার পর দেশে যথেষ্ট শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রকৃত অর্থে আমরা এখনও লাভ করতে পারিনি। খাদ্যে স্বয়ংভরতার এসেছে। কিন্তু শিল্পে স্বয়ংভরতা এখনও আসেনি। শিল্পে স্বয়ংভরতা মাধ্যমে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, তাই পঞ্চম যোজনার এক উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক মানুষের কাছে স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থ এনে দেওয়া। তার জন্য প্রয়োজন উন্নয়নের সুফল সমস্ত নাগরিকের কাছে সুলভ করে তোলা। এক কথায় সমাজতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন।**

গেলে তার দরকার এই দুটি দিকেই সমানভাবে নজর দেওয়া। প্রচুর সংখ্যক লাভজনক কর্মসৃষ্টির দ্বারা কেবল ক্রমবর্দ্ধমান হারে উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস সম্ভব। অধিক সংখ্যক কর্ম সৃষ্টি করা যে যোজনার উদ্দেশ্য, তাতে অন্যান্য কর্মসৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলি এবং সেগুলির সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের পূর্ণ উৎপাদনক্ষমতা কাজে লাগান সম্ভব হবে না এবং তার ফলে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কর্মসৃষ্টি—তাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কর্মসৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য মূল কর্মসূচীর সঙ্গে আরও কতকগুলি বিশেষ

অন্ততঃ এটুকু বঞ্চিত হতে হবে, যার দ্বারা জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি তারা মেটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চম যোজনার এই দলিলে একটি জাতীয় ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচী" রচনার কথা বলা হয়েছে।

## স্বয়ংভরতা

পঞ্চম যোজনার শেষে অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাৎ দেশকে অবশ্যই এমন অবস্থায় পৌঁছতে হবে, যখন আর দেশের পক্ষে নীট সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এর জন্য দরকার—খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংভরতা এবং তুলা ও তৈলবীজের অধিক উৎপাদন, ইস্পাত, লৌহ ভিন্ন ধাতু, সার, অপরিশোধিত খনিজ তৈল, পেট্রোলিয়াম-

## উন্নয়নের হার ও তার ধরণ

যোজনার লক্ষ্য ও রূপায়ণ নীতি অনুযায়ীই যোজনাকালে উন্নয়নের হার কি হবে, তা নির্দ্ধারিত হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গড়ে ৫.৫ শতাংশ হারে উন্নয়নই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। সমাজের দরিদ্রতর অংশের পক্ষে ভোগ্যপণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য গড়ে ৫.৫ শতাংশ হারে উন্নয়ন অবশ্যই যথেষ্ট নয়। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার এমন হতে হবে, যার দ্বারা জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ লোক জীবনযাত্রার এক সন্তোষজনক মানে পৌঁছতে পারে।

যোজনায় উন্নয়নের ধরণ, সেই কারণে

দারিদ্র্য দূরীকরণ আর অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন দেশের সামনে আজ এই দুটি হল প্রধান সমস্যা। এবং দেশে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চললেই শুধু এই সমস্যা দুটির সমাধান সম্ভব। পঞ্চম যোজনার মধ্য দিয়ে দেশ অবশ্যই এই পথে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

## দারিদ্র্য দূরীকরণ

দারিদ্র্য রয়েছে তার কারণ দুটি : এক হল অনুন্নয়ন আর দুই, অর্থনৈতিক বৈষম্য। দেশ জোড়া দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে

বিশেষ কর্মসূচীকে সমন্বিত করার প্রয়োজন হবে, যাতে করে শিক্ষিত বেকারদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও এমন হতে হবে যা শিক্ষিত বেকারদের জন্য সৃষ্ট কর্মের উপযোগী হয়।

## সামাজিক বণ্টন

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জল, গৃহনির্মাণ, যোগাযোগ ও বিদ্যুতের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতর অংশের জন্য প্রচুর সংখ্যায় কর্মসৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে তাদের আয়ও

জাত দ্রব্য, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদি এবং মূল রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়ান। সেই সঙ্গে আরও প্রয়োজন দেশ থেকে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। দেখা গেছে, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য যত কম হবে, ব্যালান্স অফ পেমেন্ট (balance payment) পরিমাণও ততই কম হবে। তাই ক্রমবর্দ্ধমান স্বয়ংভরতা এবং অধিকতর অর্থনৈতিক সমতা এই জিনিস দুটি পরস্পরের পরিপূরক।

এমন হবে যাতে কৃষি, মূল শিল্প ও নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প উপযুক্ত গুরুত্ব পায়।

বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ হারে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যোজনা কমিশন সুপারিশ করেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, আমদানি বিকল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি যদি পূর্ব নির্দ্ধারিত হারে হয়, তাহলে ১৯৭৮-৭৯ সালে নীট শূণ্য পরিমাণ সাহায্য এই অবস্থায় পৌঁছান দেশের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

এই সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন কর্মসূচীগুলির কাজ যাতে অব্যাহত ভাবে এগিয়ে যেতে পারে—এমন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ঠিক সময়ে গ্রহণ করা। অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলির ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচীগুলি অবশ্যই উচ্চ প্রাধান্য পাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন মেটাবার বন্দোবস্তও অবশ্যই করতে হবে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সেই সব ক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ করা নীতিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নিখুঁত হওয়া দরকার। তাই আগামী কয়েক মাসে যোজনা কমিশনের কাজ হবে পঞ্চম যোজনার দলিল যে সব যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই অনুযায়ী ঠিক ঠিক সুপারিশ করা।

## যোজনার জন্য সম্পদ সংগ্রহ

১৯৭১-৭২ সালের মূল্যমান অনুযায়ী যোজনার ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ৫১,১৬৫ কোটি টাকা। সরকারী ক্ষেত্রে যে প্রকল্পগুলি বর্তমানে রূপায়ণের অবস্থায় আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হবে ৫,৮৫০ কোটি টাকা। এই অঙ্কটিও যোজনার মোট বরাদ্দের অন্তর্গত। হিসাবে দেখা গেছে, যোজনাকালে মোট ব্যালান্স অফ পেমেন্ট (Balance of payment) দেখা দেবে ৩,০০০ কোটি টাকার মত। এই ঘাটতি আরও যাতে কম হয়, সে চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। যোজনা কমিশন আশা করছেন, এই ঘাটতি হ্রাসের জন্য বন্ধু দেশগুলি থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে।

## সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ—অনুন্নত অঞ্চল—যোজনার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ

সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৩৫,৫৯৫ কোটি টাকা। উপরোক্ত ৫,৮৫০ কোটি টাকা বাদ দিলে এই অঙ্ক দাঁড়ায় ২৯,৭৪৫ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটবে ১৫,৫৭০ কোটি টাকার। অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত হল ৬৫·৬ : ৩৪.৪।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ এমন ভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে করে ঐ ঐ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্দ্ধারিত হারে উৎপাদন হওয়ায় অসুবিধা না দেখা দেয়।

অনুন্নত এবং পার্বত্য অঞ্চলগুলির উন্নয়ন যোজনার একটি অন্যতম মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে প্রধান কাজ হল, একটি সুসম্পূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরী করা। 'জাতীয় ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচীটিকে' সমস্ত কর্মসূচীর সঙ্গে উপযুক্তভাবে সংযোজিত করতে হবে। অনুন্নত অঞ্চলগুলির সুসম্পূর্ণ উন্নয়নের জন্য কি কি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলগুলিতে বিনিয়োগের ধরণ কি হবে, সে ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কর্মসূচী রচনা শুরু করা হয়েছে। অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব হল রাজ্য সরকারগুলির তাই এই দায়িত্ব পালনের জন্য যা যা প্রয়োজন সে ব্যবস্থাও রাজ্য সরকারগুলি গ্রহণ করছেন।

অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নয়নের জন্য আরও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীগুলির উন্নয়নের জন্য সাধারণ ক্ষেত্রগুলির মাধ্যমে বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচীর রূপায়ণের ব্যাপারে এই শ্রেণীগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। উন্নত শ্রেণীর কাছ থেকে প্রতিযোগীতায় যাতে অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা পিছিয়ে না পড়ে, সে উদ্দেশ্যে এদের প্রতিযোগীতা করার ক্ষমতার উন্নতিকল্পেও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এই শ্রেণীভুক্ত লোকেদের, যারা অপরিচ্ছন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে তাদের কর্ম ও জীবন ধারণের অবস্থার উন্নয়নও প্রাধান্য পাবে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির প্রতিও সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে।

## বেতন—দ্রব্যমূল্য—আয়

বেতন, দ্রব্যমূল্য এবং আয়ের মধ্যে

একটি সামঞ্জস্য থাকা দরকার। এ কথা মনে রেখেই, অতিরিক্ত চাহিদার যাতে সৃষ্টি না হয়, সেই অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগও নির্দ্ধারিত হবে। প্রাথমিক প্রয়োজনের জিনিষগুলির (wage goods) উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানোর ব্যবস্থা পঞ্চম যোজনার এই দলিলে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক প্রয়োজনের জিনিষগুলির সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে, সেই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ঐ জিনিষগুলির সংগ্রহ ও বন্টনের কথাও (বিশেষ করে দরিদ্রতর অংশের জন্য) এই দলিলে বলা হয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এমন ধরণের বেতন বৃদ্ধি রোধ করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের জন্যই একটি না একমত 'জাতীয় বেতন কাঠামো' রচনার কথাও বলা হয়েছে এই দলিলে। সেই সঙ্গে সম্পত্তি ও ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয় যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্য, বেতন ও আয় সংক্রান্ত নীতি হবে একটি সুসম্পূর্ণ এবং সুসংগঠিত নীতি যার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে উন্নয়ন ঘটতে পারে অর্থাৎ স্থিতিশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার যেন একই তালে পা ফেলে এগিয়ে চলতে পারে। এই নীতিটির তিনটি দিক—দ্রব্যমূল্য, বেতন এবং আয় অত্যন্ত নিবিড় ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

## যোজনার রূপায়ণ

যোজনার সাফল্য বিরাট ভাবে নির্ভর করছে যোজনার রূপায়ণের ওপর। শাসন-যন্ত্রের কাজের মান উন্নতি এমন স্তরে করতে হবে—যাতে করে অযথা বিলম্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। যোজনায় যে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত কিছুতেই হবে না যদি না প্রকল্প রচনা ত্রুটিমুক্ত হয় এবং রূপায়ণ দ্রুতগতিতে সংঘটিত হয়।

বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের উৎপাদনক্ষমতার অধিক ব্যবহার শিল্পের একটানা অসমতার (Imbalance) আশু সমাধান, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্য দূরীকরণ এবং উৎপাদন যন্ত্র এবং কারখানাগুলির আরও ভালভাবে পরিচালনার ওপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকার। পরিচালনার ত্রুটি এবং শিল্প সম্পর্কে সামঞ্জস্যের অভাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পে দক্ষতার অভাব ও বিলম্বের জন্য দায়ী।

কি সরকারী, কি বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের দৈনন্দিন কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য উন্নতি একটি অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। কৃষি সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম এবং মূল শিল্পগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং আকাঙ্খিত পথে উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির শাসনযন্ত্রেও পরিবর্তন দরকার হবে। জরাজীর্ণ শাসনযন্ত্র এবং ঢিমেতালে চলা কর্মপদ্ধতি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই যথাযথ ভাবে যোজনার রূপায়ণ সম্ভব নয়।

## জনগণের পরিকল্পনা

পঞ্চম যোজনার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধন করতে হলে দরকার নিয়মানুবর্তিতা, ও কঠিন পরিশ্রম। জনগণের সমস্ত অংশ কর্তৃক ত্যাগ স্বীকার। এইগুলি উপযুক্ত পরিমাণে পেতে হলে যোজনার রচনায় ও রূপায়ণের জনগণের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ হল একটি আবশ্যিক সর্ত। সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও নীতি-নীতিগুলি যাতে যথাযথ ভাবে কার্য্যকরী হয় সে বিষয়টিকেও প্রাধান্য দিতে হয়। কেবলমাত্র তবেই ১৯৭৪-৭৯ সালের এই পঞ্চম যোজনাকে জনগণের পরিকল্পনা বলা যেতে পারে।

## ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য কর্ম-ভিত্তিক প্রকল্প

শিক্ষিত বেকার যুবক ও ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য কর্মভিত্তিক প্রকল্পের রূপরেখা নির্ণয়ার্থে ১৯৭১-৭২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

গ্রামাঞ্চলে প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত সমীক্ষার জন্য ১৯৭১-৭২ সালে ৫১ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ২৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭১-৭২ ২০০টি, ১৯৭২-৭৩ সালে ৫০০টি এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫৫০টি সমীক্ষক দল গঠনের কথা আছে। এর ফলে ১,২৬৮ জন ইঞ্জিনীয়ার সমেত ৫,৬৩১ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃষি সহায়ক স্কীম অনুসারে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ২৫০০টি কৃষি সহায়ক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে আশা করা যায়। এগুলিতে ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। এই বাবদে ১৯৭১-৭২ সালে ১৮.৬২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ৭৫.৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

গ্রামের জল সরবরাহ প্রকল্পগুলিতে অন্যান্যদের সাথে ৪০৭ জন ইঞ্জিনীয়ারের চাকুরীর সংস্থান হবে। ১৯৭৩ সাল নাগাদ এই খাতে ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বল্প মূলধন বিশিষ্ট ব্যবসাউদ্যোক্তাদের সাহায্য দান স্কীম থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ৪.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এ প্রকল্পগুলিতে ১,৫০০ ইঞ্জিনীয়ার ও ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের চাকুরীর সংস্থান হবে।

শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রালয় কারিগরি শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য ট্রেনিং স্কীমও চালু করেছেন।

পঞ্চম পরিকল্পনা সম্পর্কে

# পশ্চিম বাংলার দৃষ্টিভঙ্গী

পশ্চিমবাংলা যখন দারুন বিদ্যুৎ সঙ্কট এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সমস্যায় জর্জরিত, রাজ্যের মন্ত্রীসভা এবং পরিকল্পনা পর্ষদ, ঠিক সেই সময়, রাজ্য পঞ্চম পরিকল্পনায় কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে সে সম্পর্কীত নথিপত্র অনুমোদন করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণকালে তাঁরা কতকগুলি অপরিহার্য বিষয়, এবং 'অবস্থার' দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, যেগুলি ছিল রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে তীব্র বেকার সমস্যা, বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে এবং জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্য। এই সব সমস্যা ছাড়াও, খাদ্যোৎপাদন কম এবং অনিশ্চিত হওয়া, বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং হতাশা ব্যঞ্জক শিল্পোৎপাদন—এক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

রাজ্যের পরিকল্পনার মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে দুটি মৌলিক অথচ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল প্রয়াসের ওপর। (এক) আনুষঙ্গিক শিল্পোন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিপননের সুযোগ সুবিধা সহ এক ব্যাপক এবং সুসংহত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার অধিকতর জমিকে এর আওতাভুক্ত করা।

(দুই) কাজে না লাগানো উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ সদব্যবহার সহ শিল্প কাঠামোর সম্প্রসারণ এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে শিল্প প্রচেষ্টাকে বহুমখী করা।

## কৃষি

দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ সংক্রান্ত নথিপত্রে, পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়াও পশ্চিমবাংলাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার নতুন কর্ম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আশা করা যায়, রাজ্যের ২৫ লক্ষ একর জমিকে এই নতুন ধরণের কৃষি উন্নয়নের আওতায় আনা যাবে এবং এই উন্নয়নের মধ্যে সার্ভিসিং-এর সুযোগ সুবিধা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ এবং সেচ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
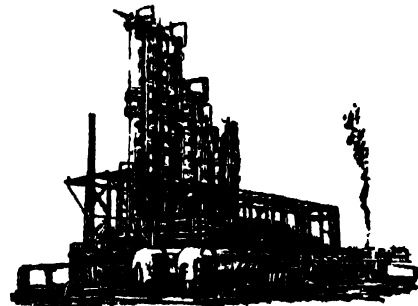
## শিল্প ও বিদ্যুৎ

প্রাথমিক নথিপত্রে, শিল্পোন্নয়ন বলতে, রাজ্যের ইস্পাত ও লৌহ, হাল্কা ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং, ওষুধ এবং বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পগুলিকে বর্তমানের মত শুধুমাত্র সাহায্য দানের কথাই বলা হয়নি, উপরন্তু কৃষি ভিত্তিক শিল্প, হাঁস মুরগী পালন, মৎস চাষ, বন ভিত্তিক ছোট মাঝারী এবং কুটির শিল্পের মত কর্ম ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে এবং পেট্রো কেমিক্যালস, সার, ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতি শিল্পের উন্নয়নের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ এই সব শিল্পে পশ্চিমবাংলা পিছিয়ে আছে।

পশ্চিমবাংলার দারুণ বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং বৈদ্যুতিকরণের হীনাবস্থার কথাও রাজ্যের পঞ্চম পরিকল্পনার প্রাথমিক নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান ক্ষমতা ছিল ১৫০০ মেগাওয়াট। কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনাকালের শেষ ভাগে রাজ্যে আরো ২২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হবে। এর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থাকে আরো সুসংবদ্ধ ও বিজ্ঞান সম্মত করা উচিত। বর্তমানে এই ব্যবস্থা, বিভিন্ন সংস্থার হাতে রয়েছে। এছাড়া পঞ্চম পরিকল্পনাকালে যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তির দরকার হবে, তা যাতে ঠিক মতো পাওয়া যায়, তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণ হোল, ৯০০ মেগাওয়াটের কিছু বেশী। যদি খুব কম করেও বলা যায়, তাহলে এখনও ১৫০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। তবে আরো কয়েকটি ডিজেল এবং গ্যাস টারবাইন চালু হয়ে গেলে এই অবস্থার উন্নতি হতে পারে। তাছাড়া রাজ্য সরকার আসাম ও উড়িষ্যা

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

# ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন কেন

জমির মালিকানার 'সিলিং' বা ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণ নিয়ে জোর বাদ প্রতিবাদ উঠেছে—কি ধরণের জমির কত একর সিলিং হবে। সেচ ও অসেচ এলাকার মধ্যে তারতম্য করার কথাটা অস্বীকার করা যায়না। কিন্তু ব্যক্তিগত সেচ এলাকার অধীন জমিকে অসেচ এলাকার জমি বলে গণ্য করা হবে কি হবে না, তাই নিয়েও বাদ প্রতিবাদ উঠেছে। অবশ্য আদৌ সিলিং না করার পক্ষেও এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠেছে যা ফেলনা নয়। কিন্তু তা বিশেষ আমল পাচ্ছে না। তাছাড়া সিলিং ব্যক্তি বা রায়তভিত্তিক হবে, না পরিবারভিত্তিক, হবে তা নিয়েও মতভেদ ছিল তবে তা বর্তমানে চাপা পড়ে গেছে।

আবহমান কাল ধরে মালিকানা ব্যক্তিভিত্তিকই চলে আসছে। কোন কোন রাজ্যে ইতিপূর্বে যে সিলিং ধার্য করা হয়েছিল [illegible] ঐ ব্যক্তিকে ইউনিট হিসাবে গণ্য হয়েছিল। একই পরিবারের নাবালক সাবালক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঐ সিলিং পরিমাণ জমি রাখতে পারতো। বর্তমানে পরিবারভিত্তিক সিলিং করার নীতিই স্বীকৃতি হয়েছে। তা নিয়ে কিন্তু বিশেষ কোন বাদ প্রতিবাদ আর ওঠে নি, যদিও এ প্রশ্নের গুরুত্বটা কম নয়।

প্রথমতঃ একেবারে গোড়ার দিকে সিলিং-এর কানাঘুসো উঠতেই বহু জমির মালিকরা পরিবার ভাগ করে ফেলেছিল। কৃষি আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যও পরিবার ভাগ করে জমি চারিয়ে রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে ধানের লেভি এড়াবার জন্যও পৃথক পরিবার দেখিয়ে জমি চারিয়ে ফেলা হয়েছে। হালফিল তিন বা পাঁচ একর জমির ভূমিরাজস্ব মকুব করার কথা উঠতেও অপেক্ষাকৃত কম জমির মালিকরাও যতদূর সম্ভব জমির মালিকানা চারিয়ে নিয়েছে। একই পরিবারভুক্ত হলেও পঞ্চায়েত কর পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হয়, রেশন কার্ডও পৃথক করা আছে। ভূমিরাজস্বও ঐ নামে নামে দেওয়া হয়। এক একটা বাড়িতে দুই চারটি সেনসাসের নম্বর লই তো বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবার বলতেই যে স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে থাকতেই হবে, তাতো নয়। একজন একটা পরিবারের সিলিং ভোগ করতে পারে। আবার স্বামীর থেকে

অজিত কুমার বসু

স্ত্রী বা বাবা মার থেকে ছেলে এমনকি নাবালক ছেলেও যে পৃথক থাকতে পারে না, তাও নয়। পরিবারভিত্তিক সিলিং করলে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়ার যে উদ্দেশ্য, তা বহুলাংশেই ব্যর্থ হবে। নাবালক বা নাবালিকার ও বিবাহিতার নামে কোন জমি রাখা বেআইনী করলে অবশ্য এ ফাঁকি অনেকটাই বন্ধ করা যায়। কিন্তু তাই কি সম্ভব? তাছাড়া, ভূমিরাজস্ব বিভাগে একেইতো অনাচারের শেষনেই তার উপর যতই যতই আইনের জটিলতা সৃষ্টি করা হবে ততই অনাচারই বাড়বে, যার উদ্দেশ্যই তারাই বানচাল করে দেবে, যেমন বর্তমান আইনেই দিয়েছে। আর, এই কারণেই মালিকদের আর এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই।

সুতরাং ব্যক্তিভিত্তিক করে সিলিং কমিয়ে দিলেই সব জটিলতারই অবসান হবে এবং ফাঁকিও আর কেউ দিতে পারবে না। অর্থাৎ, পরিবারের সিলিং যে ১০।১৮ একর করার প্রস্তাব হয়েছে তা না করে মাথা প্রতি ৩ ৪ একর ও কোন ক্ষেত্রেই কোন পরিবারের ১০।১৮ একরের বেশী হবে না তা সে পরিবারের যত বেশী পোষ্য থাকনা কেন।

অবশ্য সিলিং-এর নীতি মেনে নিলেও একথা উঠতে পারে যে, কলকারখানা বা ব্যবসা বাণিজ্যের মালিকানার ও চাকরীর বা ব্যবসায়ের আয়ের কোন সীমা থাকবে না; সেখানে পরিবার বা ব্যক্তির বিচার করা হবে না, একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি এমন কি স্বামী-স্ত্রীরও থাচ্ছে।

চলতি আইনে শ্রমজীবী চাষীতে দরের চাষী বলেই কোন কিছু নেই। রায়ত বা মালিকেরাই চাষী বলে সুবিধামত পরিগণিত হয়। কিন্তু পরশ্রম নির্ভর জমির মালিকদের হাত থেকে নিয়ে শ্রমজীবী প্রকৃত চাষীদের হাতে জমি দিতে হলে, প্রকৃত শ্রমজীবী চাষী কারা তা আইনের সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অতঃপর আর কোন অচাষী কোনরূপেই জমি না কিনতে পারে তারও সুস্পষ্ট বিধান দরকার।

চলতি আইনেতো বটেই, প্রস্তাবিত আইনেও যে কোন অচাষী জমি কিনতে পারে। এদের হাতে সাদা কালো সব টাকাই বেশী। দর চড়িয়ে দিয়ে এরা জমি কিনে নেয়, প্রকৃত চাষীরা কিনতে পারে না। এই অচাষীদের হাতে এখন যা জমি আছে তা নাহয় থাক, কিন্তু আর

না বাড়াতে পারে তার জন্য বিধিমত সরাসরি উত্তরাধিকার ছাড়া কোন জমি কিনতে বা দানপত্রে বা কোনোও রূপেই নিতে পারবে না, এমন আইন করতেই ব। জমি বিক্রী দানপত্র বা অন্য কোনরূপে হস্তান্তর প্রকৃত ছাড়া আর কাউকে করা যাবে না এবং এরূপ হস্তান্তর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, আইনে এমনও বিধান থাকা দরকার।

আইনে আর একটা সুস্পষ্ট বিধান থাকা দরকার। জমির স্বত্ব ভোগ করতে হলেই সেই এলাকায় সপরিবার পাকাপাকি বসবাস করতে হবে। বাইরে বাস করলে জমি ছেড়ে দিতে হবে।

উত্তরাধিকার আইনের আমূল সংশোধন করে, কেবল মাত্র সন্তানরাই উত্তরাধিকার পাবে দূর সম্পর্কের কেউ পাবেনা, এমন ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। বর্তমান আইনে "কলমী শাকের ঝড়" এর মত উত্তরাধিকারের জট পাকিয়ে আছে। বংশে বাতি দিতে না থাকলেও উত্তরাধিকারী জুটে যায় ঠিকই। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

বস্তুত: সিলিং না করেও এই তিনটি বিধানেই ভূমি মালিকানা সমস্যার অনেকটাই আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। এতে চাষের জমির দাম অনেক পড়ে যাবে। তখন প্রকৃত চাষীরা নিজেরাই অনেকে জমি কিনে নিতে পারবে। তাহলে সরকারের জমি বিলির দায় দায়িত্বও অনেকটাই কমে যাবে।

সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত জমির বাটোয়ারার উদ্দেশ্যেই একটা সর্ব্বোচ্চ আয়ের গড় ধরেই তো সিলিং। এই আয়ের দিক দিয়ে জমির মালিকদের শ্রেণী ভাগ করা একান্তই অপরিহার্য। গ্রামে বসবাসকারী জমির মালিকদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী আছে। (১) কৃষি বা জমি জীবিকার প্রধান অবলম্বন নয়, জমি তাদের বাড়তি টাকা লগ্নী করার নিরাপদ আশ্রয়। এরাই জমির দর বাড়িয়ে কিনে নেয়। (২) নিজেরা হাল কোদাল ধরে না বটে, তবে চাষের কাজের তদ্বির তদারকও করে অনেকেই। (৩) নিজেরাই হাল কোদাল ধরে চাষ আবাদ করে। উল্লেখ্য, বিশেষ করে এই ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর মালিকরাই জমির উন্নতি ও ফলন বৃদ্ধিতে যত্নশীল।

প্রথমত:, বাহিরের আয়ের মালিকদের ক্ষেত্রে সিলিং-এর একই চালও আইন থাকা আদৌ উচিত নয়। বাইরের আয়ের অনুপাতেই তাদের সিলিং করা উচিত।

এই নীতি মেনে নিলেই—প্রত্যেক মালিকদের রেকর্ড রাখতে হবে। কার কত জমি বাড়লো বা কমল, বাইরের আয় হল কি হল না এবং কত হল সেই সবের রেকর্ড। যার যখনই বাইরের আয় যে পরিমাণে বাড়বে তার সিলিংও তখনই সেই অনুপাতেই কমে যাবে আপনা থেকে—তাকে সেই অনুপাতে জমি ছেড়ে দিতে হবে। এ ভারটা পঞ্চায়তকে দিতে হবে। নাবালক-নাবালিকা পোষ্যের নামেও ঐ সব সম্পত্তি সীমাহীনভাবে থাকতে পারবে এবং লভ্যাংশ বা বেতন সীমাহীন ভাবে পাবার অধিকারী হবে অথচ কৃষি জমির ব্যাপারেই যত আঁটিশুঁটি, জমি কত কম করা যায় তাই নিয়েই আদর্শের সোরগোল।

আর একটা কথা উঠেছে। কৃষি জীবীর তুলনায় উপরোক্ত অকৃষিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। সেই অল্প সংখ্যক লোকের সব রকম সুবিধা অব্যাহত রেখে কয়েক গুণ বেশী কৃষিজীবীদের উপরই যে পড়া হয়েছে, এটাই বা কেমন বিচার এবং কতটাই বা গণতন্ত্র ও নীতি সম্মত?

এ কথাটা কিন্তু বিভ্রান্তিকর। সব কৃষিজীবীর উপরতো নয়। প্রথমত: অধিক জমির মালিকদের সংখ্যা উপরোক্ত অকৃষিজীবীদের চেয়ে কম বেশী নয়। দ্বিতীয়ত:, অধিক সংখ্যক কৃষিজীবীদের কল্যাণকল্পেই এ ব্যবস্থা। কাজেই এটা সম্পূর্ণই গণতন্ত্রসম্মত।

সেচ ও অসেচ এলাকার মধ্যে ফারাক করার ব্যাপারে যে বাদ প্রতিবাদ উঠেছে, সামগ্রিক ভাবে দেখলে সেটা অনেকটাই বাড়াবাড়ি ও অলীক। জমির মধ্যে নদীসেচ এলাকার পরিমাণই এ দেশে বেশী। কিন্তু তাও দেশের মোট জমির শতকরা ৫।৬ ভাগও হবে না। আবার, এই নদীসেচ সাধারণত: খরিফ বা বর্ষাকালীন ফসলই বেশী পায়। যেখানে দোফসলায় ও রবি ফসলে সেচ সবচেয়ে বেশী দরকার হয় সে ক্ষেত্রে নদীসেচের অবদান আরও অনেক কম। গ্রীষ্মকালীন ফসলের ক্ষেত্রে তো তা গণ্যই নয়। তবুও নদীসেচের ফলে অজন্মা হয় না (স্থানে স্থানে অবশ্য অতি জলে হেজে যায়) এবং ফলনটাও বাড়ে, যা অসেচ এলাকায় সম্পূর্ণই অনিশ্চিত। তাছাড়া, নদীসেচ সম্পূর্ণই সরকারী ব্যবস্থা। সুতরাং সুবিচারের দিক থেকে নদীসেচ ও অসেচ এলাকার মধ্যে নিশ্চয়ই সিলিং এ ফারাক রাখা উচিত, অন্তত: শতকরা ২৬% ভাগ।

কিন্তু নলকূপ বা পাম্পের সাহায্যে নদী থেকে তোলা জলের সেচে বছরে ২ টা ফসল তো হয়ই, সময়ে সেচ পায় বলে ফলনও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। কাজেই এ ক্ষেত্রে অসেচ এলাকার তুলনায় সিলিং অন্তত: অর্দ্ধেক হওয়া উচিত। তাছাড়া সারা দেশের মানুষের পয়সাতেই সরকার এ সব ব্যবস্থা যখন করে তখন

# কলকাতার জল ও ময়লা নিষ্কাশন সমস্যা

মাণিক ব্যানার্জী

মরা খাল পুনরুদ্ধারের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে

বছরের যে কোনও সময় বৃষ্টি হলেই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তাঘাটে জল জমে থাকা যেন এক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সে অল্প বৃষ্টিই হোক বা বেশী বৃষ্টিই হোক। কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত জমে থাকে ঐ জল। এ থেকেই শহরের বর্তমান জল নিকাশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হতে পারে। তাই শহরের সব জায়গা থেকে বৃষ্টির জল বা ময়লা জল স্বাভাবিকভাবে নদীতে গিয়ে পড়তে পারে না। গঙ্গায় বড় বাণ এলে শহরের বেশ কিছু অঞ্চল জলপ্লাবিত হয়ে যায়। আজ থেকে আশী বছরেরও আগে এ শহরের বর্তমান জল নিকাশী ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছিল। তখন কলকাতার লোক সংখ্যা ছিল ১০ লাখের মত। ঘন্টায় ১/৪ ইঞ্চ পর্যন্ত বৃষ্টির জল যাতে এই ভূগর্ভস্থ নালা দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে সেই অনুপাতেই ঐ জল নিষ্কাশন প্রণালী তৈরী হয়েছিল। বৃষ্টির জল ছাড়াও মল এবং শহরের অন্যান্য ময়লাও এই একই নালা দিয়ে নিষ্কাশিত হয়।
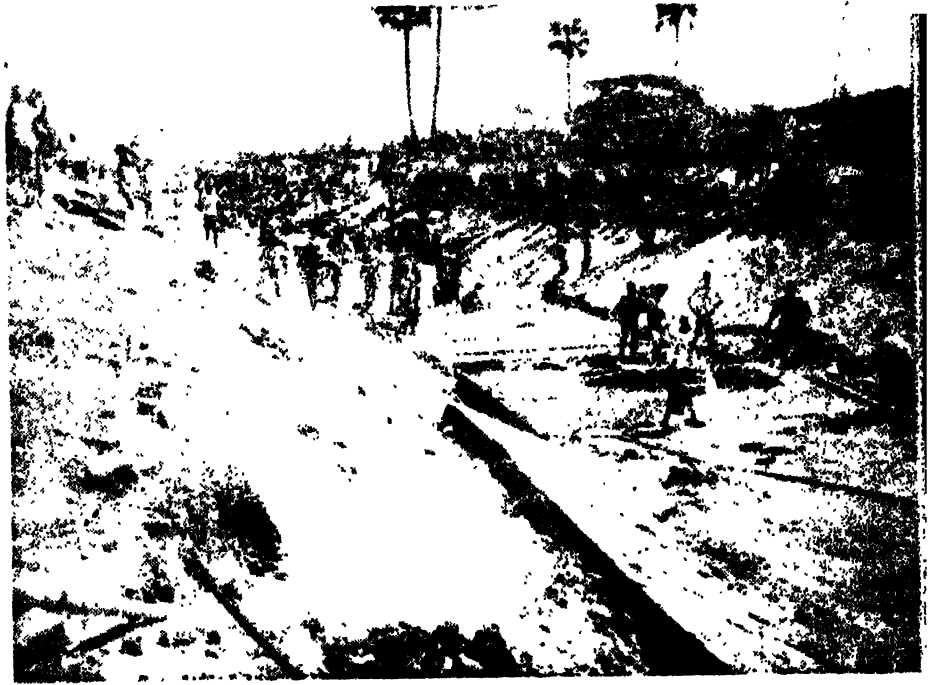
আশী বছর আগে শহর কলকাতার মাত্র এক তৃতীয়াংশ জায়গায় এই সব ভূগর্ভস্থ নালা তৈরী করা হয়েছিল এবং এখনও এই জল নিকাশন প্রণালীর আয়তন একই আছে। বর্তমান শহরের জল নিকাশী ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদিকে উত্তর ও মধ্য কলকাতা, যাকে বলা হয়েছে 'টাউন সিসটেম', আর একদিকে রয়েছে দক্ষিণ কলকাতা, যাকে বলা হয়েছে 'সুবার্বন সিসটেম'; এর বাইরের জল নিকাশী প্রণালী দিয়ে জল বেলেঘাটা ও মাণিকতলার মধ্যবর্তী পাম্পিং ষ্টেশনে পৌঁছায়। সেখান থেকে ঐ জল পাম্প করে পামার বাজার আউটফল পাম্পিং ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। আউটফল বলতে সাধারণত: বোঝায় শহরের অপ্রয়োজনীয় জল ও ময়লা যেখানে শহরের বাইরে খাল বা নালার সাহায্যে কোন বড় নদী বা সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। সুবার্বন সিসটেম—এর নিষ্কাশিত জল মোমিনপুর, কুলিয়াট্যাংরা পাগলাডাঙ্গা ও তপসীয়ার মধ্যবর্তী পাম্পিং ষ্টেশন হয়ে বালিগঞ্জ আউটফল পাম্পিং ষ্টেশন থেকে বৃষ্টির জল ও অন্যান্য ময়লা গ্রীষ্মকালে কানাকাটা ড্রাই ওয়েদার ফ্লো চ্যানেল ও বর্ষাকালে কানাকাটা ষ্টর্ম ওয়াটার চ্যানেল দিয়ে কলকাতার [illegible] মাইল দূরে সুন্দরবন বদ্বীপ এলাকায় কুলটির কুলটি নদীতে পড়ে। এই খাল দুটির সমান্তরাল আরও দুটি খাল বয়ে চলেছে। সেগুলির [illegible], ভাঙ্গড়কাটা খাল ও বাগজোলা খাল। এই দুটি খালের সাহায্যে বরানগর, কাশিপুর, [illegible] প্রভৃতি এলাকার জল [illegible] নিষ্কাশিত হয়। এই খাল দুটিও কুলটি নদীতে গিয়ে মিশেছে।

এদিকে বঙ্গোপসাগরের মোহনার নিকটবর্তী হওয়ায় কুলটি নদীতে জোয়ার ভাঁটা বেশ জোর হয়। [illegible] ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র [illegible] ঘন্টার জন্য কুলটি নদীতে ঐ সব খাল থেকে জল এসে পড়তে পারে। দিনের বাকী সময়ে খাল আর নদীর সংযোগস্থলে স্লুইস গেটের

য়। খালের মধ্যে জল ঢোকা রাখতে হয়। এর উপর কলকাতা কুলটি গঙ্গা অবধী ২১ মাইল এলা- খালগুলির দুধারে নালা কেটে লে চাষীরা তাদের জমির তিক্ত জল বের করে দেয়। বান কলকাতা থেকে প্রবাহিত জল ও আবার পেছন দিকে সরে আসতে, ফলে ঐ জল নিকাশিত হতে দেরী হয়।

ভূগর্ভস্থ যে নালা দিয়ে জল নিকাশন হয়, শহরের মল ও অন্যান্য ময়লা নিকাশনের জন্য ঐ একই নালা ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে ঐ সব স্রোতের প্রাবল্যে ময়লা ও পলি জমে জমে নালার বেশ কিছুটা অংশ ভরে যায়। ফলে ঐ সব নালার জল নিকাশন ক্ষমতাও কমে গেছে অনেক।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে জলের মেইন বসানোর কাজ চলছে।

... ওয়ার্কিং

আগামী ... 

আর শহরের ময়লা নিষ্কাশন করার জন্য এর যে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরী করেছিল তা সম্প্রসারণতো হয়ইনি, এমনকি ঠিকমত সংস্কারও হয়নি। আগের তুলনায় শহরের লোকসংখ্যা ও আয়তন বেড়েছে অনেক। কিন্তু জল ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা বাড়ার পরিবর্তে কমে গিয়ে এখন একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছে।

কলকাতা শহর উন্নয়নের জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ.) তৈরী হলে পর এই সি. এম. ডি. এ. শহরের বর্তমান জল ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক রচিত মাষ্টার প্ল্যান ফর ওয়াটার সাপ্লাই, ড্রেনেজ এণ্ড স্যুয়ারেজ ফর ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিষ্ট্রিক্ট রচনা করলেন।

এর মূল পরিকল্পনাগুলি হল :—

বৃষ্টির জল বহন করার জন্য বর্তমানে যে সব ভূগর্ভস্থ নালা ও অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে তার উন্নতি সাধন ও সম্প্রসারণ

...শহরের যে সমস্ত এলাকায় ভূগর্ভস্থ... নেই, সেখানে জল ও ময়লা... নালা ও তার শাখা প্রশাখা স্থাপন...

(ক) আউটফলগুলির ক্ষমতা বাড়ানোর... প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণের... করা।

(গ) শহরের জল নিকাশী বিভিন্ন ...পাম্পিং ষ্টেশনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও ...পাম্পিং ষ্টেশন বসান।

(ঘ) শহরের বৃষ্টির জলের কিছু ...সুবিধাজনক জায়গায় হুগলী নদীতে ...নিকাশের ব্যবস্থা।

ভূগর্ভস্থ নালার মধ্যে বর্তমানে যে সব ...নিকাশী নালা বসান হচ্ছে তার মধ্যে ...দিয়ে শুধু বৃষ্টির জলই যাবে। মল ও ...নানা ময়লার জন্য আবার আলাদা নালা ...বসান হচ্ছে। পুরোন নালায় যেখানে ...বৃষ্টির জল আর ময়লা একই সঙ্গে নিষ্কাশিত ...হত—তার মধ্যে যেখানে সম্ভব হচ্ছে ...সেই সব এলাকায় ময়লার জন্য ভিন্ন নালা ...বসান হচ্ছে। এই সব নালা প্রয়োজন ...৭২ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ জল নিকাশী নালার কাজ যে সব জায়গায় সম্প্রসারিত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টালিগঞ্জ, যাদবপুর এলাকা। এ পর্যন্ত বৃষ্টির জল ও ময়লা নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। টালিগঞ্জ, যাদবপুর এলাকা বলতে সেই সব এলাকা বোঝাচ্ছে বিভিন্ন দিক দিয়ে যার প্রান্ত সীমা হল বজবজ রেলওয়ে লাইন, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড ও সুভাষ মল্লিক রোড। এর জন্য খরচ হিসাবে ধরা হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা।

জল নিকাশী অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি হল—ট্যাঙ্গ রোড আর হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট এলাকায় বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ নালা দিয়ে

টালার থেকে আসা জলের পাইপের উপর কংক্রীটের আস্তরণ দেওয়া হচ্ছে।
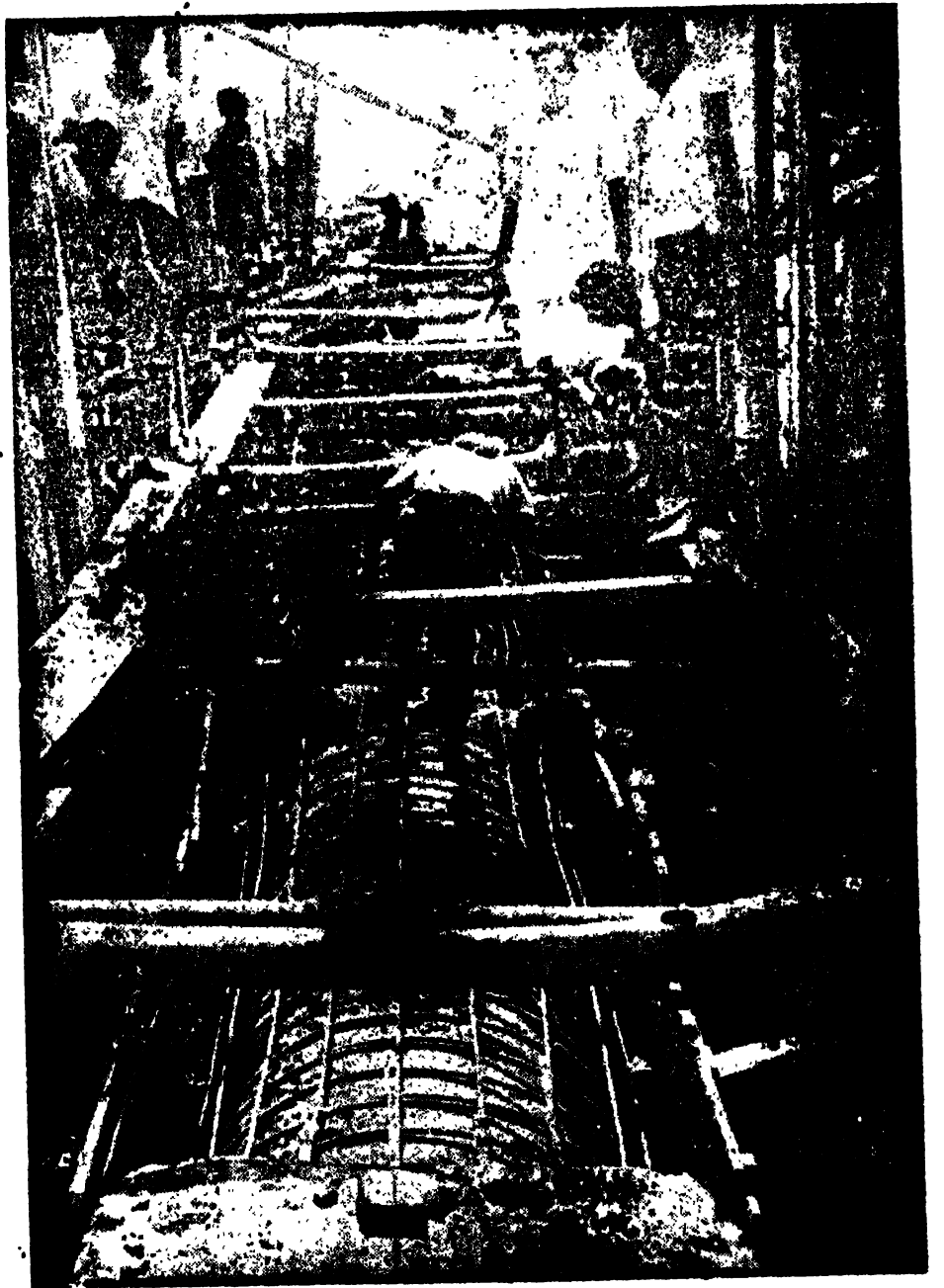
সরাসরি গিয়ে পড়বে হুগলী নদীতে। যাদবপুর কসবা অঞ্চলের জল পঞ্চান্ন গ্রাম খালের মধ্য দিয়ে যাবে ক্যালকাটা ষ্টর্ম ওয়াটার চ্যানেল বা খাল—১। টালিগঞ্জ এলাকার জল টালি নালার মধ্য দিয়ে এসে হুগলী নদীতে পড়বে। এর জন্য টালি নালা ও আদি গঙ্গার সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলেছে। অনুরূপ ভাবে মানিকতলা, কাশিপুর এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য সারকুলার ক্যানেলের সংস্কার করা হয়েছে। এই সারকুলার ক্যানেলও গিয়ে মিশেছে হুগলী নদীতে। অন্যান্য কিছু কিছু জায়গাতেও যেখানে সুবিধা রয়েছে—যেখানে বৃষ্টির জলকে সরাসরি হুগলী নদীতে ফেলবার ব্যবস্থা করা হবে।

আউটফল প্রজেক্ট বা ভূগর্ভস্থ নালা বা নর্দমা থেকে জল বাইরে যাবার পথের সংস্কার ও সম্প্রসারণের যে সমস্ত পরিকল্পনা রয়েছে তার মধ্যে আছে কলকাতা থেকে কুলটি অবধি ড্রাই ওয়েদার চ্যানেলএর সম্প্রসারণ করা ও পাড় বাঁধানো। এর কাজ এগিয়ে চলেছে। ক্যালকাটা স্রেন ওয়াটার চ্যানেলেও নতুন করে খোড়ার কাজ প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণপুর, ভাঙ্গরকাটা ও বাগজোলা খালের সংস্কার ও পরিবর্তন করার কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে যাতে কাছাকাছি এলাকার নিষ্কাশিত জল ও ময়লা এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এবং কৃষ্ণপুর, ভাঙ্গরকাটা খালকে নৌ চলাচলের উপযোগী করা যায়।

জল নিকাশনের অন্যান্য পরিকল্পনার তুলনায় বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনের সংস্কার ও ক্ষমতা বাড়ানর কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী এগিয়েছে বলা যায়। শহরের মধ্যবর্তী পাম্পিং ষ্টেশনগুলির মধ্যে তপসীয়া পাম্পিং ষ্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। অন্যান্য আরও যেসব মধ্যবর্তী পাম্পিং ষ্টেশনের সংস্কার করা হচ্ছে সেগুল হল মানিকতলা পাগলডাঙ্গা, কুলিয়া ট্যাংরা ও বেলগাছিয়া।

আউটফল পাম্পিং ষ্টেশনের ক্ষমতা আগের তুলনায় দ্বিগুণ করা হচ্ছে। এর ক্ষমতা ছিল ঘন্টায় ১৩ মিলি[illegible] গ্যালন জল পাম্প করা। এছাড়া টালি[illegible] ও দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার ভূগর্ভস্থ না[illegible] জলকে পাঞ্চান্ন গ্রাম খালে ফেলবার জ[illegible] চৌবাগ ও উত্তরবাগ এ দুটি পাম্পিং ষ্টে[illegible] বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমান কলকাতা শহরের প্রা[illegible] অর্দ্ধেক এলাকার মল নিষ্কাশনের [illegible] ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া প্রধানতঃ শহ[illegible] বস্তী ও অন্যান্য কিছু কিছু এলাকায় মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজারেরও বে[illegible] অস্বাস্থ্যকর খাটা পায়খানা রয়েছে। জায়গার মিশ্রিত-ময়লা পরিষ্কার করা বিরাট সমস্যা। শহরের যেসব জায়[illegible] ভূগর্ভস্থ মল নিষ্কাশন প্রণালী নেই, [illegible] সব জায়গায় এই প্রণালী স্থাপন পরিকল্পনা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ [illegible] জায়গায় কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এ[illegible] বাকী জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে।

টালিগঞ্জ এলাকাতেও এই ভূগর্ভস্থ নিকাশন প্রণালী বা নালা নির্মাণের পাঁচ কোটি টাকার এক ব্যাপক পরিক[illegible] নেওয়া হয়েছে। এটা আগে বলা কোটি টাকার ভূগর্ভস্থ জল নিকাশী ব্যব[illegible] হতে ভিন্ন। কলকাতার বিভিন্ন ব[illegible] এলাকায় যেখানে খাটা পায়খানা রয়ে[illegible] সেখানে খাটা পায়খানা তুলে দিয়ে সে[illegible] ট্যাঙ্ক সহ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব[illegible] হচ্ছে। এটা অবশ্য বস্তী উন্নয়ন কার্য সূচীর অন্যতম হিসাবে কার্যকরী হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ নালা দিয়ে ময়লা যাতে এক জায়গায় জমে পরিত্যক্ত জলটা বেরিয়ে যেতে পারে জন্যে কলকাতার অদূরে বানতলায় এ[illegible] সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক বসান হয়েছে।

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

বৃহত্তর কলকাতার কোন এক স্থানে 'সিউয়ার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

# ভারতীয় কৃষির নবদিগন্ত

**মহাদেব পাকড়াশী**

ভারতীয় কৃষির গত কয়েক বছরের পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হল, এর বলিষ্ঠ অগ্রগতি। এর ফলে কৃষির ক্ষেত্রে একটা সাবলীলতার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে একথা অনস্বীকার্য্য এবং এ সাবলীলতা যে সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী হবে না এ কথাও ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে।

এ বছর ভারতীয় গণতন্ত্রের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কৃষি পর্য্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও বটে। কারণ স্বাধীনতাত্তোর যুগে, বিশেষ করে, ৬০ দশকের পরবর্তী বছরগুলিতে যে সাফল্যের সূচনা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। বিস্তৃতির মধ্যে না গিয়েও কয়েকটি বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। প্রথমেই সামগ্রিকভাবে কৃষিতে উৎপাদনের কথা ধরা যাক। স্বাধীনতাত্তোর প্রথম ২।৩ বছরে কৃষি উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের চাইতে প্রায় ৮২ শতাংশ কম ছিল, বা অন্যভাবে বলতে গেলে, ১৯৪৯-৫০ সালের কৃষি উৎপাদন সূচক ১০০ (মানক) ধরলে, দেখা যায় ১৯৬৮-৬৯ সালে সেই সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে তা হয়েছে ১৮২.২। চতুর্থ যোজনায় ৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম বর্ষে এই হার দাঁড়ায় ৬.৭ শতাংশ ও দ্বিতীয় বছরে ৭.১ শতাংশ। কৃষির ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার ফলে চতুর্থ যোজনায় স্থিরীকৃত ৫ শতাংশ কৃষি উৎপাদন হার সীমায় পৌঁছানো মোটেই কল্পনা বিলাস হবে না।

## খাদ্য উৎপাদন

খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্যোৎপাদন হয়েছে ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। স্বাধীনতাত্তোর ভারতে (১৯৪৭-৫০) সালের হিসাবে বর্তমান-কালের উৎপাদন দুই গুণের বেশী হয়েছে। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণও বেড়েছে, তবে ৬০ দশকের পর থেকে নতুন ভূমি সংযোজনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির চাইতেও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। গত বছরের খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার শতাংশে ধরলে দাঁড়ায় ৮.৪ ভাগ। এ পর্যন্ত এটিই শীর্ষ উৎপাদন। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস বলতে শুধুমাত্র কৃষি কাজে যান্ত্রিকীকরণ ও উন্নত মানের সার বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি প্রয়োগই বোঝায় না, এর সঙ্গে চাষীর বাণিজ্যিক ও সহযোগের দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও বোঝায়। তাই বৈজ্ঞানিক চাষবাস হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের অগ্রগতির মূলে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল শস্য বীজ। এই এই বীজ প্রথম আমদানি করা হয় তাইওয়ান ও মেক্সিকো থেকে। বর্তমানে আমদানিকৃত বীজ ও দেশী বীজের সংমিশ্রণে তৈরী সংকর বীজ চাষ শুরু হয়েছে। এই বীজের প্রয়োগে আশাতীত সুফল ফলেছে প্রধানতঃ ধান ও গম চাষে। আশা করা যায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সম্প্রসারণের ফলে শীঘ্রই অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ও বিভিন্ন রাজ্যে স্থাপিত কৃষি অনুসন্ধান সমিতিগুলির উদ্যোগে উন্নত মানের বীজ উদ্ভব করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় উত্তর প্রদেশের তরাই বীজ উৎপাদক খামার ও নয়াদিল্লীস্থ পুসা কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রের।

## বহু ফসল চাষ

বর্তমান কৃষির আর একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন বহু ফসল চাষের প্রবণতা। বহু ফসল চাষে জমির উর্বরতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তার উর্বরতা শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য ফসল ভেদে বিভিন্ন ধরণের সারের প্রয়োগ, জলের সুষম ব্যবহার কীটনাশক এবং কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায় বলা যায় ভারতীয় কৃষি ক্রমশই বৈজ্ঞানিক চাষের দিকে ঝুঁকছে।

পূর্বে আমাদের কৃষি নির্ভর গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতি বছর বহু কৃষি শ্রমিক নেহাৎ রুজি রোজগারের ধান্দায় শহরে কাজ নিতে আসতে বাধ্য হত, এমন কি এখনও এ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া শহর

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতের
প্রতিরক্ষা ও
উন্নয়নে
অংশ গ্রহণ করুন
সেই সঙ্গে
আয় করুন
৭১/৪%
সুদ
৫ বছরের
ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন জমার ওপর
৩ বছরের
জমায় ... ৭%
১ বছরের
জমায় ... ৬%
এই সঙ্গে অন্যান্য করমুক্ত সিকিউরিটী ও ডিপজিটের ওপর
প্রাপ্য সুদ নিয়ে বছরে মোট ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদের ওপর
আয়কর লাগবে না।
জাতীয়
সঞ্চয়
সংস্থা
আপনার ডাকঘর কিংবা আপনার জেলার জাতীয় সঞ্চয়
সংক্রান্ত জেলা সংগঠকের কাছে খোঁজ করুন।

# গ্রামীন উন্নয়ন

**লক্ষ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি মানুষকে এখনও দারিদ্র্য আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। মান্ধাতার আমলের চাষবাস, যানবাহনের এবং রাস্তাঘাটের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা এই দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে বিরাট বাধা। গ্রামীন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা—শ্রী ভোলানাথ দাস এই পরিকল্পনা সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।**

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে, অখণ্ড গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনাই হল গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার একমাত্র পন্থা। বহুদিন ধরেই গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিচার বিবেচনা চলেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রধান সমস্যা হল। গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধি কি হবে ও সেই পরিকল্পনাকে কি ভাবে ব্লক, জেলা ও রাজ্য ভিত্তিক করে ও সর্বশেষে জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাওয়ান যাবে।

কোন পরিকল্পনা যদি কোন স্থানের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করে তার ভিত্তিতে গঠিত হয় তাহলে উহা নিশ্চয়ই বাস্তবিক ও গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা হবে। এই কারণেই গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনার গোড়ার কথা হবে সেই স্থানের প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তার সমস্যাগুলি নির্ণয় করা আর সেখানে পাওয়া যায় এমন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি। এই সমস্যা ও তথ্যের সম্বন্ধে বিশ্লেষণই হবে গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি।

## গ্রামের সমস্যা

ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা হল ৫৬৭৩৫১ আর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোকই এদেশে গ্রামে বাস করে। শতকরা ৭০ ভাগের ও অধিক লোকের জীবিকা এখানে কৃষি নির্ভর। কৃষিকার্য্যের উপর এত বেশী নির্ভরশীলতাই এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বহুকাল ধরে চলে আসা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আজ গ্রামীণ অর্থনীতিকে ভঙ্গুর অবস্থায় এনে ফেলেছে। এদেশে কৃষি উৎপাদনের হার আন্তর্রাষ্ট্রীয় মানের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাছাড়া চাষবাস থেকে সারা বছরের কর্মসংস্থান হয় না। কোন এক গ্রামে সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বছরের মধ্যে মাত্র ১৬৪ দিন সেই গ্রামের কর্মক্ষম লোকেরা কাজ পেয়েছে।

নিম্নমানের উৎপাদন ও আংশিক বেকারত্বের ফলে আয়ও খুব কম হয়, চাষবাসে বিনিয়োগ করার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিরক্ষরতা আর এক সমস্যা। এখনও গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭৬ ভাগ লোক নিরক্ষর। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চাষ পদ্ধতি তাদের বোঝান এক দুরূহ ব্যাপার। তাই কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণায় যে সর্বাধুনিক উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই বিষয়ে তারা মোটেই ওয়াকিবহাল নয়।

অনুরূপভাবে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা ও অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের অধিকাংশ গ্রামই অস্বাস্থ্যকর। পানীয় জল দূষিত; তাই নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাবও দেখা যায়।

গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অবস্থা ও ভাল নয়। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে)।

ভারতে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কিন্তু অতীতের কোন প্রচেষ্টাই সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত ছিল না। উন্নয়ন বিভাগগুলি নিজ নিজ মত অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না

রেখে কাজ করত। সেই জন্য কোন কোন সময় সেগুলো হয়ত আংশিক সাফল্য লাভও করেছিল। কিন্তু সামগ্রীক গ্রামীন উন্নয়নে সে রকম কোন রেখাপাত এই প্রচেষ্টাগুলি করতে পারেনি। এই ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল মোটামুটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও বিশেষ করে কৃষি অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তার উন্নতি প্রকল্পে বিশেষ সুপারিশের জন্য ১৯৬২ সালে রয়েল কমিশন (royal commission of agriculture) স্থাপন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক গলদ ছিল। কারণ এই কমিশন জমির রাজস্ব উত্তরাধিকার সত্বের বিষয় তাদের গবেষণার আওতায় আনে নি। অবশ্যি কমিশন ভারতীয় কৃষি উন্নয়নের পথে কি কি অবস্থা দেখা দিতে পারে তার সম্যক পর্য্যালোচনা করেছিল। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নের কিছু পরিকল্পনা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়েছিল জলসেচন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে। কিন্তু এই সময়ে (১৯২০-১৯৩৫) যে সমস্ত জলসেচনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ফসল রক্ষা করা। কিন্তু অধিক উৎপাদনের সহায়ার্থে নয়। বৃষ্টিপাত ঠিকমত না হলে এই সকল সেচন প্রণালী থেকে ফসলের সময় দুই বা তিনবার জলসেচন করা যেত। সুতরাং সেচন প্রণালীগুলি ঘন চাষের (intensive farming) পক্ষে অনুপযুক্ত। ফলে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের পক্ষে এই ধরণের এক তরফা প্রচেষ্টা একরকম সমস্যা হয়ে রয়েছে।

১৯৩৫ সালে ভারত সরকার এক আইন প্রনয়ণ করে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দুই কোটি টাকা সাহায্য বিভিন্ন প্রদেশকে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চল উন্নয়নের জন্য ফলে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা এক নতুন কর্মশক্তি লাভ করেছিল। গ্রাম সংস্কারের জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র খোলা হয়েছিল ও সেগুলিকে সংগঠিত করা হয়েছিল এবং উন্নয়ন কাজ ও পুরোদমে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াতে এ কাজ বিশেষ ভাবে বাধা পেল ও অগ্রসর রুদ্ধ হয়েগেল। যে সমস্ত গ্রাম উন্নয়নের কাজ সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল এবং একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নিতে যাচ্ছিল তা আবার সরকারী দপ্তরের হাতে রুটিন মাফিক শ্লথ গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। সেই একই ভাবে চলে আসছিল স্বাধীনতার আগ পর্য্যন্ত। পরে ১৯৫২ সালে এই উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির নতুন রূপ দেওয়া হল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development programme) মাধ্যমে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ঠিক দশ বছর আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হল অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান (Grow more food compaign)। এই আন্দোলনও গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টার সহায়ক হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। ফলে ১৯৪৩ সালে শুরু হল বাংলার দুর্ভিক্ষ। অধিক খাদ্য অভিযানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর তুলা ও পাটের চাষকে একেবারেই অবহেলা করা হয়েছিল। ফলে কৃষি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছিল এবং তুলা ও পাটের বিরাট ক্ষতি হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরেই খাদ্যশস্য সম্বন্ধীয় নীতি কমিটিকে (Foodgrain policy committee) অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান ও দেশের খাদ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করার ভার দেওয়া হয়। তাঁরা দেখলেন যে, ১৯৪৩ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে এই সকল প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া তুলা ও পাটের চাষ কম করে সেই জায়গায় খাদ্যশস্যের আশানুরূপ ফলন করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৪৯ সালে পুনরায় অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযানের এক প্রচেষ্টা করা হয়। যাতে ১৯৫২ সালের মধ্যে আমরা খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারি। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় অবশেষে এটিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলি ছাড়াও এই সময় কিছু কিছু স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও প্রতিনিধিমূলক গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টা ও লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্টারণ্ডাম এর ইয়ংম্যান ক্রীষ্টীয়ান এসোসিয়েশন এর প্রচেষ্টা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজীর সামান্য সঙ্গতি নিয়ে ও আন্তরিক গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা। অবশ্যি এই প্রচেষ্টাগুলির বিস্তৃতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ছিল আর একের সঙ্গে অন্যের কোন রূপ সম্পর্ক বা মিল ছিল না। পরিকল্পনাগুলির কোন সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি করা পথও ছিল না। নেতার নিজস্ব ভাবধারা ও দূরদর্শিতার উপর এই প্রচেষ্টাগুলির নির্ভরশীল ছিল।

অবশ্যি উপরোক্ত সব প্রচেষ্টাগুলিই তাদের যথেষ্ট দোষত্রুটি থাকা সত্বেও তারা আগামী দিনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে

যথেষ্ট সাহায্য করেছে ও করবে। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন যে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এটা ব্যাপক উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৫২ সালে গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার এক নতুন আকার ধারণ করল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development programme) মাধ্যমে। তখন থেকেই গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় গণসংগঠন শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা শুরু হল। পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য চাওয়া হল জনগণের সহায়তা; এই কাজের জন্য এ্যাডহক (Adhoc) উপপরিষদ গঠন করা হল। গ্রাম পর্য্যায়ে নাম হল বিকাশ মণ্ডল (vikas mondal), ব্লক পর্য্যায়ে নাম হল ব্লক উন্নয়ন কমিটি আর জেলা পর্য্যায়ে নাম হল জেলা উপদেষ্টা কমিটি। এদেরকে স্থানীয় সমস্যা বিবেচনা করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সুখ ও সুবিধা অবস্থার সুপারিশ করার ভার দেওয়া হল। এরপর পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাডহক সংস্থাগুলি ষ্ট্যাটুটারী সংস্থায় পরিবর্ত্তিত হল। গ্রাম, ব্লক ও জেলা অনুসারে এদের নাম হল গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ।

আমাদের দেশে আজ এক বিরাট আকারের গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের সকল গ্রামই ব্লক উন্নয়নের আওতায় এসেছে। বর্ত্তমানে ব্লকের মোট সংখ্যা হল ৫২৬৫, তারমধ্যে আদিবাসী উন্নয়ন ব্লক হল ৪৮৯।

এই ভাবে সুসংগঠিত সুপরিকল্পিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে সমবায় সমিতি আন্দোলনের যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হয়েছে। কৃষিকার্য্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চালান কৃষি ঋণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে বন্টন করা হয়। গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যাপারে সমবায় সমিতির সাফল্য।

## সমস্যা ও সম্ভাবনা :—

খাদ্য শস্য উৎপাদনে আমরা সাফল্য লাভ করেছি, কিন্তু তার সঙ্গে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও এসেছে। যে সকল জায়গায় অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ করা হয়েছে সেখানে চাষের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। ফলে শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে গেছে মজুরি বেড়েছে।

ভূমি সংস্কার (Land reform) হোল আর এক সমস্যা, যার সমাধান একান্ত প্রয়োজনীয়। উত্তরাধিকারী সত্বের অনিশ্চয়তা অবিলম্বে দূর না করলে কৃষি উৎপাদনে স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তা আসবে না। এই প্রসঙ্গে Wolf Ladejinsky বলেছেন "Any meaningful Land reform without a Land ceiling programme is a misnomer") ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে জমির উর্দ্ধতন সীমা বেধে না দিলে সেই সংস্কারের কোন অর্থ থাকে না। উর্দ্ধতন সীমা বেঁধে দিলে জমি স্বত্বাধিকার নিয়ে যে অসামঞ্জস্য আছে তা দূর হবে। এতদিন পর্য্যন্ত জমি বন্টনের ব্যাপারে কোন প্রকার ভেদ ছিল না। তাই, 'সবুজ বিপ্লবে' (Green revolution) যা লাভ হয়েছে তার বেশীর ভাগ অংশই যে সমস্ত ধনী চাষীদের হাতে বেশী জমি আছে তাদের কাছেই গেছে। সবুজ বিপ্লব 'কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ধনী চাষীকে আরও ধনী করেছে আর অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে এক বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। "সবুজ বিপ্লব" সবুজ বিপ্লব নয় ইহা প্রকৃত 'গ্রামের

হংকোচুন অধ্যাপক শ্রী নিবাসন Prof S. N. Srinivasan কারণ এখনও ধানে উৎপাদন মোটেই আশা ব্যঞ্জক নয়। সারা দেশে যা মোট চাল হয় তার শতকরা ৪৩ ভাগ মাত্র জন্ম' [illegible] বাঞ্চলে। মোট চাষের জমির আবার শতকরা ৪৫ ভাগ এই এলাকায় সবুজ বিপ্লবে ১৯৭০ অবধি দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় কোটি টন। তারমধ্যে কিন্তু চালের হিসাব মাত্র দশ লক্ষ টনের [illegible] শী এদিকের গমের পরিমাণ প্রায় আটাত্তর লক্ষ টনের মত-অথচ গমের জমির চেয়ে ধানের জমির পরিমাণ তিন গুণের বেশী।

এদিকে আবার দেখা যায় যে গ্রামের অধিকাংশই ছোট চাষী (২ হেক্টরেরও কম জমির মালিক) আর কৃষি শ্রমিক। এরাই যথাক্রমে শতকরা ৫২ ভাগ গ্রামীন জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু দেশে জমির স্বত্বাধিকার এমন যে, এই ছোট চাষীদের হাতে মোট জমির মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ রয়েছে। তাই বোঝা যাচ্ছে আজ যে সবুজ বিপ্লব এসেছে তাতে লাভবান হয়েছে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ধনী ও বড় চাষী আর দেশের অধিকাংশ চাষী ও গ্রামীন জনসাধারণ আজ যে আঁধারে ছিল সেই আঁধারেই আছে।

কিন্তু এই যে ধনী চাষীরা আরও ধনী হচ্ছে আর আয়ের সামঞ্জস্য গ্রামাঞ্চলে থাকছে না এর সমাধান কিন্তু বর্ত্তমান কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে করা মুস্কিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যাদের হাতে অর্থ আছে, অধিক জমি আছে তাদেরকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করা হচ্ছে। তাই এখন প্রয়োজন ছোট চাষীদের ক্ষমতাও অবস্থানুযায়ী যা

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

# আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

# ভেবে দেখুন

## কলকাতার জল নিষ্কাশন সমস্যা

১২ পৃষ্ঠার পর

কলকাতা পৌর এলাকা ছাড়াও ...লকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট—এর ...ন্যান্য এলাকাতেও জল ও ময়লা নিষ্কা-নের জন্য ভুগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ...া হচ্ছে একই সঙ্গে।

কলকাতা শহরে সুষ্ঠু জল ও ময়লা ...কাশী ব্যবস্থার জন্য এই যেসব কাজ ...রা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত জায়গায় ...র ফল পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। ...রণ এই ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজগুলি ...কটা আর একটার সঙ্গে জড়িত। যেমন ...ধু ভুগর্ভস্থ নালা হলেই হবে না—জল ময়লা যাতে নিকাশী খালে বা নালায় ...াছতে পারে তার জন্য দরকার মত ...ভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশন তৈরী বা সংস্কার ...রতে হবে। তারপর সেই জল ও ময়লা ...হরের এলাকা থেকে দূরে কোথাও ...য়ে যাওয়ার জন্য নিকাশী খাল বা ...লার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই সব ...জের কোন একটা বাদ থাকলেই এর ...ল পাওয়া যাবে না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এর সব প্রকল্পের ...াজ নতুন ভাবে শুরু হয়েছে ১৯৭০ ...লের শেষ দিকে।

সমগ্র ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ...ষ্ট্রিক্ট এলাকার জল ও ময়লা নিকাশী, ...র্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনার জন্য ধরা ...য়েছে ৪১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

অর্থের কোন অসুবিধা না থাকা... ...ত্ত্বও পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রকল্পের ...জ আরম্ভ হওয়া থেকে শেষ হওয়া ...্যন্ত সময়ের যে হিসাব ধরা হয়েছে কাজ ...টেই সেই অনুপাতে এগোচ্ছে না।

এই কারণ হিসাবে এই প্রকল্পের কার্য্যকরী সংস্থা সকলের বক্তব্য হল :-

কাজের জন্য ষ্টীল, সিমেন্ট, পাইপ লাইন, ইট প্রভৃতি জিনিষ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পাওয়া যাচ্ছে।

কাঁচামাল চলাচলের জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেলওয়ে ওয়াগান পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি জায়গা সময় মত পাওয়া যাচ্ছে না এবং ঐ জায়গা থেকে লোকজনদের সরাবার জন্যও বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে।

আরও একটা অসুবিধা হল কলকাতার মাটির গঠন। এখানকার মাটি এত নরম যে ভুগর্ভস্থ নালা বসানোর জন্য মাটি খুড়লেই পাড়গুলি ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তার জন্য কাজ করার সময় নালার দুই ধারে কাঠের পাটাতন দিয়ে বাধিয়ে রাখতে হয়। এছাড়া অল্প মাটি খুড়লেই জল বেরিয়ে আসতে থাকে। পাম্পের সাহায্যে ঐ জল বার করে দিয়ে তারপর কাজ করতে হয়। এ সবের জন্যও কাজের সময় লাগে বেশী।

তবে এই প্রকল্পের কাজ রূপায়ণে দেরী হলেও সি এম ডি এ. কলকাতা শহরের সুষ্ঠু স্বাস্থ্য সম্মত জল ও ময়লা নিকাশী প্রণালী রূপায়ণের যে পরিকল্পনা নিয়েছে ১৯৭৩ সালের বর্ষার সময় থেকে তার ফল মোটামুটি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## পঞ্চম পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার দৃষ্টিভঙ্গী

৫ পৃষ্ঠার পর

থেকে ৩৫ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ শক্তি ক্রয় করার প্রস্তাবটিও কার্য্যকর করবেন।

### অন্যান্য ক্ষেত্র :—

পঞ্চম পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী সংক্রান্ত নথিপত্রে অন্যান্য যে সব বিষয়ের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হোল পরিবহন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ শিক্ষা, গ্রামীণ গৃহ সমস্যা, শহর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন।

নথিপত্রে, বর্তমানে সড়ক তৈরীর নির্মানের উন্নতি এবং রাজ্যের জলপথে নৌ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক এবং ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক শিক্ষাদানের ওপর। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনার প্রতিও যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে এই হার বর্তমানের, বছরে ২.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে, পঞ্চম পরিকল্পনার শেষাশেষি এক শতাংশ করা যায়।

এই নথিপত্রে আরো প্রস্তাব করা হয়েছে যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রকল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ সুবিধার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। এই সঙ্গে শহর ও গ্রামাঞ্চলের জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধনের দিকেও লক্ষ্য রাখা হবে।

সবশেষে নথিপত্রে বলা হয় যে, এই ব্যাপক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য দূরদৃষ্টি এবং দক্ষ-প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। তার জন্য, প্রশিক্ষণ, গবেষণা কারিগরী অনুসন্ধান, প্রকল্প রচনা, ও তা কার্যকর করার কুশলতা প্রভৃতি অর্জনের জন্য পৃথকভাবে কিছু অর্থের সংস্থান রাখা উচিত।

## ভারতীয় কৃষির নবদিগন্ত

১৩ পৃষ্ঠার পর

... সুখকর হয়নি। ... বিপ্লবের ফলে সামাজিক ও অর্থ- ... সুরাহা হবে বলে ... যায়।

বহু ফসলি চাষ ক্রমে দেশের কৃষকদের ... হচ্ছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। পরিসংখ্যান ... দেখা যাচ্ছে, ১৯৭১-৭২ ... অর্থাৎ চতুর্থ যোজনার প্রথম বছরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী ১৮ মিলিয়ান হেক্টার জমিতে বহু ফসলি চাষ হয়েছে। এর ফলে এক বছরে একাধিকবার চাষ ও বেশী কর্মনিয়োগ সম্ভব।

এ পর্য্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই বিরাট দেশের কৃষি নির্ভর জনসাধারণের খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন মিটলেই অনেক সমস্যার সমাধান সহজতর হবে। কিন্তু গম বা ধান খাদ্য তালিকায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকলেও তালিকা সম্পূর্ণ হয় না। ডাল, চিনি, তেল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তার পরেই উঠে তুলার কথা। অস্বীকার করবার উপায় নেই, কোনটির উৎপাদনই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়নি, অথবা বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা অল্পই। অতএব এ সবের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে উন্নততর বীজের আবিষ্কার চাষের অন্তর্গত জমির সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কার্পাস উৎপাদন মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে কেন্দ্রিগত থাকলেও তুলা বীজের কিঞ্চিৎ মানোন্নয়ন ও পর্য্যাপ্ত সেচ সুবিধার ... একর না উ... পাঞ্জাব আজকাল যথেষ্ট এগিয়ে এসেছে। উন্নত মানের তুলা উপরোক্ত দুটি প্রদেশে উৎপন্ন করে পাঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত সাধারণ মানের তুলা চাষ করলে উন্নত দেশের ধরণের কাপাসের চাহিদাও ... পশ্চিমবাংলার অনাদৃত সুন্দরবন অঞ্চলেও এ ব্যাপারে আকর্ষণীয় ফল পা... গেছে।

দেখা যাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক চাষবাসের প্রভাবের ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এ... চাষীর অপেক্ষাকৃত বেশী আয় হয়েছে। এ আয় এখনও পুর্ণভাবে দেশের গ্রামীন জন-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। আশা করা যায়, কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা কৃষি আয়ের সুষম বণ্টনের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় কৃষি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

## গ্রামীন উন্নয়ন

১৭ পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজন তার শীঘ্র ব্যবস্থা করা তব চাষীদের বাধ্য করতে তাদের লভ্যাংশের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে ছোট চাষীদের সাহায্য করার জন্য। তাছাড়া জমির পুরোপুরি স্বত্বাধিকার ছোট ছোট চাষীদের দিতে হবে। যাতে করে তারা নিজের আপন জমি মনে করে অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করে। অবশ্যি অধুনা পরিবারভিত্তিক জমির উচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। তা না হলে 'গরিবী হটাও' স্লোগান ব্যর্থ হবে।

এছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি 'ইনফ্রাষ্ট্রাকচার' গড়ে তোলা দরকার। শস্যের বাজারগুলিকে (Market centres) ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতিটি গ্রামকে ভাল রাস্তার মাধ্যমে শস্যের বাজা-রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। অ... উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শ... রক্ষার গুদাম ব্যবস্থার যথেষ্ট সম্প্রসা... করা প্রয়োজন। এছাড়া ঋণ দেওয়া... জন্য যে সমস্ত সমিতি আছে সে সেগুলি... বিশেষ ভাবে সমন্বিত করতে হবে ...gricultural finance corpo...tion আজকাল ছোট ছোট চাষী... সাহায্য করে থাকে যাতে তারা কৃষি, দ... পশু ও মুরগী পালনের ... করতে পারে।

## আপনি জানেন কি ?

ভারত স...বের পূর্ত, গৃহ ও ন... উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী...দের গৃহ নির্মাণের জন্য এ বছর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে ৭ কোটি টাকা... ঋণ মঞ্জুর করেছেন।

যুব-শিল্পীদের বৃত্তিদান কর্মসূচী... কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সমাজ কল্যা... দপ্তর ১৯৭১-৭২ সালে ২৫ জন শিল্পী... বৃত্তি মঞ্জুর করেছেন। প্রতিটি বৃ... মূল্য ২৫০ টাকা। এটা দুই বছর পর্য... চলবে। যেসব শিল্পীরা বৃত্তি পে... তাদের মধ্যে আছেন, কুমারী নপুর ... চৌধুরী, কুমারী অনিমা দাস, কুমারী ... রায়, কুমারী বিনি দাসগুপ্তা এবং ... উৎপল চক্রবর্তী। সঙ্গীত, নৃত্য, নাট... অঙ্কন ও কারুশিল্প নিপুণতা প্রদর্শনের ... প্রতি বছর ১৮ থেকে ২৮ বছর ব... শিল্পীদের এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

# আত্মনির্ভরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সাপগাছি

কথায় আছে, 'দাঁড়া' আপনার পায়ে [illegible] সাপগাছি ঘুরে এলে আপনার [illegible]বে, এখানকার লোক সত্যিই এই [illegible]টিকে কি করে পুরোপুরি অর্থময় করে [illegible]তে হয়, তা জানে। এই সেদিন পর্যন্ত [illegible]গাছি ছিল একটা নোংরা দুর্গন্ধময় বস্তি [illegible]। এখানকার ৩০,০০০ লোকজনের [illegible] এখনও সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন [illegible]র মত মনে হ'ত। কিন্তু অ ভ আপনি [illegible] আসুন-দেখবেন, সেখানে পাকারাস্তা [illegible]ছে, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত হয়েছে। [illegible]াদী থেকে শুরু করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী অবধি [illegible]ার জন্য স্কুল হয়েছে, ইনডোর, আউট- [illegible] খেলাধুলার সব বন্দোবস্তই রয়েছে, [illegible]ই একটি পাঠাগার একটি কুটির শিল্প- [illegible] এবং নানারকম কারিগরী শিক্ষার [illegible]াবস্ত সম্বলিত একটা ট্রেনিং স্কুল [illegible]নের চেষ্টা চলছে এখানে। কিন্তু [illegible]সবের জন্য এখানকার লোকেরা সর- [illegible]ী দায়দাক্ষিণ্যের মুখ চেয়ে বসেছিল [illegible]

এখানকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরকম। [illegible]৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাৎ [illegible]নকার একদল তরুণ তরুণী মনে [illegible], না এমন করে চলে না। একটা কিছু [illegible]তেই হবে।' বেঙ্গল সার্ভিস সোসাই- [illegible] প্রতিষ্ঠা হ'ল। যার সদস্য এই তরুণ [illegible]ীরাই। আর এই সোসাইটির আদর্শ [illegible]ণা করা হ'ল "সেবাই ধর্ম।"

অত্যন্ত সামান্য ভাবে এই বি. এস. [illegible] সুরু করল। স্থানীয় জনসাধারণের [illegible]চ্ছাই তাদের একমাত্র সম্বল। তরুণ [illegible]ীদের উৎসাহ দেখে স্থানীয় এক [illegible]লোক একটা ঘর দিতে রাজী হলেন। এই ঘরেই সুরু হ'ল স্কুল। গোড়ায় শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বুনিয়াদী স্কুল। মাষ্টারমশাই, উদ্যোক্তা ঐ তরুণ তরুণীরাই। স্কুল হয় রবিবার বাদে সপ্তাহের ছ' দিন আর রবিবারে এই ঘরটিই হয়ে ওঠে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকেই এগিয়ে এলেন।

এইভাবে চারমাস কেটে গেল। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস নাগাৎ আরও ঘর জোগাড় হ'ল। স্কুলে বুনিয়াদী থেকে ক্লাস টু' অবধি পড়ার বন্দোবস্ত হ'ল। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সপ্তাহ একদিন থেকে তিনদিন করে খোলা হতে লাগল। এ সবের জন্য ইতিমধ্যে খরচও অনেক বেড়ে গেছে। আর নিজেদের পকেট থেকে দিয়ে এত খরচ মেটানো সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণের দান ও সাহায্য আদায়ের চেষ্টা চলতে লাগল পুরোদমে। তরুণ তরুণীদের এই উৎসাহের কথা জানতে পেরে কলকাতায় আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী শ্রীমতী হার্বার্ট গর্ডন এগিয়ে এলেন। বেঙ্গল সার্ভিস সোসাইটির ছেলেমেয়েরা মাত্র নয় মাসের মধ্যেই প্রায় ১,২১,০০০ টাকা তুললেন। স্কুল বাড়ী তৈরী সুরু হ'ল, খেলার মাঠ তৈরীও আরম্ভ হ'ল। এতে প্রায় ৬৮,০০০ হাজার টাকা খরচ পড়ল। বাকী টাকা দিয়ে কারিগরী বিদ্যালয়, কুটির শিল্পকেন্দ্র, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থাপনের কথা ভাবা হচ্ছে। স্কুলে এখন ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪০০ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলাপমেন্ট এর চোখ পড়ল সাপগাছির ওপর। সি. এম. ডি. এ. এলাকায় রাস্তাঘাট তৈরী, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা এবং পানীয় জল ইত্যাদির বন্দোবস্ত করার জন্য ১,২০,০০০ টাকার এক প্রকল্প মঞ্জুর করলেন। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাতে পুরোদমে ঘটতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে কুটির শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সব কাজকর্ম যাতে ঠিক ঠিক ভাবে হয়, সে উদ্দেশ্যে সি. এম. ডি. এ. এখানকার এই 'বেঙ্গল সার্ভিস সোসাইটিকেই'' সাপগাছি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প রূপায়ণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

# ওয়্যার হাউসিং করপোরেশন ও তার কাজকর্ম

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাঠে মাঠে কৃষক ফলায় শস্য, আর সেই শস্য সম্ভার নানা পথ অতিক্রম করে এসে ক্ষুধা মেটায় দেশের মানুষের, রক্ষা করে দেশের আর্থিক সঙ্গতি। কিন্তু কঠিন পরিশ্রম জাত সেই শস্য যদি যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায় তবে পর্যাপ্ত ফলনের সার্থকতা হয় বাধাগ্রস্ত। কারণ দেখা গেছে, আমাদের দেশে উৎপন্ন মোট ফসলের প্রায় এক দশমাংশই নষ্ট হয় শুধু তার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে, ফলে শস্যের পর্যাপ্ত ফলনও দেশের খাদ্যাভাব দূর করতে পারে না।

REGD. NO. D-233

কীটঘ্ন ওষুধের ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু উৎপন্ন খাদ্যশস্য যদি গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় 'পুসা বিন' এ্যালুমিনিয়ম বিন্' প্রভৃতিতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গুদামজাত করার ব্যবস্থা করা যায় তবে খাদ্য ফসল ধ্বংস হওয়ার কোন ভয় থাকে না। ফলে বাড়ি খাদ্য আগামী দিনের অভাব মোচনে এগিয়ে আসতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হলো খাদ্য ফসল বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে গুদামজাত করে অপচয় বন্ধ করা, আর তা করা এখন মোটেই অসুবিধাজনক নয়। কারণ আমাদের দেশের ওয়্যার হাউসিং করপোরেশন এ বিষয়ে যথাসাধ্য সহযোগীতা করে থাকেন। কারণ এই সংস্থার প্রধান কাজই হলো প্রতিটি রাজ্যে উৎপন্ন শস্য যথাযথ ভাবে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করা।

আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে দেশের শস্য রক্ষার জন্য এই সংস্থাটি গঠিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যে ৬০৪টি ওয়্যার হাউস থাকলেও এই সংস্থা দ্বারা আরও ১২০টি ওয়্যার হাউস পরিচালিত করা হয়। এই গুদামে প্রায় ২০ লক্ষ টোন পরিমাণ শস্য সংরক্ষিত হয়। এখানে চা, কফি, তৈলবীজ, খোল, রাসায়নিক সার প্রভৃতি ২০০ প্রকারের পণ্য সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়াও, ফল, শাকসব্জী ডিম এবং দুগ্ধ জাত দ্রব্যাদি তাজা রাখার জন্য হিমঘরের সুবিধাও পাওয়া যায়।

## পণ্য গুদামজাত করে ঋণ পাওয়ার সুবিধা

পণ্যের মান পরখ করে ও তার ওজন এবং মূল্য নির্দ্ধারণের পর তা গুদামজাত করা হয়। পণ্য গুদামে রাখার সময় তার কিছু নমুনা ও একটি রসিদ জমাকর্তাকে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার সময় এই রসিদ খুব কার্যকরী হয় কারণ জমাকর্তাকে ফসল গুদাম জাত করার রসিদ দেখাইলেই ব্যাঙ্ক কর্ত্তাকে ঋণ দিতে পারে; এর ফলে মাল এদিক ওদিক না নিয়েই তা প্রায় একরকম বিক্রী হয়ে যায়। ফলে কৃষক সরাসরিই ঋণ পেয়ে যান। এই ভাবে ঋণ নিয়ে হাজার হাজার কৃষক তাদের ক্ষেতে টিউব ওয়েল বসান অথবা দরকারী কৃষি যন্ত্রপাতি কেনেন। জমাকর্ত্তা আবার রসিদ দেখিয়ে তাঁর ইচ্ছামত এবং চাহিদা মত সমস্ত ফসলই ফেরৎ নিতে পারেন। এই ভাবে গুদাম জাত করা পণ্যের থেকে কৃষক দুই ভাবে লাভবান হন। প্রথমত বিনা পরিশ্রমেই পণ্যের নির্ভর যোগ্য মূল্য পান, দ্বিতীয়ত ফসল সংরক্ষিত করার দুর্ভাবনা থেকেও মুক্ত হন।

## নাম মাত্র গুদাম ভাড়া

নাম মাত্র ভাড়াতেই কৃষকরা নিজেদের পণ্য গুদাম জাত করতে পারেন। প্রতি বস্তা পণ্যের জন্য মাস প্রতি ৩০ পয়সা ভাড়া নেওয়া হয়। কৃষিপণ্য গুদাম জাত করার আগে ভালো ভাবে তা পরিদর্শন করা হয় এবং মালিকের নামনেই তার মাপ ও মান লিপিবদ্ধ করা হয়।

পণ্যের বস্তা গুদামে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে বস্তা গুলি দেওয়ালের গায়ে বা মেঝের সংস্পর্শে না আসে। গুদামে পোকামাকড়ের উৎপাত রোধের জন্য সেখানে কীটঘ্ন ওষুধ জালিয়ে ধোঁয়া দেওয়া হয়। গুদামজাত মালের ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত দায়িত্ব এই সংস্থার উপরই ন্যস্ত আছে। কোন পণ্য নষ্ট হলে কর্পোরেশন তার ক্ষতিপূরণ ধরে দেন।

## চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সূচী

সারা দেশ জুড়ে প্রায় ৭০০ এর বেশী গুদামখানা আছে এবং সেগুলির যাতে সদব্যবহার হয় তার জন্য চতুর্থ যোজনায় কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ওয়্যার হাউস কর্পোরেশনের প্রসারের জন্য প্রায় ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দিনে দিনে ওয়্যার হাউসিং এর জনপ্রিয়তা বাড়লেও এই সংস্থা পরিসরের স্বল্পতার দরুণ চাহিদামত মাল গুদামজাত করতে পারছে না। তাই এই অভাব দূর করার জন্য এই পরিকল্পনার শেষের দিকে যাতে অন্তত ৪০ লক্ষ টোন পরিমাণ শস্য সংরক্ষণ করা যায় সেরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আমাদের কৃষকরাও এখন তাই বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে গুদাম খানায় শস্য সংরক্ষণের পক্ষপাতি। কারণ তাঁরা জানেন যে, এর ফলে শস্য নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না যেমন আবার ফসল উৎপাদন বাড়লেও তা রক্ষা করতে আর কোন ঝক্কি পোহাতে হয় না। সুতরাং রাজ্যে রাজ্যে ওয়্যার হাউসিং-এর ব্যবস্থা বাড়লে দেশের শস্য অপচয় বন্ধ হয়ে খাদ্যাভাব দূর হচ্ছে।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং জীবেন্দ্র প্রিন্টার্স করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।